শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিরচিত

রজনী

[ভূমিকা-টীকা-খণ্ড ও পরিচ্ছেদ-পরিচিতি সম্বলিত

সম্পাদনা :

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়,

বিভাগীয়-প্রধান, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, আশুতোষ কলেজ,
কলিকাতা।

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীরবীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.
মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাঃ লিঃ
১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৭০০০৭৩

নতুন সংস্করণ :
১৫ই আগস্ট, ১৯৫৭

মুদ্রাকর :

পরিমল বসু
বসুশ্রী প্রেস
৮০/৬, গ্রে স্ট্রীট্,
কলিকাতা-৭০০০০৬

শ্রীমতী মহামায়া রায়
সনেট প্রিণ্টিং হাউস
১৯, গোয়াবাগান স্ট্রীট্
কলিকাতা-৭০০০০৬

যাঁর চিত্তের ঔদার্য ও হৃদয়ের উষ্ণ সান্নিধ্য দূরকে কাছে টেনে আনে, সেই পরম হৃদয়বান, সর্বজনশ্রদ্ধেয়, প্রখ্যাত আইনজীবী, ঝামাপুকুরের মেশোমশাই

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রচন্দ্র হাজরা

পরম পূজনীয়েষু

স্নেহধন্য

সুকুমার

ভূমিকা

এক

শিল্পী সাধারণ অর্থে রক্তমাংসের সামাজিক মানুষ। জীবনে সুখ-দুঃখ-আশা-নিরাশার দ্বন্দ্বে তাঁরও চিত্ত পীড়িত হয়, আন্দোলিত হয়। তিনিও শোকে বিহ্বল,

সূচনা ঃ

আনন্দে উচ্ছ্বসিত হন। সংসারে নানা সম্বন্ধে তিনি বিধৃত। সেই শিল্পী ব্যবহারিক জীবনে তথা ব্যক্তিগত পরিচয়ে আমাদের কাছে প্রকাশ পান। এই সামাজিক মানুষের বাল্যকাল থেকে পরিণত বয়সের জীবনকাহিনী নানা ঘটনায় পল্লবিত। সেই জীবনধারার মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠে শিল্পীর মানস-চেতন। সেই উপলব্ধির জগতে শিল্পী একক। কবি-মানসের যে পুষ্পটি প্রস্ফুটিত হ'য়ে সৌন্দর্য ও সুরভি বিতরণ করে, তার মূলটি প্রোথিত রয়েছে তাঁরই জীবনের ঘটনাবলীর মধ্যে। যে মৃত্তিকাকে রসসিঞ্চিত করেছে তাঁর অভিজ্ঞতা, সে অভিজ্ঞতা তিনি লাভ করেছেন সমসাময়িক দেশ-কালের পটভূমি থেকে। তাই উপলব্ধির ক্ষেত্রে শিল্পী নিঃসঙ্গ সন্দেহ নেই, কিন্তু উপলব্ধ সত্যের প্রকাশ ঘটে যুগের নানা সামাজিক আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে। তখন শিল্পীর বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী বা প্রবণতা প্রকাশ পায়। তাই শিল্পীর প্রকাশের মাধ্যম যুগোচিত হ'লেও যে অন্তর্নিহিত সত্যকে তিনি প্রকাশ করতে চান, তা যুগনিরপেক্ষ, তা চিরন্তন। তাই বলছিলাম, ভাবের উপলব্ধির জগতে তিনি একক। কিন্তু সেই উপলব্ধ সত্য যখন যুগের আধারে প্রকাশ পেল, তখনই তা সামাজিকরূপে যুগের পরিচ্ছদ অঙ্গে ধারণ করল। চিরন্তন সত্যকে যোগীও আস্বাদ করেন, কবিও আস্বাদ করেন। যোগী সেই উপলব্ধ সত্যের অনির্বচনীয় আনন্দকে আস্বাদ করেন, কবি সেই আনন্দকে সীমার বন্ধনে তাকে বাচনিক রূপ দেন। তাই বিশেষ যুগের বিশেষ প্রবণতা এক একটি শিল্পসৃষ্টিতে ধরা পড়ে। যে কবি নিছক সাময়িকতাকেই প্রকাশ করেন, তিনি যুগের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিস্মৃত হ'য়ে যান। আর যে কবি সমস্ত সাময়িকতার আবরণের অন্তরালে চিরন্তন সত্যকে রূপ দেন, তিনি কালজয়ী।

একজন শিল্পীকে সম্যকভাবে যদি জানতে চাওয়া যায়, তা'হলে যেমন তাঁর ব্যক্তিজীবনের নানা বহিরঙ্গিক ঘটনাবলীকে জানতে হবে, তেমনি বিশ্লেষণ করতে হবে এই ঘটনাপঞ্জীর মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা তাঁর মনোজীবনকে। তাই শিল্পীর সাহিত্য-সৃষ্টির রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রয়োজন তাঁর ব্যক্তিজীবন তথা সেই যুগ ও

সমাজকে বিশ্লেষণ করা; আবার শিল্পীর কবি-মানস কি পটভূমিকায় গড়ে উঠেছে, তাকেও উপলব্ধি করা। যেমন,—রবীন্দ্রনাথের মনোজীবনের বিশ্লেষণ তখনই পরিপূর্ণভাবে আমাদের কাছে ধরা দেবে, যখন আমরা তাঁর ব্যক্তিজীবনের আচার-আচরণ বিশ্লেষণ ক'রে, তাঁর কবি-মানসকে উপলব্ধি করব। সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্রের মনোজীবনের পরিচয় জানতে হ'লে জানা দরকার তাঁর ব্যক্তিজীবন, তাঁর সাহিত্য-সাধানার পরিচিতি এবং এই ব্যক্তি বঙ্কিমচন্দ্র কোন্ কোন্ গুণে ও সাধনার কোন্ পথে একাধারে যুগ ও যুগাতীতের শিল্পী হ'য়ে বাঙ্‌লা সাহিত্যাকাশকে উজ্জ্বল করেছেন।

দুই

জীবন কথা:

বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ২৬শে জুন (১৩ই আষাঢ়, ১২৪৫) রাত্রি ৯টার সময়, নৈহাটির কাছে কাঁঠালপাড়া গ্রামে। বঙ্কিমচন্দ্রের পিতার নাম যাদবচন্দ্র ও মাতা দুর্গাদেবী। তাঁর বড় দুই ভাই শ্যামাচরণ ও সঞ্জীবচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র। পিতা যাদবচন্দ্র ফার্সী ও ইংরেজীতে পারদর্শিতা লাভ ক'রে অল্প বেতনে সরকারের চাকুরী লাভ করেন এবং মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হন। ভ্রাতা সঞ্জীবচন্দ্র শুধু কৃতবিদ্যই ছিলেন না, 'পালামৌ', 'জাল প্রতাপচাঁদ', 'মাধবীলতা' প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা, ক'রে বঙ্গসাহিত্যে অমর হ'য়ে আছেন। পূর্ণচন্দ্র বঙ্কিম প্রসঙ্গ আলোচনা ক'রে আজও বারংবার স্মরণীয়।

এই মার্জিত সাংসারিক পরিবেশে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম। বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন শুরু হয় গ্রাম্য পাঠশালায় এবং শৈশবেই তিনি মেধাবী ব'লে পরিচিত হন। গ্রামের পাঠ সমাপ্ত ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র পিতার কর্ম্মস্থল মেদিনীপুরে ইংরেজী স্কুলে ভর্তি হন। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' গ্রন্থে আমরা পাই—"বঙ্কিমচন্দ্র ভাগ্যক্রমে বাল্যকাল হইতে বিদ্যোৎসাহী ও সুশিক্ষিত ব্যক্তিগণের সহবাসী থাকিতেন।...শুনিয়াছি বঙ্কিমচন্দ্র একদিনে বাঙ্‌লা বর্ণমালা আয়ত্ত করিয়াছিলেন।...কাঁঠালপাড়ায় আসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক ও বাঙ্‌লা কবিতা শিখিলেন।...বাঙ্‌লা কবিতাগুলি যাহা সর্বদা আবৃত্তি করিতেন, তাহা কবি ঈশ্বর গুপ্তের রচিত। শৈশবেই তিনি শুনিয়াছিলেন শ্রীকৃষ্ণ আদর্শ পুরুষ ও আদর্শ চরিত্র।"

খেলাধূলা বঙ্কিমচন্দ্র পছন্দ করতেন না, কারণ তাঁর শরীর ছিল অপটু। তিনি তাসখেলা পছন্দ করতেন। ভীরু স্বভাবের বঙ্কিমচন্দ্র কিন্তু মাঝে মধ্যে নানা ব্যাপারে সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। ইতিহাস পাঠের প্রতি তাঁর আবাল্য

ঝোঁক ছিল। ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে ১১ বছর বয়সে পাঁচ বছরের একটি সুন্দরী বালিকার সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের বিবাহ হয়, তাঁর নাম মোহিনী দেবী।

সেই বছরই বঙ্কিমচন্দ্র হুগলী কলেজে ভর্তি হন, তখন তাঁর বয়স সাড়ে এগারো। ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সংবাদ প্রভাকর-এ সম্ভবতঃ তাঁর প্রথম কবিতা এবং ২৩শে এপ্রিল তারিখে প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর 'ললিতা ও মানস' কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র জুনিয়র স্কলারশিপ্ ও ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে সিনিয়র স্কলারশিপ্ লাভ করেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম প্রবর্তিত এণ্ট্রান্স পরীক্ষা দিয়ে প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন এবং ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম বি. এ. পরীক্ষায় পাশ করেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজের ছাত্রজীবন সম্পর্কে বলেছেন···"ক্লাসে কখনো থাকিতাম না। ক্লাসের পড়াশুনা কখনও ভাল লাগিত না—বড় অসহ্য বোধ হইত। কুসংসর্গটা ছেলেবেলায় বড় বেশী হইয়াছিল। বাপ থাকিতেন বিদেশে, মা সেকেলের উপর আর একটু বেশী, কাজেই তাঁর কাছে শিক্ষা কিছু হয়নি ; নীতিশিক্ষা কখনও হয়নি।"

১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যশোরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টার নিযুক্ত হন। এই সময়েই তাঁর সঙ্গে দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় হয়, যা পরবর্তীকালে অন্তরঙ্গতা লাভ করে। ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে বঙ্কিমচন্দ্রের পত্নীবিয়োগ হয়। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র মেদিনীপুরের নেগুয়ায় বদলি হন। নেগুয়ার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা—এইখানেই অবস্থানকালে বঙ্কিমের মনে কপালকুণ্ডলার বীজ উপ্ত হয়। এই বছরেই বঙ্কিমচন্দ্র হালিশহরের চৌধুরী বাড়ীর কন্যা দ্বাদশ বর্ষীয়া রাজলক্ষ্মী দেবীকে বিবাহ করেন। এরপর বঙ্কিমচন্দ্র খুলনায় বদলি হন। এই সময়েই তাঁর ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohon's wife' ও প্রথম বাঙ্‌লা উপন্যাস 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনার সূত্রপাত হয়। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বারুইপুরে বদলি হন এবং পরের বছর বঙ্কিমচন্দ্র ভ্রাতৃবিরোধের মধ্যে জড়িয়ে পড়েন। পিতা যাদবচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার ভদ্রাসন উইল করে সঞ্জীবচন্দ্র ও পূর্ণচন্দ্রকে ভাগ ক'রে দেন। বঙ্কিমচন্দ্র ঐ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান পেয়ে আইন পাশ করেন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তাঁর মাতৃবিয়োগ হয়। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র সম্পাদিত 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা ভবানীপুর (কলকাতা) থেকে প্রকাশিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কাঁঠালপাড়ায় বঙ্গদর্শনের ছাপাখানা ও কার্যালয় স্থানান্তরিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র হুগলীতে বদলী হন এবং ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে অস্থায়িভাবে বর্ধমান ডিভিসনে কমিশনারের পি. এ. নিযুক্ত হন। ঠিক এই সময়েই

বঙ্কিমচন্দ্রের পারিবারিক কলহ তীব্র হ'য়ে ওঠে ও তিনি বঙ্গদর্শনের প্রকাশ বন্ধ করে দেন। অবশেষে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কাঁঠালপাড়ার বাসা উঠিয়ে দিয়ে চুঁচুড়ায় সপরিবারে বাড়ী ভাড়া করে চলে যান এবং বঙ্গদর্শনের সমস্ত স্বত্ব সঞ্জীবচন্দ্রকে দান করেন। চুঁচুড়ায় বঙ্কিমচন্দ্রের বাড়ীতে কলকাতা থেকে অনেক সাহিত্যিক যাতায়াত করতেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভূদেব মুখোপাধ্যায়, পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন।

১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র যখন পি. এ. রূপে হাওড়ায় বদলি হন, সেই সময়ে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়। এই হাওড়াতেই বিচারের রায় নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট বাক্ল্যাণ্ড সাহেবের সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি সরকারের অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীরূপে ও ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টাররূপে কলকাতায় বদলি হন এবং শেষে তিনি উড়িষ্যার জাজ্‌পুরে বদলি হন। হাওড়া থেকে কলকাতায় বদলি হবার পর জাজ্‌পুর গমন পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের বাস ছিল কলকাতার বহুবাজার স্ট্রীটে। সেখানে প্রতিদিন প্রায় সাহিত্যিক বৈঠক বসত। এই সাহিত্যিক আড্ডায় আসতেন চন্দ্রনাথ বসু, হেমচন্দ্র, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, সঞ্জীবচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত। এই সময়ে পিতার বাৎসরিক উপলক্ষে বঙ্কিমের সঙ্গে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিরোধ লাগে।

ব্রজেন্দ্রনাথ বলেছেন, "১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ২৩শে জানুয়ারী তারিখে বঙ্কিমচন্দ্র মিঃ রাইদকে অ্যাসিস্টেণ্ট সেক্রেটারীর চার্জ বুঝাইয়া দেন। সেইদিন সন্ধ্যায় রবীন্দ্রনাথ আসিয়া তাঁহাদের জোড়াসাঁকোর বাড়ীতে বঙ্কিমকে লাইয়া যান। সেইদিন ১১ই মাঘ ছিল।" ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে জেনারেল এসেমব্লীজ ইনস্টিটিউশন (বর্তমানে স্কটিশ চার্চ কলেজ)-এর অধ্যক্ষ পাদ্রী হেষ্টির সঙ্গে হিন্দু ধর্মের মূল তত্ত্ব নিয়ে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকায় তাঁর বাদানুবাদ হয়। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বঙ্কিমচন্দ্র 'প্রচার' নামক মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই সময়েই বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তত্ত্ববোধিনী সভার বিতর্ক উপস্থিত হয়। এই বিতর্কে বঙ্কিমের পক্ষে ছিলেন চন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর বিরোধিতা করেন দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, রাজনারায়ণ বসু, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি।

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পর বঙ্কিমচন্দ্রকে বিভিন্ন জায়গায় চাকুরীর অজুহাতে ঘোরাফেরা করতে হয় এবং এই সময়ে তিনি হাঁপানিতে খুব কষ্ট পান। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটের সভ্য হন। হাওড়ায় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট থাকাকালীন বঙ্কিমচন্দ্র ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে মেডিকেল কলেজের সামনে প্রতাপ চ্যাটার্জী লেনে একটি বাড়ী কিনে সেখানে বাস করতে থাকেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৪ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত

চাকুরী করে বঙ্কিমচন্দ্র অবসর গ্রহণ করেন। তারপর জীবনের শেষ পর্যন্ত তিনি কলকাতাতেই ছিলেন।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরোধে এনট্রান্স পরীক্ষার্থীদের জন্য তিনি ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে 'Bengali Selections' প্রকাশ করেন। এই বছরই বঙ্কিমচন্দ্র 'রায়বাহাদুর' ও ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে C. I. E. উপাধি পান। এই সময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে মাতৃভাষা বাঙলাকে পরীক্ষার বিষয় করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা ক'রে ব্যর্থ হন। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনের এই পর্ব সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আলোচনা উল্লেখ করা যেতে পারে: "১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের ১৩ আগস্ট তারিখে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজে 'সোসাইটি ফর হায়ার ট্রেনিং অব ইয়ং মেন' নামীয় সভার প্রতিষ্ঠাদিবসে বঙ্কিমচন্দ্র উপস্থিত হইয়া সাহিত্য শাখার স্থায়ী সভাপতি হন। এই সভার নাম পরে পরিবর্তিত হইয়া ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হয়। বঙ্কিমচন্দ্র এখানে মাঝে মাঝে উপস্থিত হইয়া সাহিত্য ও ধর্ম বিষয়ে বক্তৃতা করিতেন। তাঁহার জীবনের শেষ কীর্তি— উক্ত সভার উদ্যোগে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী ও মার্চ মাসে তৎকর্তৃক প্রদত্ত বৈদিক সাহিত্য-বিষয়ক ইংরেজীতে দুইটি বক্তৃতা; এই বক্তৃতা দুইটি ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ম্যাগাজিনে'র ঐ বৎসরের গোড়ার দুই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তাঁহার বহুমূত্র রোগ অসম্ভবরূপে বৃদ্ধি পায়, তিনি শয্যাশায়ী হইয়া পড়েন; ২৩ দিন সাংঘাতিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া ৫ই এপ্রিল হইতে তিনি জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়েন। পরে জ্ঞান ফিরিয়া পাইয়াছিলেন কিন্তু বাক্‌রোধ হইয়াছিল। ৮ই এপ্রিল (২৬ চৈত্র ১৩০০) বেলা তিনটা ২৫ মিনিটের সময় তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র (শ্যামাচরণের পুত্র) কৃষ্ণবাবু মুখাগ্নি করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের বিধবা স্ত্রী রাজলক্ষ্মী দেবী বঙ্কিমের মৃত্যুর পরেও দীর্ঘকাল জীবিত ছিলেন।

বঙ্কিমের পুত্রসন্তান হয় নাই; তিনটি কন্যা জন্মিয়াছিল—শরৎকুমারী, নীলাব্জ-কুমারী ও উৎপলকুমারী। তাঁহারা কেহই এখন বর্তমান নাই।"

তিন

বঙ্কিমচন্দ্র মাত্র ছাপ্পান্ন বছর জীবিত ছিলেন। এই ছাপ্পান্ন বছরের মধ্যে তিনি সাহিত্যসেবা করেন বিয়াল্লিশ বছর। ব্রজেনবাবু বলেছেন, "তিনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫শে ফেব্রুয়ারী তারিখে (বয়স ১৩ বৎসর ৮ মাস) লিখিতে শুরু করিয়া ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের মার্চমাসে (৫৫ বৎসর ৯ মাস) মৃত্যুর ঠিক একমাস পূর্বে লেখার কাজে বিরত হন। এই দীর্ঘদিনের সাহিত্য-সাধনাকে যদি আমরা

তথ্যগত বিচার-বিশ্লষণ করি (তত্ত্বগত বিশ্লেষণ নয়)", তাহলে আমরা দেখব বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার সূত্রপাত তাঁর ছাত্রজীবনে এবং তা শেষ জীবন পর্যন্ত বিস্তৃত। অর্থাৎ বঙ্কিম-জীবন এবং তাঁর সাহিত্য-জীবন পারস্পরিক বন্ধনের দ্বারা একীভূত।

শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় বঙ্কিম সাহিত্য-সাধনাকে চারটি পর্বে বিভক্ত করেছেন। তাঁর মতে—"১। আদিপর্ব ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে 'সংবাদ প্রভাকরে' রচনা প্রকাশ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'র প্রকাশকাল পর্যন্ত ১৩ বৎসর।

২। উদ্যোগ পর্ব: ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শনের প্রকাশকাল পর্যন্ত (বৈশাখ ১২৭৯ সাল) ৭ বৎসর।

৩। যুদ্ধ পর্ব: ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে 'প্রচার' পত্রিকার বিদায়কাল পর্যন্ত ১৭ বৎসর।

৪। শান্তিপর্ব: ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল তারিখে মৃত্যু পর্যন্ত ৫ বৎসর।

প্রথম দুই পর্বে বঙ্কিমচন্দ্র লেখক, তৃতীয় পর্বে সম্পাদক ও সমালোচক এবং চতুর্থ পর্বে তিনি পিতামহ ভীষ্মের মত উপদেষ্টা।"

আমরা জানি বঙ্কিমচন্দ্র যখন হুগলী কলেজের ছাত্র, তখন গুপ্তকবি সাহিত্যে নেতৃত্ব করছেন। সেই যুগে সাহিত্যসেবী তরুণ ছাত্রদের ওপর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের প্রভাব অসীম এবং তাঁর 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা ছাত্রসমাজকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। গুপ্তকবিকে অনুকরণ করার নেশায় তাঁরা মেতে উঠলেন। তরুণ ছাত্রদের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু মিত্রের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সংবাদ প্রভাকরেই বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি প্রকৃতি-বর্ণনামূলক ও উক্তি-প্রত্যুক্তিমূলক কবিতা, কবিতাকারে দু-একটি নাটক ও দু-একটি টুকরো গদ্য রচনা করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের কাব্যকৃতির পরিচয় নিহিত রয়েছে 'ললিতা ও মানস' কাব্যগ্রন্থে।

তবে যে সাহিত্য-সাধনার জন্য বঙ্কিমের খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা এই সব রচনায় তার পূর্বাভাসও পাওয়া যায় না। কাব্য-রচনার আর কোন পরিচয় বঙ্কিমের পরবর্তী সাহিত্যে আমরা পাই না। তা শুধু সীমাবদ্ধ ছিলো উপন্যাসের মধ্যে দু'একটি বিক্ষিপ্ত ছড়া বা গানের মধ্যে বা বঙ্গদর্শনের দু'একটি কবিতা রচনার মধ্যে। তবে পরবর্তীকালে তাঁর কবিজীবনের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন আমরা পেয়েছি 'বন্দেমাতরম্' সংগীত রচনার মধ্যে। ভাবে ও আবেগে তা বঙ্কিম কবি-প্রতিভার একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। তবে সাহিত্য-জীবনের প্রথম পর্বে তাঁর এই কবিপ্রাণতা পরবর্তীকালে তাঁর উপন্যাস রচনায় গভীরভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। 'সংবাদ প্রভাকর' ও

ঈশ্বর গুপ্ত বঙ্কিমের সাহিত্য-সাধনার প্রথম পর্বে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল। ব্রজেনবাবু বলেছেন,—"শিষ্যেরা রচনা পাঠাইয়াছেন গুরু উৎসাহসূচক টিপ্পনী সহযোগে তাহা প্রকাশ করিতেছেন। কখনও কখনও উপদেশও দিতেছেন। এই রীতি এ যুগে আর দেখা যায় না।..তিনি শুধু পিঠ চাপড়াইতেন না, পথও দেখাইতেন। কথিত আছে তিনিই বঙ্কিচন্দ্রকে পদ্য ছাড়িয়া গদ্য রচনায় উৎসাহিত করিয়াছিলেন।"

আগেই বলেছি, বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম রচনা 'ললিতা' তথা 'মানস'। এর প্রকাশকাল ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দ। এর পরবর্তী কাহিনী ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত 'দুর্গেশনন্দিনী'। এই মধ্যবর্তী সময়ের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের বাংলা রচনার নিদর্শন আর পাই না। তাঁর ইংরেজী জ্ঞানের পটুত্ব হয়ত তাঁকে ইংরেজী রচনায় অনুপ্রাণিত করে থাকবে, তারই প্রমাণ-স্বরূপ আমরা পাই তাঁর ইংরেজী উপন্যাস 'Rajmohan's wife', যা ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে 'Indian field' নামক সাপ্তাহিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

বঙ্কিমচন্দ্র ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্যে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করলেও মাতৃভাষা বাঙ্‌লার প্রতি সমান শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তাই সে যুগের রীতিবিরুদ্ধ ইংরেজী শিক্ষার অভিমানকে জয় করে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা সাহিত্য সেবায় আত্মনিয়োগ করেন। তাই শিবনাথ শাস্ত্রী মন্তব্য করেছেন—"অচিরকালের মধ্যে বঙ্গের সাহিত্যাকাশে উজ্জ্বল তারকার ন্যায় বঙ্কিম দীপ্তি পাইতে লাগিলেন। বঙ্গবাসীর চিন্তা ও চিত্তের উন্মেষ পক্ষে যত লোক সহায়তা করিয়াছেন তন্মধ্যে ইনি একজন অগ্রগণ্য ব্যক্তি।"

ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সময়ের কথা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন,— "১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাস হইতে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসের প্রথম ভাগ পর্যন্ত বঙ্কিমচন্দ্রের কলিকাতার ছাত্র-জীবন; এই সময়ে তিনি সম্ভবতঃ পড়াশুনা ও পরীক্ষা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট হইতে তাঁহার চাকুরী-জীবন আরম্ভ হয়। যশোহরে গিয়াই দীনবন্ধুর সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং পরিচয় ক্রমশঃ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। বাঙ্‌লা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার নব আসক্তির মূলে এই ঘনিষ্ঠতা কতখানি কাজ করিয়াছে, আজ তাহা আমরা আন্দাজ মাত্র করিতে পারি;...খুলনায় তিনি Rajmohan's wife রচনা করেন ও ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ঐতিহাসিক গবেষণার দিকে তখন পর্যন্ত যে তাঁহার ঝোঁক তাহার প্রমাণ, ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ৫ই আগস্ট হইতে তাঁহাকে কলিকাতা এশিয়াটিক সোসাইটির সভ্যতালিকাভুক্ত হইতে দেখি;...

খুলনা হইতেই অর্থাৎ ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই বঙ্কিমচন্দ্র 'দুর্গেশনন্দিনী' রচনায় হাত দেন। কিন্তু তৎপূর্বেই ভবিষ্যৎ বঙ্কিমের সূচনা দেখা দিয়াছে। নিষ্ঠার সহিত বিমাতার সেবা করিয়া মাতৃভক্ত বঙ্কিমের তৃপ্তি হয় নাই, Rajmohan's wife রচনা করিয়া তাঁহার মনে ধিক্কার আসিয়া থাকিবে।…'সংবাদ প্রভাকরে'র আদর্শে যে ভাষা বঙ্কিমচন্দ্রের একমাত্র অবলম্বন ছিল 'রাজমোহনের স্ত্রী' লিখিতে বসিয়া বঙ্কিমচন্দ্র সেই ভাষাকে নির্মমভাবে ত্যাগ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন।"

তাই বঙ্কিমের গদ্য বিষয় ও প্রয়োজন অনুযায়ী কখনও গুরুগম্ভীর চালে, কখনও বা হাল্কা রীতিতে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে—"বাংলা ভাষার এক সীমায় তারাশংকরের 'কাদম্বরী'র অনুবাদ, আর এক সীমায় প্যারিচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল'। ইহার কেহই আদর্শ ভাষায় রচিত নয়। কিন্তু এই উভয় জাতীয় ভাষার উপযুক্ত সমাবেশ দ্বারা এবং বিষয় ভেদে একের প্রবলতা ও অপরের অল্পতা দ্বারা আদর্শ বাংলা গদ্যে উপস্থিত হওয়া যায়।" এই সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই বঙ্কিম-প্রতিভার যথার্থ বিকাশ।

এর পরেই আমরা পেলাম ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে 'দুর্গেশনন্দিনী'। দুর্গেশনন্দিনীকে কেন্দ্র করে বাঙ্‌লা সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য দিক্‌পরিবর্তনের আভা সূচিত হয়। দুর্গেশনন্দিনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র ভাষা ও রচনা রীতি নিয়ে এক নূতন পরীক্ষা-নিরীক্ষায় অবতীর্ণ হন। এ সম্পর্কে রমেশচন্দ্র দত্তের বক্তব্যটি স্মরণীয়—"যখন দুর্গেশনন্দিনী প্রকাশিত হইল, তখন যেন বঙ্গীয় সাহিত্যাকাশে সহসা একটি নূতন আলোকের বিকাশ হইল। দেশের লোক সে আলোকচ্ছটায় চমকিত হইল।" এর পরের বছরই বঙ্কিমচন্দ্র লিখলেন 'কপালকুণ্ডলা' এবং তারপর 'মৃণালিনী' উপন্যাস প্রকাশিত হয়। কপালকুণ্ডলা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্কিম-প্রতিভার মৌলিকতাকে আর কেউ অস্বীকার করতে পারলেন না। এবং বঙ্কিমচন্দ্র যেন কপালকুণ্ডলার মধ্যে স্বীয় প্রতিভা এবং শক্তিকে আবিষ্কার করলেন।

'মৃণালিনী' প্রকাশের পর বঙ্কিম সাহিত্য জীবনের স্বর্ণযুগ বঙ্গদর্শন পর্ব। ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদর্শন প্রকাশিত হয়। এই সময়ে বঙ্কিমচন্দ্র বাঙ্‌লা সাহিত্যে নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁকে কেন্দ্র করে একটি বলিষ্ঠ লেখকগোষ্ঠীও গড়ে ওঠে। বঙ্কিমচন্দ্র একদিকে একটার পর একটা উপন্যাস রচনা করলেন, নানা প্রবন্ধ সমালোচনার দ্বারা বঙ্গসাহিত্যে উৎকর্ষ বিধানে তৎপর হলেন, অন্যদিকে অযোগ্য লেখককে কঠোর সমালোচনার দ্বারা নিবৃত্ত করলেন। এই বঙ্গদর্শন পত্রিকাতেই বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ', 'ইন্দিরা' (ছোট), 'চন্দ্রশেখর', 'যুগলাঙ্গুরীয়' উপন্যাস গল্প প্রকাশিত হয়, অন্যদিকে

'লোকরহস্য', 'বিজ্ঞানরহস্য', 'কমলাকান্তের দপ্তর,' 'সাম্য' ইত্যাদি নানা ধরণের প্রবন্ধ আলোচনা তিনি এখানে প্রকাশ করেন। বিষবৃক্ষ ও ইন্দিরা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা সাহিত্য তথা বঙ্কিমচন্দ্র নতুন শক্তিতে আত্মপ্রকাশ করলেন। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়—"এই সময়ে সব্যসাচী বঙ্কিম এক হস্ত গঠনকার্যে, এক হস্ত নিবারণ কার্যে নিযুক্ত রাখিয়াছিলেন। একদিকে অগ্নি জ্বালাইয়া রাখিতে ছিলেন, আর একদিকে ধূম এবং ভস্মরাশি দূর করিবার ভার নিজেই লইয়াছিলেন। রচনা এবং সমালোচনা এই উভয় কার্যের ভার বঙ্কিম একাকী গ্রহণ করাতেই বঙ্গ সাহিত্য এত সত্বর এমন দ্রুত পরিণতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিল।"

" 'কমলাকান্ত', 'লোকরহস্য', এবং 'মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত' গ্রন্থগুলিতে তাঁহার হাসি ও ব্যঙ্গের অন্তরালে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জাতিগত অপমান, লাঞ্ছনার জ্বালা ও বেদনার অশ্রু লুকাইয়া আছে। প্রবন্ধগুলিতে যে চরম কথাগুলি বঙ্কিমচন্দ্র বলিতে পারেন নাই বিদ্রূপের আচারণে সে সকল কথা তিনি অতি সহজেই বলিতে পারিয়াছেন। বাঙ্‌লাদেশে চিরন্তন গতানুগতিকতার বিরুদ্ধে কমলাকান্তী বঙ্কিমের এই বিদ্রোহ বাঙ্‌লা সাহিত্যে অমর হইয়া আছে।...গুরুগম্ভীর প্রবন্ধ লিখিতে লিখিতে বঙ্কিমচন্দ্রের স্বভাবতঃ রহস্যপ্রিয় মন প্রথমটা লোকরহস্যের সহজ পথে একটা মুক্তির উপায় আবিষ্কার করিয়া কতক সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল...আনন্দমঠ-এর বন্দেমাতরম্ সঙ্গীতে যাহার পূর্ণ পরিণতি, মৃণালিনীতে যাহার সূত্রপাত, কমলাকান্তে সেই মাতৃমন্ত্রের প্রথম সার্থক প্রকাশ। বাঙালী জাতির পরাধীনতার সুগভীর ধিক্কার এখানেই বঙ্কিমচন্দ্রের মনে নিদারুণ তীব্রতায় ফুটিয়া উঠিয়াছে ..আধুনিক বাঙালীর রাষ্ট্রীয় সাধনার ইতিহাসে প্রকৃতপক্ষে কমলাকান্ত হইতেই আমাদের যাত্রা শুরু।"

বঙ্গদর্শন পর্বের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য উপন্যাস 'বিষবৃক্ষ'। বিষবৃক্ষ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে বাঙালীর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে আলোড়ন উপস্থিত হয়। রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "বঙ্গদর্শনে যে জিনিষটা সেদিন বাঙ্‌লাদেশের ঘরে ঘরে সকলের মনকে নাড়া দিয়েছিল, সে হচ্ছে বিষবৃক্ষ। এর পূর্বে বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী থেকে দুর্গেশনন্দিনী, কপালকুণ্ডলা, মৃণালিনী লেখা হয়েছিল। কিন্তু সেগুলি ছিল কাহিনী, ইংরেজীতে যাকে বলে Romance। আমাদের প্রতিদিনের জীবনযাত্রা থেকে দূরে এদের ভূমিকা। সেই দূরত্বই এদের মুখ্য উপকরণ...বিষবৃক্ষে কাহিনী এসে পৌছল আখ্যানে। যে পরিচয় নিয়ে সে এল, তা আছে আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে।"

'চন্দ্রশেখর' উপন্যাসে ইতিহাসের পটভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের সামাজিক জীবনের একটি তত্ত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তা হ'লো 'বাল্য প্রণয়ে অভিশাপ আছে'।

'ইন্দিরা' গল্পে আত্মকথার ভঙ্গীতে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী বিবৃত করেছেন। বড় গল্প হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্রের 'যুগলাঙ্গুরীয়' এবং 'রাধারাণী'র নামস্মরণ করা যেতে পারে। এছাড়া বঙ্গদর্শন পত্রিকায় প্রকাশিত বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সংকলন 'বিজ্ঞান রহস্য' বঙ্কিমচন্দ্রের উল্লেখযোগ্য রচনা। 'রজনী' উপন্যাসটি বাঙ্‌লা সাহিত্যে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস হিসেবে স্মরণীয়। এ সম্পর্কে আমরা পরে বিস্তারিত আলোচনা করেছি। সামাজিক উপন্যাসের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিষবৃক্ষ' এবং 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বঙ্কিম-প্রতিভার স্বাক্ষর বহন করে। শুধু তাই নয়, আঙ্গিক গঠনের দিক দিয়েও 'কৃষ্ণকান্তের উইল' সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বঙ্কিমচন্দ্রের আর একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ 'রাজসিংহ', যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস। বঙ্কিমজীবনে শেষ পর্বের ত্রয়ী উপন্যাস নামে খ্যাত 'আনন্দমঠ', 'দেবীচৌধুরাণী' ও 'সীতারাম' গ্রন্থগুলির মধ্যে শিল্পী বঙ্কিম ও দেশপ্রেমিক বঙ্কিমের সহাবস্থান লক্ষ্য করা যায়। এই উপন্যাসগুলির মধ্য দিয়ে তিনি অনুশীলন তত্ত্ব প্রচারে ব্রতী হন। আন্দমঠ-এ ছিয়াত্তরের মন্বন্তর ও সেই পটভূমিকায় সন্তান দলের দেশ-সেবায় আত্মনিয়োগ জাতীয় জীবনে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। বিশেষতঃ বন্দেমাতরম্ সংগীতের প্রকাশ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে প্রফুল্ল চরিত্রকে অবলম্বন করে বঙ্কিমচন্দ্র অনুশীলন তত্ত্বের নতুন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। সীতারাম-এ প্রাচ্য ও পশ্চাত্য জীবনাদর্শের সমন্বয় সাধনের ব্যর্থ চেষ্টা সীতারাম চরিত্রের ট্রাজেডিকে ডেকে নিয়ে এসেছে।

যে দু'খানি গ্রন্থের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রগতিশীল চিন্তার ছাপ আধুনিক দৃষ্টিতেও উল্লেখযোগ্য সে দুটি গ্রন্থের নাম 'সাম্য' এবং 'কৃষ্ণচরিত্র'। 'সাম্য' গ্রন্থের 'বঙ্গদেশের কৃষক' প্রবন্ধটি আজকের দিনেও বারবার স্মরণীয়। 'কৃষ্ণচরিত্র' গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কৃষ্ণচরিত্রের মধ্য দিয়ে অনুশীলন তত্ত্বের বিষয় স্পষ্ট ধারণা গড়ে তুলতে চেয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তাঁর ধর্মতত্ত্ব গ্রন্থ শ্রীমদ্‌ভাগবত গীতার নবতর ব্যাখ্যা সবিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। এছাড়া, বঙ্কিমচন্দ্রের 'বিবিধ প্রবন্ধে'র দুটি ভাগের মধ্যে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ের আলোচনা সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। মানবজ্ঞানের বিচিত্র দিককে নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে আলোচনা করেছেন, তা শুধু বিষয়বস্তুর গৌরবে নয়, রচনার রস সম্ভোগেও আকর্ষণীয়। বঙ্কিমচন্দ্র শিশুদের জন্য যেমন রচনাশিক্ষা এবং ইংরেজী শিক্ষার গ্রন্থ লিখেছেন, উপন্যাস সাহিত্যের জন্ম মুহূর্তেই তাকে যৌবনোচিত মহিমা দান করেছেন, তেমনই প্রবন্ধ রচনাতেও তিনি একটি বিশিষ্ট ধারার প্রবর্তন করেছেন। দীর্ঘ বিয়াল্লিশ বছর ধরে বঙ্কিমের সাহিত্য সাধনা যেমন বিচিত্র তেমনি উল্লেখ্য বাংলার সাহিত্য সাধনায় তাঁর নেতৃত্বদান।

শ্রদ্ধেয় ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বঙ্কিমচন্দ্র সম্পর্কে একটি মন্তব্য বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন,—"তিনি সর্বদা আপনাকে আড়ালে রাখিয়া নিজের সৃষ্টিকেই প্রাধান্য দিতেন। তাঁহার জীবনের আদর্শ স্থির ছিল; জীবনে যত অগ্রসর হইয়াছেন, সেই আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা তাঁহার তত বাড়িয়াছে। তিনি শয়নে স্বপনে একাগ্রচিত্ত হইয়া দেশের এবং দশের কল্যাণ কামনা করিয়া সাহিত্য সৃষ্টি করিয়াছেন। তাঁহাকে বুঝিতে হইলে তাঁহার নিম্নলিখিত উক্তিটি আমাদের সর্বদা মনে রাখিতে হইবে…"সাহিত্যও ধর্ম ছাড়া নহে। কেন না, সাহিত্য সত্যমূলক। যাহা সত্য, তাহা ধর্ম। যদি এমন কুসাহিত্য থাকে যে, তাহা অসত্য-মূলক ও অধর্মময়, তবে তাহার পাঠে দুরাত্মা বা বিকৃতরুচি পাঠক ভিন্ন কেহ সুখী হয় না।"

চার

কাহিনী-বিন্যাস ঃ

রজনী উপন্যাসে পাঁচটি খণ্ডে কাহিনীটি বিবৃত করেছেন পাত্র-পাত্রীরা নিজেরাই। এখানে লেখক সম্পূর্ণ অন্তরালে অবস্থান করেছেন। প্রধান চরিত্র চারটি যথাক্রমে—রজনী, অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র আবেগময় ভাষায় নিজেদের চিত্তের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতি বর্ণনা করেছেন।

(১)

রজনী জন্মান্ধ। তার পালক-পিতা রাজচন্দ্র দাস নিতান্ত দরিদ্র। ফুল ও মালা বিক্রি ক'রে অতি কষ্টে তাদের সংসার চলে। রজনী ও তার মা ফুলের মালা গেঁথে দিত। ফুলের কোমল স্পর্শে ও মনোরম গন্ধ মালা গাঁথতে গাঁথতে রজনীর যৌবনের আবির্ভাব। ফলে, তার মনে যৌবনোচিত অনুভূতি অপূর্ব আবেগ নিয়ে প্রকাশ পেতো। দৃষ্টিহীনা রজনী শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের দ্বারা তার অনুভূতিকে বিকশিত করে তুলেছিল।

সেই পাড়াতেই বাস করতেন ধনী রামসদয় মিত্র। তাঁর কনিষ্ঠা গৃহিণী লবঙ্গলতা বয়সে যুবতী, সে তাই বৃদ্ধ স্বামী রামসদয়কে প্রণয়ের নানা উপাচারে নবীন করে তুলতে চেয়েছিলেন। রজনীর মা তাদের বাড়ী ফুলের যোগান দিত। মাঝে মধ্যে রজনীও লবঙ্গলতাকে ফুল এবং মালা বিক্রি করত। মূল্যের অতিরিক্ত অর্থ লবঙ্গলতা ইচ্ছাকৃতভাবে তাদের দিয়ে পরোক্ষভাবে এই পরিবারটিকে সাহায্য করার চেষ্টা করত।

একদিনের ঘটনা—সেদিন রজনীর মায়ের জ্বর। রজনী লবঙ্গকে ফুল দিতে

গেল। অন্ধ রজনী চেনা পথে বিনা সাহায্যে চলতে পারত। লবঙ্গ তাকে দেখে বলল,—'কি লো . নী। আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্ কেন।' তাতে রজনী রেগে গিয়ে কি বলতে যাবে এমন সময় রামসদয়বাবুর প্রথমা স্ত্রীর কনিষ্ঠ পুত্র এসে উপস্থিত। লবঙ্গ শচীন্দ্রকে রজনীর পরিচয় করিয়ে দিল। রজনী জন্মান্ধ শুনে শচীন্দ্র রজনীর চোখ দুটি দেখবার জন্য রজনীর মুখখানি ধরে পরীক্ষা করে বলল "এ কাণা সারিবার নয়।" তারপর লবঙ্গ শচীন্দ্রের কাছে রজনীর বিবাহের প্রসঙ্গ তুলল। শচীন্দ্র কথা দিল—রজনীর জন্য পাত্র যোগাড় করবার চেষ্টা করবে।

এদিকে রজনীর কুমারী চিত্তে শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর, তাঁর স্পর্শ এক অপূর্ব সাড়া জাগিয়ে তুলল। সে শচীন্দ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল। শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনবার আশায় সে প্রতিদিন লবঙ্গদের বাড়ী ফুল দিতে যেতে লাগল। দৈবাৎ শচীন্দ্রের সাক্ষাৎ পেতো সে, নিজের জীবনকে সার্থক মনে করত। কিন্তু অন্ধের ভালবাসা বুঝছেই বা কে, শুনছেই বা কে। অন্ধ 'রজনী' যেন রূপের নেশায় মেতে উঠল।

একদিন রাত্রে রজনীর হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। সে পিতামাতার কথাবার্তা শুনে বুঝল রামসদয়বাবুর বাড়ীর সরকারের ছেলে গোপালের সঙ্গে তার বিয়ের কথাবার্তা চলছে। স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও গোপাল টাকার লোভে অন্ধকে বিবাহ করতে রাজী এবং লবঙ্গ এই বিবাহের ব্যয়ভার বহন করবে। এই কথা জেনে ক্ষুব্ধ রজনী পরের দিন গেল লবঙ্গের সঙ্গে ঝগড়া করতে। সে বিবাহ করতে চায় না জেনে লবঙ্গ তাকে তিরস্কার করল। বেদনার্ত রজনী কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে, এমন সময় শচীন্দ্র উপস্থিত। শচীন্দ্র তাকে কাঁদতে দেখে তাকে ডেকে হাত ধরে তার ছোটমার কাছে নিয়ে গেল। রজনীর মনে হ'ল যেন, এই স্পর্শে তার জীবন সার্থক হয়ে গেল।

রজনী বিবাহ বন্ধ করবার চেষ্টা করেও কোনো উপায় দেখতে পেল না। এদিকে গোপালের স্ত্রী চাঁপা, তার ভাই দুষ্টচরিত্র হীরালালকে দিয়ে এই বিবাহ ভেঙে দিতে চাইল। কিন্তু তাতেও কৃতকার্য হওয়া গেল না। পরে চাঁপা এসে রজনীকে পরামর্শ দিল যে, বিবাহের ঠিক কয়েকদিন আগে সে তার বাপের বাড়ীতে রজনীকে লুকিয়ে রাখবে। উপায়ান্তর না দেখে রজনী তাতেই রাজী হ'ল।

সেইদিন মধ্যরাত্রে সে গোপনে চাঁপার সঙ্গে তার শ্বশুরবাড়ী গেল। পাছে স্বামী জানতে পারে এই আশংকায় চাঁপা রজনীকে সেই রাত্রেই হীরালালের সঙ্গে তার বাপের বাড়ী পাঠিয়ে দিতে চাইল। রজনী প্রথমে হীরালালের সঙ্গে যেতে

আপত্তি করল। কিন্তু উপায়ান্তর না দেখে সে অগত্যা হীরালালের সঙ্গেই পথে বের হ'ল। পাছে হীরালাল তার উপর বল প্রয়োগ করতে সাহস পায় বা বল প্রয়োগ করতে আসে এই আশংকায় রজনী হীরালালের কাছ থেকে তার লাঠিখানা চেয়ে নিয়ে তা অনায়াসে ভেঙে হীরালালকে তার দৈহিক শক্তি সম্পর্কে সতর্ক করে দিল এবং লাঠির অর্ধাংশ নিজের কাছে রাখল।

চাঁপার বাপের বাড়ী হুগলী। সেখানে যাবার জন্য হীরালাল নৌকা ভাড়া করল। পথে হীরালাল রজনীকে পীড়াপীড়ি করতে লাগল যেন তাকে বিবাহ করতে সে রাজী হয়। কিন্তু রজনী কিছুতেই এই বিবাহে রাজী নয়। হীরালাল তখন ক্ষুব্ধ হয়ে চুপ করে রইলো।

শেষ রাত্রে হীরালাল মাঝিদের এক জায়গায় নৌকো ভেড়াতে বলল। গন্তব্যস্থানে পৌঁছে গেছি বলে হীরালাল রজনীকে নৌকো থেকে নামতে বলল। রজনী নেমে এলে সে নৌকোয় উঠে মাঝিদের নৌকো খুলে দিতে বলল। রজনী বারবার তাকে তুলে নেবার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু হীরালালের এক সর্ত "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?" কিন্তু রজনী কিছুতেই রাজী হ'ল না। রজনী জলে নেমে নৌকো ধরতে গেল কিন্তু নৌকো তখন খানিকটা দূর এগিয়ে গেছে। রজনী কোমর জলে ফিরে এসে হীরালালের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করে তার লাঠির অর্ধাংশ ছুঁড়ে হীরালালকে আঘাত করল। হীরালাল আহত হয়ে গালি-গালাজ করতে করতে নৌকো নিয়ে চলে গেল।

রজনী অকূল পাথারে ভাসতে লাগল। যে প্রেমের ব্যর্থতা তার জীবনকে অসার্থক করে দিয়েছে তার স্মৃতি তার চিত্তকে বেদনায় বিমথিত করে তুলল। সে গঙ্গায় ডুবে মরতে গেল। কিন্তু সে ডুবল বটে, মরল না। গঙ্গার তরঙ্গ প্রবাহে ভেসে গেল।

(২)

অমরনাথ নামে একজন ধনী যুবক প্রথম বয়সে কিশোরী লবঙ্গলতার প্রতি আসক্ত হন। কিন্তু অমরনাথের বংশে কোনো একটি কলঙ্ক থাকায় লবঙ্গের পিতা তাঁর সঙ্গে লবঙ্গের বিয়ে দিতে চাননি। অবশেষে রামসদয় মিত্রের সঙ্গে লবঙ্গের বিবাহ হয়। অমরনাথ লবঙ্গের রূপে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হ'য়ে একদিন রাত্রে লুকিয়ে লবঙ্গকে তার পিতৃগৃহে দেখতে যান। কিন্তু সেখানে লবঙ্গের হাতে তাঁর লাঞ্ছনার অবধি রইলো না। তাঁর মুখে কাপড় চাপা দিয়ে তাঁর পরিচয় গোপন করলেও লবঙ্গ

লোকর্জন ডেকে অমরনাথের জামা খুলিয়ে তাঁর পিঠে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে "চোর" এই শব্দটি লিখে দিল। এই অপমান অমরনাথের ব্যর্থ জীবনকে আরও বেদনাময় করে তুলল। স্মৃতির দারুন যন্ত্রণা এড়াবার জন্য তিনি দেশভ্রমণে বের হলেন।

কাশীতে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে এক ব্যক্তির নিকট থেকে অমরনাথ পুলিশের অত্যাচার কাহিনী প্রসঙ্গে শুনলেন যে, হরেকৃষ্ণ দাস নামে এক ব্যক্তি তার শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাসকে তার জন্মান্ধ কন্যা রজনীকে পালন করতে দিয়েছিল। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মারা যাবার পর পুলিশ রজনী সম্বন্ধে আর কোনও অনুসন্ধান না করে তার সম্পত্তি আত্মসাৎ করে।

ভবানীনগরের বাঞ্ছারাম মিত্র ও মনোহর দাস পরম বন্ধু ছিলেন। মনোহরের সততা ও অধ্যবসায়ের জন্যই বাঞ্ছারাম ক্রমে সমৃদ্ধশালী হয়ে ওঠেন। বাঞ্ছারামের পুত্র রামসদয় একদিন মনোহর দাসকে তুচ্ছ কারণে অপমান করায় মনোহর দাস ভবানীনগর ত্যাগ করে চলে যান। বাঞ্ছারাম তাতে ক্রুদ্ধ হয়ে রামসদয়কে বাড়ী থেকে বের করে দেন। শুধু তাই নয়, তিনি উইল করে যান যে, তাঁর সম্পত্তি মনোহর দাস বা তার উত্তরাধিকারীরা পাবে। অথবা তারা কেউ জীবিত না থাকলে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদিরা তা ভোগ করবে।

হরেকৃষ্ণ দাস এই মনোহর দাসেরই ভাই। মনোহর দাস মারা যাবার পর হরেকৃষ্ণ দাসই এই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী। কিন্তু বাঞ্ছারাম মারা যাবার পর মনোহর দাসের কোনো সন্ধান না পাওয়ায় রামসদয়ের পুত্রেরা ঐ সম্পত্তি ভোগ করতে থাকেন। কিন্তু মৃত হরেকৃষ্ণ দাসের হারিয়ে যাওয়া কন্যা এই সম্পত্তির সত্যকার উত্তরাধিকারিণী।

(৩)

জীবনে রূপের তীব্র তৃষ্ণা ও প্রিয় কামনা যখন নিদারুণ অপমান ও লাঞ্ছনার মধ্যে পরিসমাপ্তি লাভ করল, অমরনাথ সেই বেদনাদায়ক স্মৃতিকে ভুলে থাকবার জন্য পরোপকার ব্রতে নিজের জীবনেক উৎসর্গ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। সেই সূত্রেই তিনি স্থির করলেন হরেকৃষ্ণ দাসের যে কন্যা এই সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হয়ে হয়ত দারিদ্র্য-দুঃখ ভোগ করছে, তাকে খুঁজে বের করবার গুরুদায়িত্ব তিনি পালন করবেন।

ঘটনাচক্রে রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখা হয়ে গেল। রজনীর দেহ যখন গঙ্গায় ভেসে যাচ্ছিল, তখন একটি গহনার নৌকো রজনীকে উদ্ধার করে। সেই

নৌকোর একজন যাত্রী রজনীকে কলকাতায় নিয়ে যাবার আশা দেখিয়ে এক জায়গায় নামল। কিন্তু এক বনের মধ্যে রজনীকে নিয়ে গিয়ে সে রজনীর ওপর অত্যাচার করতে উদ্যত হ'ল। অমরনাথ তাঁর এক গ্রাম্য আত্মীয়ের বাড়ি এসেছিলেন। একদিন প্রাতঃভ্রমণ করতে করতে তিনি এক বনের ধারে হঠাৎ এসে পড়েন। হঠাৎ সেই বনের মধ্যে থেকে তিনি নারীকণ্ঠের এক আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তখনই বনের মধ্যে ঢুকে তিনি আক্রান্তা রজনী ও এক নীচ জাতীয় ব্যক্তিকে দেখতে পেলেন।

অমরনাথ তখনই সেই ব্যক্তিকে আক্রমণ করলেন ও রজনীকে পালিয়ে যেতে বললেন। কিন্তু রজনী জানাল সে অন্ধ; তাই তার পক্ষে পালিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। এদিকে দুর্বৃত্তটি অমরনাথকে আহত করে পালিয়ে গেল। জনৈক পথিকের সাহায্যে অমরনাথ তাঁর আত্মীয়ের গৃহে ফিরে এলেন। রজনীও তাঁর সঙ্গে সঙ্গে এল। জ্ঞান ফিরে পেয়ে অমনাথ প্রশ্ন ক'রে রজনীর পরিচয় জেনে যখন নিঃসন্দেহ হলেন, তখন খানিকটা আশান্বিত হয়ে উঠলেন। পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে অমরনাথ রজনীকে কলকাতার নিয়ে গিয়ে তার কাছ থেকে সমস্ত ঘটনা জানতে চাইলেন। : নী শচীন্দ্রের প্রতি তার দুর্বলতার কথা ও অন্যত্র তার বিবাহের সম্বন্ধের কথা গোপন রেখে বাকী ঘটনা প্রকাশ করল। গোপালের স্ত্রীর প্ররোচনায় তার বাপের বাড়ি যাবার পথে কিভাবে হীরালালের দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছিল, তা বিস্তৃতভাবে বলল।

সকল বৃত্তান্ত জানতে পেরে অমরনাথ রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাকে প্রকৃত বিবরণ বললেন। এবং এ-কথাও জানালেন যে, রজনীর প্রকৃত পরিচয় তাঁর অগোচর নেই।

(৪)

এদিকে শচীন্দ্র শুনলো যে, রজনী গৃহত্যাগ করেছে। কিন্তু তার দৃঢ় বিশ্বাস রজনী ভ্রষ্টা হতে পারে না। সে নিশ্চয়ই হীরালালের প্রবঞ্চনায় অন্য কোথাও চলে গিয়েছে।

রজনী যেমন হঠাৎ চলে গিয়েছিল, তেমনি অকস্মাৎ সে ফিরে এসেছে শুনে, শচীন্দ্র বিস্মিত হ'ল। বিশেষত: রজনী ফিরে আসবার পর থেকে রাজচন্দ্র ও তার স্ত্রীর ব্যবহারের পরিবর্তনে সে অবাক হয়ে গেল। অবশেষে, অমরনাথ যখন একদিন এসে নিজেকে রজনীর ভাবী স্বামীরূপে পরিচিত করে, রজনীর প্রকৃত পরিচয় জানিয়ে শচীন্দ্রকে পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন যে, শচীন্দ্র তার পিতামাতাকে নিয়ে যে

সম্পত্তি ভোগ করছেন তা মূলতঃ রজনীরই বিষয়-সম্পত্তি। এ সংবাদে শচীন্দ্র স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পরে শচীন্দ্র উকিলের মুখে সব বিবরণ শুনে রাজনীকে সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিতে চাইল। কিন্তু রামসদয় রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দিয়ে সম্পত্তি বাঁচাবার জন্য রাজচন্দ্র দাসের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করতে লাগলেন। শচীন্দ্র সম্পত্তি রক্ষার এই হীন উপায় গ্রহণ করতে কিছুতেই রাজী হ'ল না। এই নিয়ে লবঙ্গের সঙ্গেও শচীন্দ্রের কথা কাটাকাটি হয়ে গেল।

রামসদয়ের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী আসতেন মাঝে মাঝে। তাঁর চরিত্র-মাধুর্য শচীন্দ্রকে আকৃষ্ট করেছিলো। তাঁর অলৌকিক ক্ষমতা দেখতে চাইলে তিনি শচীন্দ্রকে জানালেন আজ শচীন্দ্র স্বপ্নে তাকেই দেখতে পাবে যে তাকে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। শচীন্দ্র স্বপ্নে রজনীকে দেখে বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল।

লবঙ্গ ভেবেছিলো যে, শচীন্দ্র-রজনীর বিবাহ সে খুব সহজেই ঘটাতে পারবে। কিন্তু রজনীর পক্ষ থেকেই আপত্তি উঠলো। রাজচন্দ্র বা তার স্ত্রী পাত্র হিসেবে অমরনাথের চেয়ে শচীন্দ্রকে বেশী পছন্দ করলেও রজনী অমরনাথের উপকারের ঋণ অস্বীকার করতে চাইল না। সে অমরনাথকে বিবাহ করবে বলে স্থির করল। লবঙ্গ রজনীর কাছে গেল। অমরনাথের সামনেই রজনী লবঙ্গকে তার সমস্ত বিষয়-সম্পত্তি দানপত্র করে সমর্পণ করতে চাইল। কিন্তু লবঙ্গ তা গ্রহণ করতে চাইল না। সে গোপনে রজনীকে বারবার অনুরোধ করল শচীন্দ্রকে বিবাহ করবার জন্য। রজনী আর নিজেকে গোপন রাখতে পারল না। সে কাঁদতে কাঁদতে তার হৃদয়ের দুর্বলতার কথা লবঙ্গের কাছে প্রকাশ করে দিল। কিন্তু তার সম্মান, তার প্রাণ যে রক্ষা করেছে সেই অমরনাথ যখন তাকে বিবাহ করতে চায় সেই অনুরোধ সে ঠেলবে কি করে? লবঙ্গ তখন অমরনাথকে নিবৃত্ত করতে চেষ্টা করল। লবঙ্গ ভয় দেখাল অমরনাথকে, যদি রজনীর কাছ থেকে তিনি নিজেকে সরিয়ে না নেন, তাহ'লে লবঙ্গ বাধ্য হবে অমরনাথের প্রথম যৌবনের দুষ্কৃতির কথা রজনীকে বলে দিতে। কিন্তু অমরনাথ জানালেন তিনি নিজেই সব কথা রজনীকে বলে দেবেন। তাতে যদি রজনী তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে তো করবে।

এদিকে স্বপ্নে রজনীর প্রগাঢ় প্রেমের কথা জানতে পারার পর থেকে রজনীর মূর্তিখানি শচীন্দ্রের চোখের সামনে ভাসতে লাগল। আবার আসন্ন দারিদ্র্যের চিন্তা এড়াবার জন্য শচীন্দ্র গ্রন্থ পাঠের মধ্যে ডুবে থাকতে চাইল। অতিরিক্ত গ্রন্থপাঠের ফলে দুর্বল স্নায়ুতে রজনীর প্রেমাকুলতা এসে আঘাত করল। ফলে শচীন্দ্রের চিত্ত-

বিকার দেখা দিল। যে অন্ধ পুষ্পনারীকে সে একদিন উপেক্ষা করে বিবাহ করতে চায়নি, প্রেমের কোন্ অদৃশ্য অঙ্গুলি সংকেতে সেই রজনীরই সৌন্দর্য-মাধুর্য যখন তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে তুলেছে, তখন আর রজনীকে পাওয়ার কোনো উপায় নেই।

লবঙ্গ সবই বুঝলো। কিন্তু প্রতিকারের কোনো পথ সে খুঁজে পেল না। সে তো রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দিতে চেয়েছিল, লবঙ্গ ভাবতেও পারেনি যে, তার আশা এমনভাবে ব্যর্থ হয়ে যাবে। সে চেষ্টা করেছিলো রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের চিত্তকে আকৃষ্ট করে তুলতে। সে চেষ্টা সফল হলো বটে, কিন্তু রজনী অপ্রাপ্যা হয়ে উঠলো।

লবঙ্গের সঙ্গে আলোচনার পর একদিন অমরনাথ রজনীকে নিজের প্রথম যৌবনের দুষ্কৃতির কথা বললেন। রজনীও কাঁদতে কাঁদতে জানাল, "আমার এ পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।" রজনী অমরনাথকে অনুরোধ করল, লবঙ্গের কাছে বিস্তৃত বিবরণ শুনে নিতে। অমরনাথ তখনই লবঙ্গের কাছে গেলেন। লবঙ্গ কাঁদতে কাঁদতে অমরনাথকে শচীন্দ্রের মানসিক পীড়ার কথা জানাল। শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর দুর্বলতার কথা লবঙ্গ সব অমরনাথকে জানাল। অমরনাথ বুঝলেন "রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর।" অমরনাথ তাদের মধ্যে কেন বাধার সৃষ্টি করে থাকবেন?

অমরনাথ একদিন শচীন্দ্রকে গিয়ে জানালেন যে, তিনি বৈরাগী মানুষ, তার পক্ষে রজনীকে বিবাহ করা শোভন হবে না। শচীন্দ্র যেন রজনীর জন্য অন্য পাত্র দেখে। শচীন্দ্র জানাল যে, রজনীর পাত্রের অভাব নেই। বিদায়ের পূর্বে অমরনাথ লবঙ্গের সঙ্গে দেখা করে তাঁর সমস্ত সম্পত্তির একটি দানপত্র লবঙ্গের কাছে গচ্ছিত রাখলেন রজনীর ভবিষ্যৎ স্বামীর নামে।

দু'বছর পরের কথা। বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে বেড়াতে একদিন হঠাৎ অমরনাথ ভবানীনগরে শচীন্দ্রের বাড়ী গেলেন। শচীন্দ্র তখন কলকাতা ছেড়ে এসে ভবানীনগরে বাস করছে। রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে অমরনাথ বিস্মিত হয়ে দেখলেন যে, রজনী তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। শচীন্দ্র জানাল তাদের বাড়ীতে যে এক সন্ন্যাসী আসতেন, তিনিই দেশীয় ঔষধ দিয়ে রজনীর অন্ধত্ব দূর করে দিয়েছেন। শচীন্দ্র অমরনাথকে তাঁর দেওয়া সম্পত্তি ফেরত দিতে চাইল। কিন্তু অমরনাথ কিছুতেই তা গ্রহণ করতে রাজী হলেন না।

এমন সময় শচীন্দ্র-রজনীর এক বছরের একটি শিশু সেখানে এসে উপস্থিত হলো। কৌতূহলী অমরনাথ তার নাম জিজ্ঞাসা করলে, শচীন্দ্র জানাল তাদের পুত্রের

নাম 'অমরপ্রসাদ'। অমরনাথ সেই কৃতজ্ঞ দম্পতির কাছে আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালেন না।

পাঁচ

'রজনী' গ্রন্থের ভূমিকার বিজ্ঞাপনে বঙ্কিমচন্দ্র রজনীকে উপন্যাস বলে বর্ণনা করলেও রজনী প্রকৃতপক্ষে কতখানি উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত তা নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতভেদ দেখা যায়। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্যগুলি নিয়ে আলোচনা করলে এ সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা করা যাবে। ডঃ সুকুমার সেনের মতে "রজনী আকারে উপন্যাসের মত হইলেও প্রকারে বড় গল্পই।" অন্যদিকে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ সমালোচকেরা রজনীকে উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত বলেই চিহ্নিত করেছেন।

উপন্যাস কিনা ?

আমরা জানি, উপন্যাস নিছক আকৃতির উপর নির্ভর করে না। প্রকৃতিগত বিচারেই উপন্যাসকে উপন্যাস হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে বা যায়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' আকৃতিতে বড় হলেও ছোটগল্পের লক্ষণাক্রান্ত।

উপন্যাসের সংজ্ঞা কখনোই নির্দিষ্ট একটি কাঠামোয় স্থিরভাবে বাঁধা থাকতে পারে না। যুগে-যুগে, কালে-কালে প্রতিভাধর শিল্পীদের দ্বারা উপন্যাসের রীতি-পদ্ধতির রূপান্তর ঘটে। তাই উপন্যাসকে কোনো সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা দিয়ে কখনোই গণ্ডীবদ্ধ করে রাখা যায় না। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর কোনো গ্রন্থকেই বড় গল্প ব'লে চিহ্নিত করেননি। কিন্তু তবুও কোনো কোনো সমালোচক রজনীকে উপন্যাস নামে চিহ্নিত করতে চাননি। তাঁদের মতে উপন্যাসে ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে সমগ্র সমাজ-জীবনের প্রতিফলন ঘটে। ঘটনার নানা ঘাত-প্রতিঘাতে চরিত্র বিকশিত হয়ে ওঠে। প্রধান চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে অন্য বিষয় ও চরিত্র, ঘটনা ও পরিবেশ বিচিত্র শাখা-প্রশাখায় বিস্তার লাভ করে কাহিনীকে রূপদান করে। সুতরাং তাঁদের মতে বিশেষ একটি ব্যক্তিসত্তার প্রকাশ উপন্যাস হতে পারে না। তাঁদের মতে—"উপন্যাসের ক্ষুদ্র পরিসরের মধ্যে জগৎ ও জীবন সম্পর্কে লেখকের এমন বিশিষ্ট নায়ক-নায়িকা-নিরপেক্ষ ধারণার স্পষ্ট পরিচয় আভাসিত হইয়া উঠে, যে কাহিনী বিশেষ পাত্র-পাত্রীর জীবনের গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ হইয়া থাকিলেও, তাহার ভাব এবং নির্দেশ সেই গণ্ডিকে সর্বদাই অতিক্রম করিয়া বৃহতের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়। তখন পাঠক সেই বৃহৎ সামাজিক পরিবেশ বা জাগতিক পরিবেশের মধ্যে বিশেষ পাত্র-পাত্রীকে স্থাপন করিয়া তবে তাহাদের গ্রহণ করে। কল্পনাপ্রসূত কাহিনী

হইলেও উপন্যাস রচয়িতাকে সৃষ্টি করিতে হইবে বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিকা, বহু বৈচিত্র্য দ্বারা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির স্বাভাবিক বিকাশলাভের সুযোগ দান করিতে হইবে।”

‘রজনী’ গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী ভাগের ঘটনা-বিবৃতিকে সম্পূর্ণ গৌণ করে চরিত্রের তীব্র অনুভূতিকেই প্রধান করে তুলেছেন। রজনীর মত বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসে—তা সামাজিকই হোক বা ঐতিহাসিকই হোক বা রোমান্সধর্মীই হোক,—কোনও উপন্যাসই এত ব্যক্তিমুখী হয়ে ওঠেনি। সেখানে ব্যক্তিজীবনকে কেন্দ্র করে কোনো সামাজিক সমস্যা বা কোনও বিশেষ তত্ত্ব প্রধান হয়ে উঠেছে। এবং সেই আদর্শগুলি বা তত্ত্বটি চরিত্রের গতি-প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। চরিত্রগুলির আচরণ যেমন ঘটনার স্বাভাবিক বিকাশকে প্রভাবিত করেছে, আবার সেই ঘটনাও চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। এমনকি অতি-প্রাকৃত কোনো ঘটনা এমনভাবে চিত্রিত হয়েছে যে, তা চরিত্রের স্বাভাবিকতাকে বা ধারাবাহিকতাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি।

কিন্তু ‘রজনী’র ক্ষেত্রে এই প্রচলিত সংজ্ঞা প্রযোজ্য নয় এই কারণে যে, রজনী প্রথম মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাস। মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে বহিরঙ্গিক ঘটনার চেয়েও অনেক বেশী প্রাধান্য পায় পাত্র-পাত্রীর চরিত্রের দ্বন্দ্ব বা অন্তর্বিপ্লব। কোনো একটি ঘটনা-সূত্রকে অবলম্বন করে চরিত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ এবং তার অন্তরের অন্তস্তলে নানা আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব বিবৃত করাই লেখকের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটা নেই, কাহিনী নানা পাত্র-পাত্রীর সমাবেশে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় কর্মচঞ্চল নয়, কিন্তু মানসিক দ্বিধা-দ্বন্দ্বে এবং চিত্তের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণে এই শ্রেণীর উপন্যাস প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। তাই সাধারণ প্রচলিত উপন্যাসের সংজ্ঞা দিয়ে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিচার সব সময় যুক্তিসঙ্গত নয়। লেখকের তীক্ষ্ণ অনুভূতিপ্রবণ কবিমানস কাহিনীর সমস্ত ঘনঘটাকে অতিক্রম করে বিশেষ কোনো ব্যক্তিচরিত্রের পরিচয়কেই ব্যঞ্জনাময় করে তোলে।

প্রচলিত উপন্যাসে অন্তর্দ্বন্দ্ব চরিত্রগুলির মধ্যে প্রকাশ পায় ঠিকই, কিন্তু তা বাইরের ঘটনারই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ, অন্যদিকে মনস্তত্ত্বমূলক উপন্যাসে অন্তরের বিশ্লেষণই যেন বাইরের ঘটনাকে প্রভাবিত করে। সেখানে প্রাকৃত ঘটনাই হোক বা অতি-প্রাকৃত ঘটনাই হোক, ঘটনাবিন্যাস মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে কখনোই প্রাধান্য পায় না। তাই সেখানে ব্যক্তিচরিত্র মুখ্য হয়ে উঠবেই।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে কপালকুণ্ডলার স্বপ্নদর্শন তার চারিত্রিক প্রবণতারই

ইঙ্গিত বহন করে। কাহিনীর রসকে ঘনীভূত করে তুলতে লেখক এই পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। যে অরণ্য এবং সমুদ্র, কাপালিকের সান্নিধ্য কপালকুণ্ডলার মানস-ভঙ্গী গড়ে তুলেছে, সেই প্রভাবকে অতিক্রম করে কোনোদিনই সামাজিক মৃণ্ময়ীর আত্মপ্রকাশ ঘটল না। এখানে বাইরের প্রভাব চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে লেখকের একটি প্রতিপাদ্য বিষয় (বাল্যপ্রণয়ে অভিশাপ আছে) প্রমাণ করতেই কাহিনীর বিস্তার। সেই তত্ত্ব প্রতিপাদন করতেই আমরা কাহিনীতে দেখি শৈবলিনীর নরক দর্শন এবং তার সম্মোহন অবস্থার উক্তি। উপন্যাসের মধ্য দিয়ে লেখকের সেই বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় বা জীবন-দর্শন সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করেছে এবং সেই আদর্শ চরিত্রগুলিকেও চালনা করেছে। সেই বিশেষ বক্তব্যের সঙ্গে যে বিরোধ তাতেই চরিত্রের ঘাত-প্রতিঘাত এবং দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে চরিত্রগুলি নিয়ন্ত্রিত ও পরিণতি লাভ করেছে। এখানেও দেখি লেখকের বিশেষ বক্তব্য বা কাহিনী, ঘটনা-বৈচিত্র্য চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে লেখকের বক্তব্যকে সপ্রমাণ করতে চেয়েছে। আবার বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে আমরা দেখি কয়েকজন সামাজিক মানুষকে কেন্দ্র করে কাহিনীর বিস্তার। কৃষ্ণকান্তের উইল-এ—"সকলের অলক্ষ্যে বহির্জগতের এবং অন্তর্জগতের কত বিচিত্র প্রভাব সেখানে কাজ করিতেছে, এবং ব্যক্তিচরিত্রকে ও তাহার প্রবৃত্তিকে অমোঘভাবে নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, সমাজ, ধর্ম, নীতি, সংস্কার, আদর্শ এবং সত্য। তাই সেখানে যে অন্তর্বিপ্লব তাহা শুধু ব্যক্তিবিশেষের নিভৃত অন্তরের পরিচয় বা উন্মীলন মাত্র না হইয়া—বৃহত্তর সমাজের এবং ব্যাপকতর বিচিত্র জীবনেরও দ্যোতক হইয়া উঠিয়াছে।"

বিষবৃক্ষ, আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণী, সীতারাম উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলেও আমরা দেখব এক একটি উপন্যাস তার কাহিনী বর্ণনার অন্তরালে সমগ্র জীবন পর্যালোচনার মাধ্যমে কোনো একটি বিশেষ তত্ত্বকে প্রতিপাদন করবার চেষ্টা করেছে। যেমন, বিষবৃক্ষ উপন্যাসে বিধবা বিবাহের সামাজিক সমস্যা, দেবীচৌধুরাণী উপন্যাসে নিষ্কাম ধর্মের তত্ত্ব নারীর জীবনকে কতখানি নিয়ন্ত্রণ করে ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ তত্ত্ব উপন্যাসগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে। সেই তত্ত্বকে কেন্দ্র করেই বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনী-বিন্যাসের মাধ্যমে চরিত্রগুলিকে বাস্তব রূপ দেবার চেষ্টা করেছেন।

কিন্তু রজনী, ইন্দিরা প্রভৃতি গ্রন্থে সমাজ কোনো সময়েই কাহিনীকে প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। তাই সামাজিক উপন্যাস হিসেবে এদের চিহ্নিত করতে চাইলেও সমাজের প্রভাব, আদর্শের প্রভাব অথবা সংস্কারের প্রভাব এই কাহিনী নিয়ন্ত্রণে গৌণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। 'রজনী উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব তা কোথাও

সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির দ্বন্দ্ব নয়, ব্যক্তিসত্তার সঙ্গে ব্যক্তিসত্তার দ্বন্দ্ব। ফলে রজনী উপন্যাসের চরিত্রগুলি নিতান্ত তাদের ব্যক্তিসত্তা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাই চন্দ্রশেখর উপন্যাসে অথবা বিষবৃক্ষ উপন্যাসে সমাজের যে একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে, রজনীতে সেই বিশেষ ভূমিকা নেই। এখানে পাত্র-পাত্রীরা যেন নিজেদের স্বপ্নেই বিভোর, নিজেদের সীমিত জগতের মধ্যেই তাদের গতায়াত। সেখানে সমাজ নীরব দর্শক মাত্র। সেজন্য কাহিনীর বিবৃতি নিছক চরিত্রগুলির মানসিকতা প্রকাশের উপযোগী হিসেবে ব্যবহৃত। ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের দ্বারা চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত সম্ভাবনা বিকশিত হয়ে ওঠেনি। চরিত্রগুলি ঘটনা-প্রবাহকে পর্যবেক্ষণ করে গেছে মাত্র। প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সেজন্য এক শ্রেণীর সমালোচক রজনীকে উপন্যাস হিসেবে মেনে নিতে রাজী নন।

প্রচলিত উপন্যাসের ক্ষেত্রে ব্যাপক পটভূমিকায় কাহিনী বা চরিত্র বিশ্লেষিত হয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। কিন্তু গল্পে পটভূমিকার এত বিস্তারের প্রয়োজন নেই। বিশেষ একটি বক্তব্য কয়েকটি ঘটনার দ্বারা বিশ্লেষিত হয়ে প্রকাশ পায় অথবা চরিত্রের বিশেষ প্রবণতাকে রূপ দেয়। সেদিক দিয়ে কোনো কোনো সমালোচক রজনীকে বড় গল্প বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন। তাঁদের বক্তব্য যেহেতু, রজনীতে ব্যাপক সামাজিক পটভূমির বিস্তার নেই, ঘটনার ঘনঘটা চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করছে না এবং যেহেতু চরিত্রগুলি বিশেষ একটি উদ্দেশ্য নিয়ে পরিণতি লাভ করেছে, সেইহেতু রজনী নিছক গল্প। কিন্তু আমরা আগেই বলেছি, এই শ্রেণীর সমালোচকদের সঙ্গে আমরা একমত নই। কারণ, মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে ঘটনার ঘনঘটার তুলনায় চরিত্রের দ্বন্দ্ব অনেক বেশী প্রাধান্য পায়।

যেসব সমালোচক রজনীকে উপন্যাস বলে স্বীকার করতে চাননি, তাঁরা বলেন, "রজনীতে চারটি মাত্র চরিত্র এবং ইহাদের দ্বারাই লেখক উপাখ্যানের বর্ণনা দিয়াছেন। কিন্তু এই চারটি চরিত্র স্বীয় বৈশিষ্ট্য এবং সমগ্র ব্যক্তিত্বকে ঘটনায়, চিন্তায় বা ভাবে বিকশিত করিয়া তুলিতেছে না; একটি মাত্র বিশেষ ভাবকেই কেন্দ্র করিয়া তাহাদের পরিক্রমা চলিয়াছে—তাহা হইতেছে রজনীর প্রেম। যদিও অমরনাথের জীবনের ব্যাপকতার পরিচয় প্রদান করা হইয়াছে, তাহার অতীত জীবনের বেদনাময় স্মৃতি, তাহার আত্মানুসন্ধান, তাহার দার্শনিক মতবাদ এবং সম্পূর্ণ ভিন্ন সামাজিক পরিবেশে তাহার অবস্থিতি, বেশ একটু বিশদভাবেই বর্ণনা করা হইয়াছে, তথাপি কাহিনীর সহিত তাহার সম্বন্ধ, এবং কাহিনীর পরিণতিতে তাহার উপস্থিতির বা অস্তিত্বের একান্ত আবশ্যকতা দেখিলেই মনে হয়

উপন্যাস-রচয়িতার তীব্র আবেগ লইয়াই বঙ্কিমচন্দ্র এই উপাখ্যানকে উপন্যাস করিয়া তুলিবার চেষ্টায় এই অংশকে এতখানি পরিবর্ধিত করিয়াছেন মাত্র, প্রকৃত গল্পের বিষয়ীভূত করিতে পারেন নাই। তাই এই পরিবর্ধিত অংশকে অনাবশ্যকই বলিতে হয়, এবং উহা একপ্রকার রচনার ত্রুটি বিশেষ। যে বিরাট পটভূমিকায় চন্দ্রশেখর উপন্যাসের পরিকল্পনা করা হইয়াছে, এবং যে জীবনদর্শনকে সেখানে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভাব-বিশেষের মধ্য দিয়া প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে, 'রজনী'তে তাহার অবকাশ কোথায়? একমাত্র রজনীর প্রেমকেই কেন্দ্র করিয়া যেখানে সমস্ত কাহিনীটি অগ্রসর হইতেছে, সেখানে অমরনাথের ব্যক্তিত্বের বা দর্শনের বিশদ পরিচয় নিতান্তই অবান্তর। তাহা ছাড়া লবঙ্গলতার সহিত তাহার সম্পর্কের যে গোপন কাহিনী, অথবা পরিশেষে উভয়ের কথোপকথনের মধ্য দিয়া যে অন্য চরিত্রের উপর আলোক-সম্পাতের চেষ্টা, তাহাতে উপন্যাসের আঙ্গিকের প্রভাব পড়িলেও, লেখক সেই অংশকে মূলকাহিনীর সহিত অঙ্গাঙ্গি করিয়া যোগ করিয়া দিতে পারেন নাই। কারণ প্রথম হইতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনাতেই লবঙ্গলতা যে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিতেছে তাহা তাহারই একান্ত ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক নহে, 'রজনীর প্রেমের' প্রসঙ্গেই তাহাকে টানিয়া আনা হইয়াছে। সমস্ত কাহিনীতেই লবঙ্গলতার ব্যক্তিত্বের কোন বিকাশের অবসর নাই। অমরনাথের সহিত তাহার সাক্ষাৎটাও একেবারেই আকস্মিক, এবং এই যোগাযোগকে আর যাহাই বলা যাউক, উপন্যাসের লক্ষণ বলা যায় না। তারপর দেখি শচীন্দ্রের সম্বন্ধেও সেইরূপ কোনই পরিচয় নাই, সেই চরিত্রের কোন বিকাশ নাই। সে যেন শুধু মাত্র প্রতিভূ স্বরূপ রজনীর প্রেমকে আশ্রয়দান করিতেছে, তাহার কোন পরিচয়ই নাই। যদিও অলৌকিক উপায়ে শচীন্দ্রের মনেও রজনীর প্রতি প্রেম-আকাঙ্ক্ষা জন্মান হইয়াছে, এবং তাহা তীব্রতর হইয়া তাহাকে শয্যাশায়ী করিয়া ফেলিয়াছে, তবুও ইহার দ্বারা শচীন্দ্র-চরিত্রের উপর কোনোই আলোকপাত হয় না। কারণ যখন সে জানিতে পারিল যে, স্বপ্নদৃষ্টা রজনীই তাহাকে সর্বাপেক্ষা অধিক ভালবাসে তখনই সে নিজের প্রাণের মধ্যে তীব্র আকাঙ্ক্ষা অনুভব করিতে পারিল। ইহাতে রজনী চরিত্রকেই পরোক্ষ প্রাধান্য দেওয়া হইল এবং রজনীর প্রেমই যে এই আখ্যায়িকার একমাত্র কেন্দ্র তাহাও সুপরিস্ফুট করা হইল। লবঙ্গলতার চরিত্র সম্বন্ধে আগেই বলা হইয়াছে যে, তাহার নারী-চরিত্র যে চাতুরী, যে বুদ্ধি এবং যে তীক্ষ্ণ দীপ্তি লইয়া বর্তমান গ্রন্থে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে তাহাও রজনীর প্রেমের প্রসঙ্গেই, অন্য কোন প্রয়োজনে নহে। লবঙ্গলতার নিজস্ব জীবনের অন্যান্য সমস্ত কিছুকে সম্পূর্ণভাবে নেপথ্যে

সরাইয়া রাখিয়া একমাত্র রজনী-সংক্রান্ত ব্যাপারে তাহার যে বিশিষ্ট অংশাভিনয়— তাহাই বর্তমান গ্রন্থে বলা হইয়াছে। অমরনাথ-সংক্রান্ত যে ভাবাবেগ বা যে কাহিনীর উল্লেখ রহিয়াছে, তাহার সহিত যে গল্পের মূল বিষয়বস্তুর বিশেষ কোনোই যোগ নাই, তাহা আগে বলা হইয়াছে।

তারপর, রজনীর চরিত্র। এই চরিত্র বর্ণনার বিশেষত্ব এই যে, তাহার জীবনের অন্য সমস্ত কিছু পরিচয় সযত্নে পরিবর্জন করিয়া একটি মাত্র কেন্দ্রেই ইহাকে প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। তাহা হইতেছে তাহার প্রেম। তারপর রজনীর নিজের কথাতেই নিজের কাহিনী বর্ণনা করার দরুন এই কেন্দ্রীভূত ভাবটি আরও নির্দিষ্ট হইয়া গিয়াছে। বঙ্কিমচন্দ্র যদি নিজের কথায় বলিতে যাইতেন তাহা হইলে হয়ত আরও বর্ণনা, আরও আনুপূর্বিক পরিচয় দিতে পারিতেন।

ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় রজনীর সমালোচনা প্রসঙ্গে তাঁহার 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'র মধ্যে বলিয়াছেন যে, "বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে একটি অনুভূতিশীল কবি-প্রকৃতি ছিল। ঐতিহাসিক বা সামাজিক উপন্যাসগুলির মধ্যে সেই কবি-মানস অলক্ষ্যে প্রভাব-বিস্তার করিলেও কখনই তাহা স্বাধীন অবকাশ সৃজন করিয়া লইতে পারে নাই। 'রজনী'র মধ্যে তাঁহার সেই কবি-মানসেরই অতি সুন্দর এবং স্বাভাবিক উন্মীলন আমাদের কাছে ধরা পড়ে। এখানে যেন তিনি অন্য সমস্ত কিছু হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া আপন অনুভূতি দ্বারা একটি মাত্র রমণীয় পরিবেশ-রচনায় নিমগ্ন। রজনীর প্রেম ছাড়া বিষয়ান্তরের প্রতি তাঁহার উদাসীনতা অত্যন্ত প্রত্যক্ষ—এবং ঔপন্যাসিক হইয়াও বঙ্কিমচন্দ্র সেই আকর্ষণকে সযত্নে যেন পরিহার করিয়া চলিয়াছেন।

তাই রজনীর সাহিত্যিক সংজ্ঞা নির্ধারণ করিতে গেলে, ইহাকে বড় গল্পের সমগোত্র বলিয়াই নির্দেশিত করিতে হয়, উপন্যাস বলা চলে না"।

আমরা এই মতকে সর্বাংশে মেনে নিতে পারি না। অবশ্য এ কথা সত্য বঙ্কিমচন্দ্র যে যুগে 'রজনী' রচনা করেছিলেন, সে যুগে উপন্যাসের প্রচলিত সংজ্ঞানুসারে রজনী হয়ত উপন্যাস লক্ষণাক্রান্ত নয়। কিন্তু একথা মনে রাখা দরকার মহৎ শিল্পী যিনি, তিনি সব সময়ই কালকে অতিক্রম করে বিরাজ করেন। তাই পরবর্তীকালে মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এই ধরনের চরিত্র-কেন্দ্রিক দ্বন্দ্ব, ঘটনার বিরলতা লক্ষ্য করা যায়। আমরা এই প্রসঙ্গে উপন্যাসের সাধারণ লক্ষণ সম্পর্কে দু'চার কথা আলোচনা করতে পারি। উপন্যাসে প্লট (Plot) থাকবে অর্থাৎ একটা কাহিনী থাকবে। থাকবে ব্যক্তির চরিত্র-চিত্রণ (characterization)। তৃতীয়তঃ, কাহিনী ও চরিত্রের বর্ণনা

(narration)। চতুর্থতঃ, পাত্র-পাত্রীর সংলাপ (dialogue)। সর্বোপরি কাহিনী বর্ণনের মধ্যে যেমন পরিবেশ বা পটভূমিকা রচনা করতে হবে, তেমনি সমগ্র উপন্যাস ঘিরে লেখকের একটি বিশেষ মানসভঙ্গী বা style প্রকাশ পাবে। এই ছিল বঙ্কিমযুগের উপন্যাসের প্রচলিত সর্বজনস্বীকৃত রীতি। কিন্তু সংজ্ঞার রূপান্তর যুগে যুগে পরিবর্তিত হবেই। যেমন tragedy-র সংজ্ঞা বিশেষ এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় গোপাল হালদারের মন্তব্যটি সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—"নভেলে · প্রথমে প্রধান হয়ে উঠেছিল ঘটনা ও ঘটনাশ্রয়ে চরিত্র-চিত্র। তারপরে নভেলে ঘটনা হতে থাকে গৌণ, বর্ণনা ও সংলাপও তাই। চরিত্রই প্রাধান্য পায়। বিংশ শতাব্দীতে এসে ঘটনা গিয়েছে আরও কমে, চরিত্রের স্থানে অন্তর্জীবন হয়েছে প্রধান বস্তু। এখন উপন্যাস বিচারে তাই পূর্বেকার ওসব লক্ষণকে (অন্ততঃ প্লট, বর্ণনা ও সংলাপকে) বলা যায় 'এহ বাহ্য'। চরিত্র প্রায় স্থানচ্যুত হয়েছে ব্যক্তির অন্তর্জীবনের বিশ্লেষণে। আরও কথা আছে, এ সকলের মধ্যে যে আরেকটা বস্তু প্রচ্ছন্ন আছে পূর্বে তা পৃথক করে দেখা হোতো না, এখন হয়। সে বিষয়কে স্থূল ভাষায় বলা যায় লেখক কি বলতে চাইছেন। কি লেখকের বক্তব্য।…সেই উপন্যাস তত সার্থক যে উপন্যাসে এই কথা-বস্তু, ভাব-বস্তু, চরিত্র-চিত্র ও প্রকাশ রীতির যত সুসমতা ঘটে, তার আর্ট তত উৎকৃষ্ট। কিন্তু সেই উপন্যাসই তত শ্রেষ্ঠ এবং মহৎ, যাতে সে সব গুণ নিয়ে এবং তা ছাড়িয়ে জীবনসত্য এবং মানবসত্য লেখকের জীবনবোধে যত রূপায়িত হয়ে ওঠে।…উপন্যাস কি এবং কি নয় এখনকার দিনে তা বলা কঠিন।…নভেল বা উপন্যাস জীবনের ব্যাখ্যা, তার মুখ্য উপাদান সমাজ বা সমাজের মানুষ, জীবন। জীবন ছক কেটে চলে না। তাই উপন্যাসকেও কোনো লক্ষণের ছকে বাঁধা যায়নি। উপন্যাসের লক্ষ্য জীবনবৃত্ত রচনা—জীবনসত্য মানবসত্যের উপলব্ধি।"

তাই রজনী উপন্যাসে রজনীর প্রেম ও তার মহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে রজনী, অমরনাথ, শচীন্দ্র, লবঙ্গলতাকে কেন্দ্র করে যে মানসিক দ্বন্দ্ব, তা যত তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের উত্থানপতনে, ঘটনার নিয়ন্ত্রণে তা ততখানি প্রভাব বিস্তার করেনি। তাই কাহিনীর সূত্রের ওপরে এই চারটি চরিত্র যে মালা রচনা করেছে, ঘটনার বৈচিত্র্যে দৃষ্টিলোভাতুর হয়ে না উঠলেও মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে সহজেই চিত্তকে আকৃষ্ট করে। তাই প্রাচীন সংজ্ঞার ছকে মেলেনি বলে তাকে উপন্যাস বলা চলবে না—এ মত মেনে নিতে আমরা রাজী নই। মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসের বিচারে আমরা রজনীকে উপন্যাস বলেই চিহ্নিত করবো।

ছয়

জীবনে ব্যক্তিগত নামকরণের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য সব সময় প্রকাশ পায় না। কানা ছেলের নাম পদ্মলোচন বা কালো মেয়েটির নামকরণ করলাম পূর্ণিমা। জীবনের ক্ষেত্রে নামকরণ সব সময় অর্থবহ হয় না। কিন্তু সাহিত্যের ক্ষেত্রে নামকরণ অর্থবহ এবং তাৎপর্যমণ্ডিত হতেই হবে।

নামকরণের সার্থকতা

উপন্যাস বা নাটকে নামকরণের রীতি-বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে নামকরণ করা হয় নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীর নামকরণ অনুসারে। এ ধরনের নামকরণ আমরা বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র সকলের রচনাতেই লক্ষ্য করেছি। যেমন কপালকুণ্ডলা, সীতারাম, মৃণালিনী, ইন্দিরা অথবা গোরা বা দেবদাস, বিপ্রদাস, কাশীনাথ ইত্যাদি। কখনও বা এই নামকরণ উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়ের উপর লক্ষ্য রেখে করা হয়। কখনও বা উপন্যাসের পরিণতির দিকে লক্ষ্য রেখে নামকরণ করা হয়।

'রজনী' উপন্যাসের নামকরণের মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্র একাধিক উদ্দেশ্য সাধিত করেছেন। রজনী নামকরণের মধ্যে শুধু অন্যতম প্রধান চরিত্রকেই নির্দেশ করা হয়নি, উপরন্তু রজনী নামকরণের মধ্যে অন্ধকারময়তার ইঙ্গিতটুকুও রয়েছে। রজনী অন্ধ যুবতী। সেই অন্ধত্বের যে অন্ধকারময়তা রয়েছে, সেই চির অন্ধকারময় জগতের অধিবাসী রজনী। কারণ রজনী আলোর স্পর্শলাভে বঞ্চিতা। জ্যোৎস্নার আলোকে আলোকিত রজনীর নিজস্ব কোনো আলোক নেই। তাই অন্ধ যুবতী রজনীর অনুভূতির জগতে যা কিছু প্রকাশ তা অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, উপন্যাসের নাম 'রজনী' রাখার সার্থকতা কতখানি। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাসের ভূমিকায় যা বলেছেন তাতে দেখি, একটি অন্ধ নারীর নৈতিক ও মানসিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করাই তাঁর এই উপন্যাস রচনার উদ্দেশ্য এবং অন্ধ ফুলওয়ালী নিদিয়া-চরিত্রটি রজনী-চরিত্র সৃষ্টিতে তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছে। এই উপন্যাসে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কার্যকলাপ এবং বক্তব্য উপস্থাপনা রজনী-কেন্দ্রিক। যে অমরনাথ সমগ্র কাহিনীতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন, সেই অমরনাথের কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ রজনীকে ঘিরেই। পরিত্যক্ত রজনীকে গঙ্গাতীরে দুর্বৃত্তের দ্বারা আক্রান্ত অবস্থায় অমরনাথ উদ্ধার করেছেন এবং রজনীকে নিয়ে অমরনাথ-চরিত্রের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায়। রজনীকে নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন, রজনীর পিতৃমাতৃপরিচয়ের রহস্য উদ্ঘাটিত করেছেন। শেষে রজনীর হৃতসম্পত্তি উদ্ধার করে রজনীর ভাগ্য পরিবর্তনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। রজনীকে বিবাহ

করে তাকে সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন অমরনাথ। শেষে শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর দুর্বলতার সংবাদ জানতে পেয়ে, অমরনাথ রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের মিলন ঘটিয়েই ক্ষান্ত হননি, তাঁর নিজের সমস্ত সম্পত্তি রজনীর স্বামীর নামে দানপত্র করে সংসার থেকে বিদায় নিয়েছেন। শেষে রজনীর দৃষ্টিলাভ ও সন্তানলাভের মধ্যে কাহিনীর সমাপ্তি-সংবাদটুকু অমরনাথের কাছে অজ্ঞাত থাকেনি। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, অমরনাথের মত কর্মী চরিত্রটির যা কিছু কর্মোদ্দীপনা এই উপন্যাসে বিবৃত, তার সবটুকুই রজনী-কেন্দ্রিক। অমরনাথের পূর্বজীবন এবং তাঁর জীবনের একটি কলঙ্কজনক অধ্যায় ঘটনাচক্রে যে প্রকাশ পেয়েছে, তা রজনীর জীবনের ঘটনাসূত্র প্রসঙ্গেই। সেদিক দিয়ে উপন্যাসের রজনী নামকরণ সার্থক।

অন্য দুটি চরিত্র লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র—তাদের কার্যকলাপ রজনীকে কেন্দ্র করেই আত্মপ্রকাশ করেছে। অমরনাথ কর্তৃক রজনীর ভাগ্য পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে একদিকে লবঙ্গলতা রজনী সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে, অন্যদিকে শচীন্দ্রের আগ্রহ ও কৌতূহল মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। লবঙ্গলতা ও অমরনাথের কাহিনী রজনী প্রসঙ্গেই উপন্যাসে বর্ণিত। রামসদয় মিত্রের পারিবারিক জীবনের বর্ণনা রজনীর মাধ্যমেই লেখক বিবৃত করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র উপন্যাস শুরু করেছেন রজনীর মাধ্যমে কাহিনী বর্ণনার মধ্য দিয়ে। লবঙ্গ রজনীকে নিছক ফুলওয়ালী বলে মনে করেনি। অন্যদিকে শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর প্রথম সাক্ষাৎকারে শচীন্দ্র রজনী সম্পর্কে যে আগ্রহ দেখিয়েছে, সেটাও কাহিনীতে রজনীর গুরুত্বই বাড়িয়েছে। তারপর ঘটনার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আমরা লক্ষ্য করি লবঙ্গ কর্তৃক রজনীর বিবাহের উদ্‌যোগ। এ ব্যাপারে শচীন্দ্রের আগ্রহ, শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর অনুরাগ, বিবাহের পূর্বে রজনীর গৃহত্যাগ, শেষে অমরনাথের সাহায্যে রজনীর উদ্ধারলাভ ও নতুন জীবনের সূত্রপাত আমরা লক্ষ্য করি। অমরনাথ কর্তৃক রজনীর সম্পত্তি উদ্ধার এবং সেই সম্পত্তির ভোগ-দখলকারী বর্তমানে রামসদয়ের পরিবারভুক্ত লবঙ্গ ও শচীন্দ্র হওয়ায় কাহিনীতে রজনীর গুরুত্ব এবং ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে গেছে। তারপর রজনীকে কেন্দ্র করে লবঙ্গ-অমরনাথের বিরোধ ও সংঘর্ষ, সেই সূত্রে তাদের প্রণয়ের পূর্ব-কাহিনীর উল্লেখ, রজনীকে অমরনাথের বিবাহ করার প্রস্তাবে লবঙ্গলতার চিত্তচাঞ্চল্য, শচীন্দ্রের মানসিক বিকার, শেষে অমরনাথের স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়ে রজনী-শচীন্দ্রের মিলন, রজনীর সন্তানলাভ ও দৃষ্টিলাভের মধ্য দিয়ে কাহিনীর সমাপ্তি। কখনও প্রত্যক্ষভাবে, কখনও পরোক্ষভাবে রজনীকেই সমগ্র কাহিনী পরিবৃত করে রেখেছে। রজনী কোনোও ক্ষেত্রেই কর্মচঞ্চলতার দিক দিয়ে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি

সত্য, সেদিক দিয়ে লবঙ্গলতা অনেক বেশী কর্মমুখর। তৎসত্ত্বেও সমগ্র কাহিনীর বিস্তার এবং বিন্যাস রজনী-কেন্দ্রিক। সেদিক দিয়ে বিচার করলে উপন্যাসের 'রজনী' নামকরণের সার্থকতা অনস্বীকার্য।

আমরা আগেই বলেছি, উপন্যাসের নামকরণ মুখ্য পাত্র-পাত্রীর নামের দ্বারা চিহ্নিত হতে পারে বা বক্তব্য বিষয়ের দ্বারা প্রকাশ পেতে পারে। এখানে রজনী উপন্যাসে মুখ্য চরিত্র রজনীর নামে উপন্যাসের নামকরণ করে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থ ও সার্থক।

সাত

সামাজিক পটভূমি ও তৎকালীন সমাজজীবন

অপেক্ষাকৃত আধুনিককাল নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যে ক'টি উপন্যাস লিখেছেন তার মধ্যে 'রজনী' বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রধানতঃ চারটি সামাজিক উপন্যাস লিখেছেন—বিষবৃক্ষ, ইন্দিরা, কৃষ্ণকান্তের উইল এবং রজনী। এই চারটি উপন্যাসের মধ্যে রজনী শুধু আধুনিক কালের নয়, কলকাতা শহরকে উপন্যাসে উল্লেখযোগ্য পটভূমি হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমচন্দ্র এই উপন্যাসে কলকাতা শহর ও ভবানীনগর গ্রাম বর্ণনা করতে গিয়ে শহর এবং গ্রামের পটভূমিকা রচনা করেছেন।

আমাদের মনের কতকগুলি বিশেষ সামাজিক রীতি দিয়ে এই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় যে, রজনী আধুনিককালের। রজনী কুমারী অবস্থায় বিশটি বসন্ত কাটিয়েছে। যদিও, গোপাল বসু যখন বয়স্থা মেয়ে বিবাহ করতে চেয়েছে, তখন রজনীর একটি মন্তব্য স্মরণীয়—"টাকার লোভে সে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে।" শুধু তাই নয়, হীরালাল বাল্যবিবাহের নিন্দা করে বয়স্থা মেয়ে বিবাহের কথা উল্লেখ করেছে, এর দ্বারা সেই সময়ের মানসিকতার পরিচয় ধরা পড়ে। রজনী নিজের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছে, "বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল। তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল।...পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন...মির্জাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন।"

রজনীর রচনাকাল ১৮৭৭। অর্থাৎ আজ থেকে একশো তিন বছর আগে এবং উপন্যাসে বর্ণিত ঘটনাকালও সেই সময়েরই হবে বলে আমাদের বিশ্বাস। তখন গ্রামজীবন ছেড়ে সচ্ছল পরিবারের মানুষেরা শহরজীবনে এসে বসবাস শুরু করেছেন,

কিন্তু আজকের মতো গ্রামের বাস্তুভিটার প্রতি আকর্ষণ লোপ পায়নি। ফলে গ্রামজীবন ও নগরজীবন এইসব পরিবারের লোকের কাছে সমানভাবেই উপভোগ্য ছিল। আর একদল মানুষ গ্রাম ছেড়ে শহরে ভিড় করেছিল জীবিকার প্রয়োজনে। ফলে গ্রাম-জীবনের অভাব-অনটনে বাস্তুত্যাগী মানুষের ভিড়ে আমরা দেখি একশ্রেণীর অর্থবান মানুষকে আধুনিক জীবনযাত্রায় সুখদুঃখের প্রতি যারা আকৃষ্ট হয়ে শহরবাসী।

কলকাতার বর্ণনায় রজনী মনুমেণ্টের উল্লেখ করেছে। অর্থাৎ ঘটনাকাল মনুমেণ্ট সৃষ্টির পরবর্তীকালের। রজনী উপন্যাসকে কেন্দ্র করে যে সমস্যা দেখা দিয়েছে, তা সামাজিক সমস্যা নয়, মনস্তাত্ত্বিক সমস্যা। অর্থাৎ, রজনী-শচীন্দ্র-লবঙ্গলতা-অমরনাথ চরিত্রগুলিকে কেন্দ্র করে যে দ্বন্দ্ব এবং কাহিনী যেভাবে অগ্রগতি লাভ করে পরিণতির দিকে এগিয়ে গেছে, সেখানে সামাজিক কোনো সমস্যা কাহিনী নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেনি।

তাই বিষবৃক্ষ বা কৃষ্ণকান্তের উইলকে আমরা যে অর্থে সামাজিক উপন্যাস বলে চিহ্নিত করি, রজনী উপন্যাসে সে ধরনের কোনো সমস্যাই নেই। তাই কুড়ি বছর বয়সের রজনীকে কুমারী অবস্থায় দেখেও কোনো সামাজিক প্রতিক্রিয়া নেই, কারণ নগর-কেন্দ্রিক জীবনে সামাজিক প্রতিক্রিয়া গৌণ।

ফুলওয়ালী বলে পরিচিত রজনী যখন ধনী রামসদয়ের গৃহে শচীন্দ্রের সাক্ষাৎ পেয়েছে, সেখানে শচীন্দ্রের বা লবঙ্গলতার আচরণ কোনো ক্ষেত্রেই হৃদয়হীন মৌখিক আলাপে পর্যবসিত হয়নি।

আমরা জানি, আধুনিককালে আমরা নর-নারীর প্রেমঘটিত দ্বন্দ্ব বা প্রকাশকে যত সহজে গ্রহণ করি, শতবর্ষ পূর্বে আমাদের সামাজিক পরিবেশ অতখানি স্বাভাবিক ছিল না। কিন্তু রজনী সামাজিক সমস্যামূলক উপন্যাস নয় বলেই, রজনী পুষ্পনারী হওয়া সত্ত্বেও শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রেমে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। অমরনাথ লবঙ্গলতাকে বালিকাবয়সে লেখাপড়া শিখিয়েছে, সেই শিষ্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত অমরনাথ লবঙ্গের হাতে আঘাত পেয়েছে সত্য, কিন্তু কোনো সামাজিক আলোড়ন এক্ষেত্রে প্রকাশ পায়নি। অমরনাথ রজনীকে উদ্ধার করে কলকাতার বাড়ীতে ফিরে এসেছে, রজনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে, রজনী সে ব্যাপারে সম্মতি দিয়েছে—এসব ক্ষেত্রে অকারণ কুণ্ঠা বা সংকোচ তাদের চিত্তপ্রকাশে অন্তরায় হয়ে ওঠেনি। শচীন্দ্র-রজনীর প্রেম-সম্পর্কের চিত্র যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছেন, সেখানে সামাজিক নেতা হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র কোনো ক্ষেত্রেই শাসনদণ্ড তুলে ধরেননি। সবচেয়ে লক্ষণীয় বিষয় লবঙ্গলতার অমরনাথের প্রতি গোপন আসক্তি। বিবাহিতা নারী দাম্পত্য জীবনের

দায়দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করেও অন্তরের অন্তস্তলে অন্য পুরুষের প্রতি দুর্বলতাকে লালন করেছে, সেখানে বঙ্কিমচন্দ্র লবঙ্গলতার প্রতি কটু মন্তব্য কখনোই করেননি। বরং পরম দরদে লবঙ্গ-অমরনাথের এই ব্যর্থ প্রণয়কে চিত্রিত করেছেন। লবঙ্গ মুখে দু-একটি নীতিকথা শুনিয়েছে বটে, কিন্তু তার হৃদয়ের দুর্বলতা, প্রণয়ের ফল্গুধারার তীব্র বেগ এই সমান্য নীতিকথার আবরণকে ছিন্ন করে প্রবাহিত হয়েছে। সুতরাং প্রেমঘটিত এই কাহিনী গ্রন্থনে যেমন বক্তারা হৃদয় উদ্‌ঘাটিত করতে কুণ্ঠাবোধ করেননি, ঠিক তেমনি সামাজিক কোনো বাধা অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। এর কারণ, যে সামাজিক পটভূমিকায় এই কাহিনীর গ্রন্থন, সেখানে সমাজের ভূমিকা নিতান্তই গৌণ, মুখ্য হচ্ছে হৃদয়ঘটিত নানা মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব।

রজনী গ্রন্থের কাহিনীকাল যে উনিশ শতকের শেষপাদে এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। যুবতী রজনীকে যুবক শচীন্দ্র যেভাবে বিনা সংকোচে হাত ধরে সিঁড়িতে উঠিয়ে নিয়ে গেছে, তা আধুনিকালেই সম্ভব। তাছাড়া, মধ্যরাত্রে চাপা যেভাবে রজনীকে সঙ্গে নিয়ে পথে বেরিয়েছে বা হীরালাল রজনীকে নিয়ে যাত্রা করেছে, তা আধুনিককালের ঘটনা। তবে, তখনও যে পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোক আমাদের চিত্তকে সম্পূর্ণ সংস্কারমুক্ত করতে পারেনি, তার প্রমাণও গ্রন্থে পাই। অমরনাথ এবং শচীন্দ্রের কথাবার্তার মধ্যে যে বিদগ্ধ মনের পরিচয় পেয়েছি, তা ইংরেজী শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক যুবকের কথাই মনে করিয়ে দেয়। ইংরেজী এবং সংস্কৃত সাহিত্যে, ইতিহাস ও দর্শনে অমরনাথের পাণ্ডিত্য সহজেই অন্যের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছে। কিন্তু সেই অমরনাথের বিবাহ বারবার ভেঙে গেছে, তার বংশের কোনো এক খুল্লতাত পত্নী কুলত্যাগ করেছিলেন বলে। এই সংস্কার সেই যুগে গুরুত্ব পেতো। কারণ, ব্যক্তিগত পরিচয়ের চেয়েও পারিবারিক পরিচয় তখন সামাজিক জীবনে প্রাধান্য পেতো। রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী বঙ্কিমচন্দ্র বর্ণনা করেছেন, সেখানেও কাহিনী যে আধুনিককালের তা বুঝতে আমাদের কোনো অসুবিধা হয় না। কিন্তু সন্ন্যাসীর অলৌকিক ক্রিয়া, নলচালা, হাতগোনা ইত্যাদি ব্যাপার সাধারণ মানুষের চিত্তে যে গভীর প্রভাব বিস্তার করত, ভারতীয় গুরুবাদের দেশে অত্যাধুনিক কালেও তা সমানভাবে রয়েছে। রজনীর জন্য শচীন্দ্রের যে বিলাপ এবং তার জন্য সন্ন্যাসীর যে প্রভাব, কোনো ক্ষেত্রেই সমাজ সেখানে ধিক্কার দেয়নি। কাহিনীর শেষ দিকে আকস্মিকভাবে যখন অমরনাথ ভবানীনগরে রজনী-শচীন্দ্রের দাম্পত্য জীবনের সাক্ষাৎ পেয়েছেন, সেই সময় শচীন্দ্রের মানসিকতা লক্ষণীয়: "রজনী ফুলওয়ালী ছিল। পাছে কলিকাতায় ইহাকে লোকে ঘৃণা করে এই ভাবিয়া তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ

করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন।" এখানে শচীন্দ্রের যে আশঙ্কা তা সমাজঘটিত নয়, নিতান্তই মানসিক।

সুতরাং আমরা দেখি যে, **রজনী** গ্রন্থে যে সামাজিক-জীবন চিত্রিত, তা নিতান্তই পটভূমিকায় রয়েছে। কাহিনীর বিস্তারে বা অগ্রগতিতে তার কোনোও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেই এবং সে পটভূমি উনিশ শতকের শেষার্ধের কলকাতার জীবন। ভবানীনগরের মত গ্রামজীবনে গ্রামীণ সংস্কার কোনোভাবেই কাহিনীকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাছাড়া, এই কাহিনী থেকে আমরা তৎকালীন সামাজজীবন সম্পর্কে কিছু খুঁটিনাটি ধারণা আহরণ করতে পারি বটে, কিন্তু সমাজজীবনের সামগ্রিক পরিচিতি পাই না। তাই রজনীকে আমরা নিছক সামাজিক উপন্যাস বলে মেনে নিতে পারি না। বরং তা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস।

আট

বঙ্কিম-মানস ও যুগপ্রভাব

বঙ্কিমচন্দ্রের আবির্ভাবকাল উনিশ শতকের মধ্যভাগে। এই সময়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নতুন বাঁক নেবার মুখে দাঁড়িয়ে। পরাধীন ভারত প্রথম আত্মজাগরণে তথা আত্মোপলব্ধিতে জেগে উঠল সিপাহী বিদ্রোহের ঘটনাকে কেন্দ্র করে। সেই সময় থেকে রাজনৈতিক জীবনের নতুন উপলব্ধি ভারতীয় তথা বাঙালীকে জাতীয়তাবোধে জাগ্রত করল। এর পশ্চাতে যে কারণটি সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য তা হচ্ছে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনাদর্শের প্রতি ভারতীয় চিত্তের আসক্তি। পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের সঙ্গে প্রাচ্য জীবনাদর্শের ও বিশ্বাসের সংঘর্ষ এই সময়ে বাঙালী মানসিকতায় এক সংকটের সৃষ্টি করল। এর কারণ, বাঙালীই ভারতীয়দের মধ্যে প্রথম পাশ্চাত্য জীবনাদর্শকে গ্রহণ করেছিল। যে যুগে অন্য প্রদেশ ইংরেজী শিক্ষার প্রভাব থেকে নিজেদের গা বাঁচিয়ে সংকীর্ণতার অন্ধকূপে আত্মগোপনে তৎপর, সেই সময় বাঙালী প্রথম পাশ্চাত্য শিক্ষা ও চিন্তাধারাকে সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ফলে, সেই আমন্ত্রণের সদর দরজা দিয়ে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের ও চিন্তাধারার অমৃত ও বিষ বাঙালী জীবনে প্রভাব বিস্তার করল।

পাশ্চাত্য জীবনের সেই বিষময় প্রতিক্রিয়ার ফলস্বরূপ আমরা দেখলাম 'Young Bengal' গোষ্ঠীকে। যে সম্প্রদায় পাশ্চাত্য জীবনের বহিরঙ্গ আচরণের প্রতি প্রলুব্ধ হ'য়ে সেই জীবনকে অনুকরণ করার মধ্যে জীবনের চরম সার্থকতা খুঁজে পেলো। সুরাপান, নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ, সভা-সমিতির মধ্য দিয়ে স্ত্রী-স্বাধীনতার আন্দোলনের

নামে ব্যভিচার এক শ্রেণীর বাঙালী জীবনকে পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করল। এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তি ও মহিমাকে গ্রহণ করে বাঙালী জীবনে অমৃত প্রবাহের আস্বাদ আমরা লক্ষ্য করলাম।

এই অমৃতধারায় স্নাত নতুন বাংলা তার নতুন চিত্ত নিয়ে জেগে উঠল। আমরা জানি, দুই বিপরীত শক্তির স্বাভাবিক মিলনে নতুন জীবনের সূচনা। জৈব জীবনে নারী ও পুরুষ এই দুই বিপরীত শক্তির মিলনের ফলেই নবজাতকের আবির্ভাব সম্ভব। ঠিক তেমনি, পাশ্চাত্য জীবনের অন্তর্নিহিত শক্তির বীজ যখন বাংলার পরিণত চিত্তে রোপিত হল, সেই কর্ষিত চিত্তক্ষেত্র নতুন শক্তিতে সমৃদ্ধ ফলে-ফুলে ভরে উঠল। সেই নতুন ফসল উনিশ শতকের শেষ পর্বের বাংলাদেশকে বিস্ময়করভাবে ভরিয়ে তুলল। ফলে, আমরা লক্ষ্য করলাম ভারতের অন্যান্য প্রদেশ যখন নিদ্রিত, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও জীবনাদর্শকে গ্রহণ করে উনিশ শতকের বাংলা নতুনভাবে জেগে উঠল।

এখন আমাদের মনে প্রশ্ন জাগতে পারে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের অন্তর্নিহিত তত্ত্বটি কি? পুরুষ ও প্রকৃতি বিশ্বের লীলাভূমিতে অভিনয় করে চলেছে। তাদের এই লীলা-চঞ্চল আবর্তে প্রবৃত্তি এবং নিবৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। প্রাচ্য জীবনাদর্শ তথা ভারতবর্ষ অধ্যাত্মবাদের দেশ। ভারতীয় জীবনে আমরা লৌকিক আচার-আচরণ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক জীবনকে সমধিক গুরুত্ব দিয়েছি। এই ভারতীয় জীবন দেহ অপেক্ষা আত্মাকে, প্রবৃত্তি অপেক্ষা নিবৃত্তিকে অনেক গুরুত্ব দিয়েছে। লৌকিক জীবনের পাওয়াটাই একমাত্র সত্য নয়, এ জীবনে যা পেলাম না, জীবনান্তরে তাকে নিশ্চয়ই পাব, এ বিশ্বাস ভারতীয় বিশ্বাস। তাই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে শ্রীরাধার মিলন চরম সার্থক ভাবসম্মিলনে। এই জীবনান্তরে বা জীবনাতীতের প্রতি বিশ্বাস ভারতীয় জীবনে বিচ্ছেদকে কখনও সত্য বলে স্বীকার করেনি।

কিন্তু পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ যুক্তিবাদ, জড়বাদ, তথা দেহবাদকে সত্য বলে স্বীকার করেছে। তাই পাশ্চাত্য জীবন আত্মা অপেক্ষা দেহকেই বড় করে দেখেছে। এই জড়বাদী বিশ্বাস লৌকিক জীবনকে সব সময় গুরুত্ব দিয়েছে। এই জাগতিক প্রাপ্তিকে বা লাভক্ষতিকেই পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ প্রাধান্য দিয়েছে।

উনিশ শতকের মধ্যভাগে পাশ্চাত্য জীবনাদর্শ যখন বাঙালী চিত্তকে প্রভাবিত করল, তখন দুই বিপরীত জীবনাদর্শের সংঘর্ষ ও সমন্বয়ে নতুন জীবনধারা শতমুখে প্রবাহিত হয়ে বাংলাদেশকে সমৃদ্ধিতে ভরিয়ে তুলল জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সাহিত্যে আমরা পেলাম রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র থেকে শুরু করে রবীন্দ্রনাথকে; বিজ্ঞানে জগদীশচন্দ্র, প্রফুল্লচন্দ্রকে; ধর্মে রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দকে; রাজনীতিতে

সুরেন্দ্রনাথকে; সামজসংস্কারে ভূদেব, কেশবচন্দ্রকে; শিক্ষায় আশুতোষকে অর্থাৎ, মানবজ্ঞানের বিচিত্র শাখায় আমরা নবজাগ্রত জাতির বিরাট প্রতিভাশালী ব্যক্তিদের একত্র সমাবেশ দেখলাম; যে ধরনের একত্র সমাবেশ ও জাগরণ বিশ্বের ইতিহাসে বিরল।

জীবনের এই বিচিত্র বিকাশে উনিশ শতকে যে মন্ত্রটি সমস্ত কিছুকে নিয়ন্ত্রণ করেছে, তা হচ্ছে যুক্তি বা Reason। সমাজতত্ত্ববিদেরা বলেন, কৃষিবিজ্ঞানে যেমন একটা জমিতে ফসল ফলাতে নানা প্রক্রিয়ায় ফসলের পরিমাণ বাড়ানোর চেষ্টা চলে। কিন্তু শেষে এমন একটা সময় আসে, যখন জমিকে বন্ধ্যা অবস্থায় ফেলে না রাখলে আর ভাল ফসল পাওয়া যায় না। এই বিরতিটুকু দরকার জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সারাদিনের কর্মক্লান্তির পর রাত্রির অবসর যেমন অপরিহার্য, তেমনি এই বিরতিটুকুও প্রয়োজন।

সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতক বাঙালী জীবনে সেই বিরতি পর্ব ছিল, যোড়শ শতকের স্বর্ণযুগের পর। তাই দুই শতাব্দীর বিরতির পর নতুন শক্তির মিলনে উনিশ শতকের বাঙালী চিত্তের এই বিস্ময়কর সমৃদ্ধি।

আমরা বলেছি, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের যে সংঘর্ষ, তা দেহবাদ ও অধ্যাত্ম-বাদের সংঘর্ষ। এই দুই বিপরীত শক্তির সংঘর্ষে বাঙালীর জাতীয় জীবনে ও চিন্তায় সংকট দেখা দিল। এই সংকটকে বুদ্ধি দিয়ে প্রথম উপলব্ধি করলেন রামমোহন। রামমোহন তাঁর মনীষা দিয়ে এই সত্যকে বুঝলেন যে, এই দুই বিপরীত জীবনাদর্শের মধ্যে সমন্বয়সাধনের চেষ্টা না করলে দিনে দিনে সাধারণ মানুষের চিত্তে তা আরো তীব্র আকার ধারণ করবে। একদিকে প্রাচ্য সভ্যতার নামে হিঁদুয়ানীর উগ্রতা, অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতার নামে সাহেবীয়ানার উগ্রতা, এই দুই চরম মতাদর্শের মধ্যে বিরোধ বা সংঘর্ষ অনিবার্য। তাই এই দুই বিপরীত শক্তির মধ্যে সমন্বয় দরকার।

কিন্তু রামমোহনের উপলব্ধ সত্য, সাধারণ মানুষের জীবনকে প্রভাবিত করতে পারল না। যে মনীষার দ্বারা রামমোহন দুই বিপরীত জীবনাদর্শের মধ্যে সমন্বয়ের চেষ্টা করেছিলেন, সাধারণ মানুষ তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যকে সম্যক্‌ভাবে উপলব্ধি করতে পারল না। রামমোহন যে সত্যকে মনীষা দিয়ে বুঝেছিলেন, সেই সত্যকে হৃদয় দিয়ে প্রকাশ করলেন বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম-সাহিত্যে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের মধ্যে সংঘর্ষ ও সমন্বয়ের চিত্র আমরা লক্ষ্য করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব উপন্যাসে রূপ নিল পুরুষ এবং নারীর

দ্বন্দ্বের মধ্যে। দেহ অর্ধ নারী, আত্মা অর্ধ পুরুষ। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী-প্রকৃতি (দেহ) প্রবৃত্তির ইন্ধনস্বরূপা। অনতিক্রমণীয় নিয়তির পাশ নারীই জড়িয়ে দিয়েছে পুরুষের পায়ে। শক্তিমান পুরুষ এই বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়েছে, কিন্তু নারীর কাছে তাকে দিতে হয়েছে জীবনের চরম মূল্য। নারী ও পুরুষের এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রে রয়েছে দেহগত ও রূপজাত মোহ। নারী তার রূপের তীব্র আকর্ষণ নিয়ে পুরুষের সম্মুখে আবির্ভূতা। প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম পাশকে এবং প্রবৃত্তির দাসত্বকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টায় পুরুষের জীবনে সংঘাত দেখা দিয়েছে। তার ফলে, হয় জীবনকে অস্বীকার করে অধ্যাত্মলোকে প্রয়াণ, নয়তো সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ। জীবনের এই উপলব্ধিকে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের মধ্যে জীবন-সংগ্রাম ও চিত্তদ্বন্দ্ব লক্ষ্য করেছেন। বঙ্কিম-উপন্যাসে নায়িকারা সকলেই অপরূপ সুন্দরী (ভ্রমর বাদে)। পুরুষ এই রূপের আকর্ষণে নারী-প্রকৃতির কাছে নিজের শক্তির পরীক্ষা দিয়েছে এবং তার দ্বারা তাদের জয়-পরাজয় অথবা পতন নির্ধারিত হয়েছে। নারী তার রূপের ডালি নিয়ে পুরুষের শক্তির পরীক্ষা করেছে। পুরুষকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়েছে এবং পুরুষ-সত্তার উত্থান-পতনের পরিমাপক ও পরিশোধকরূপে নারী-চরিত্রগুলি ক্রিয়াশীল। তাই দেখি নবকুমার, নগেন্দ্রনাথ, প্রতাপ, চন্দ্রশেখর, গোবিন্দলাল, সীতারাম বা অমরনাথ রূপের আকর্ষণে তীব্রভাবে আকৃষ্ট হলেও, আত্মিক শক্তিতে শেষ পর্যন্ত মোহজাল ছিন্ন করতে পেরেছে। জীবনকে তারা ঐশ্বর্যমণ্ডিত করে তুলতে পেরেছে কিনা জানি না, কিন্তু রূপমোহের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে, চিত্তদীর্ণ হাহাকারে যে জীবনগুলি ক্ষত-বিক্ষত হয়েছিল, তারা সেই স্রোতোবেগ থেকে আত্মার মহিমায় নিজেদের সরিয়ে আনতে পেরেছে। অন্যদিকে, দুর্বল পুরুষ নারীর রূপমোহের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়ে আর ফিরতে না পেরে ভেসে গেছে। এখানে অভিশপ্ত জীবনের পথনির্দেশ করেছে নারী। দেবেন্দ্রনাথ, পশুপতি, গঙ্গারাম প্রভৃতির জীবন তার স্বাক্ষর বহন করছে। বঙ্কিম-সাহিত্যে উনিশ শতকের মানসচেতনায় যে দ্বন্দ্ব তা তাঁকে প্রভাবিত করেছে এবং এই যুগের প্রভাবে তাঁর উপন্যাসের নায়ক-নায়িকা এবং কাহিনী নিয়ন্ত্রিত।

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে বঙ্কিম-মানসের যে দ্বন্দ্ব—সেই দেহবাদ ও অধ্যাত্মবাদের দ্বন্দ্ব, সেই দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব, রূপকে কেন্দ্র করে এবং সেই রূপজাত মোহ জীবনে কি বিপর্যয় সৃষ্টি করে, তার চিত্র আমরা এখানে পাই। যে দুই বিপরীত জীবনাদর্শের মধ্যে সমন্বয়-সাধনের চেষ্টা আমরা রামমোহনের মধ্যে দেখেছি, বঙ্কিম-উপন্যাসের মধ্যেও দেহ ও আত্মার সমন্বয়ের চেষ্টা লক্ষ্য করা যায়।

বঙ্কিম উপন্যাসগুলি বিশ্লেষণ করলে এই সত্যটিই পরিষ্কার হয়ে উঠবে। নিশ্চল, নির্বিকার, সরল অথচ কঠিন প্রকৃতির অপূর্ব-সুন্দর প্রতিবিম্ব কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। যে নবকুমার সংযমে, দৃঢ়তায় মতিবিবির বন্ধনকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে, কাপালকুণ্ডলার সান্নিধ্যে তার সমস্ত পৌরুষ নির্বাপিত। চন্দ্রশেখর উপন্যাস প্রবৃত্তি-পাশে পুরুষ ও নারীর চরম নিঃসহায়তার ইতিহাস। প্রতাপ ও শৈবলিনীর প্রেম সামাজিক অনুশাসনে অস্বীকৃত। কিন্তু চন্দ্রশেখর তাঁর অধ্যাত্ম সাধনার ফল প্রবৃত্তির (রূপজাত মোহ) পাদমূলে অর্পণ করলেন কেন, তার উত্তর বঙ্কিমচন্দ্র পেয়েছেন প্রতাপের জীবনে প্রবৃত্তি ও পৌরুষের দ্বন্দ্ব থেকে। বিষবৃক্ষ উপন্যাস বঙ্কিম কবি-মানসের প্রেমতত্ত্ব বিশ্লেষণের অপূর্ব ক্ষেত্রভূমি। কুন্দ, হীরা, সূর্যমুখী, কমল নারী-প্রকৃতির চার বৈশিষ্ট্য। এখানেও দেখি, নগেন্দ্রনাথ ও দেবেন্দ্রনাথকে প্রবৃত্তির সঙ্গে সংগ্রাম করতে এবং পুরুষ সত্তার উত্থান-পতনের পরিমাপক ও পরিশোধকরূপে নারী-চরিত্রগুলি সক্রিয়। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে গোবিন্দলাল ও রোহিণীর পরিণতিতে প্রবৃত্তির দাসত্ব স্বীকারের কথা লিপিবদ্ধ ("এতকাল গুণের সেবা করিয়াছি, এইবার রূপের সেবা করিব")। এইভাবে নারী ও পুরুষের প্রেম-প্রকৃতির অমীমাংসিত দ্বন্দ্ব বঙ্কিমের শিল্প-চেতনাকে অগ্রগতি দিয়েছে। অবশেষে অধ্যাত্ম জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে নিষ্কাম ধর্মের মধ্যেই প্রবৃত্তির পরিশোধন সম্ভব করে নেবার চেষ্টায় যথাক্রমে আনন্দমঠ, দেবী চৌধুরাণী, সীতারাম উপন্যাস ত্রয়ীর আবির্ভাব। কিন্তু ভবানন্দের মত সর্বত্যাগী পুরুষের জীবন নিষ্কৃতি পায়নি, কল্যাণীর পাষাণী মনোবৃত্তির সংস্পর্শে। প্রফুল্ল দেবী চৌধুরাণীরূপে অধ্যাত্ম জীবনে স্থিতিলাভ করতে চেয়েছিল, কিন্তু নতুন বৌরূপে আবার সে সংসার-জীবনে প্রত্যাবর্তন করেছে (নারীকে দিয়েও বঙ্কিমচন্দ্র একবার এই তত্ত্বটি পরীক্ষা করে দেখলেন)। বিরাট শক্তির অধিকারী সীতারাম রাষ্ট্র পরিচালনা করেছে, কিন্তু রূপমুগ্ধতায় শেষ পর্যন্ত জীবনকে নিয়ে গেছে চরম ট্রাজেডির মধ্যে। বঙ্কিমচন্দ্রের সমগ্র জীবনব্যাপী প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয় প্রচেষ্টার নিষ্ফলতা সূচিত হয়েছে সীতারামের পরিণতিতে। সীতারামের ট্র্যাজেডি বঙ্কিম-সাহিত্যের ট্র্যাজেডি। এর পরেই তিনি উপন্যাস লেখা বন্ধ করে দেন, কারণ গল্পের জন্য তিনি কোনোদিন উপন্যাস রচনা করেননি। তিনি সেকথা নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, দেশকে যদি নতুন কিছু দেবার থাকে, কোনো বক্তব্য থাকে তবেই লেখনী ধারণ করবে। তাই বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর এই উপলব্ধ সত্যকে উপন্যাসের মধ্যে রূপ দিতে না পেরে শেষ পর্যন্ত গীতার ব্যাখ্যায় এবং শ্রীকৃষ্ণ চরিত্র-চিত্রণে নিজেকে নিয়োজিত করেন। বঙ্কিমচন্দ্রের

দৃষ্টিতে আদর্শ পুরুষ শ্রীকৃষ্ণ, ভোগে এবং ত্যাগে: নিজের জীবনে সামঞ্জস্য আনতে পেরেছিলেন।

রজনী উপন্যাসে আমরা দেখেছি অমরনাথের জীবনব্যাপী স্বার্থত্যাগ, কিন্তু জীবনে প্রতিষ্ঠিত হবার অধিকারটুকু পর্যন্ত তাঁর নেই। অমরনাথের রূপমোহ তাঁর জীবনে বিপর্যয় ডেকে এনেছে। লবঙ্গলতার প্রতি তাঁর প্রথম যৌবনের আকর্ষণের কারণ লবঙ্গলতার রূপ এবং তার জন্য অমরনাথ-চিত্তে মোহসঞ্চার ও তীব্র আকর্ষণবোধ। লবঙ্গের কিশরীরূপের বর্ণনায় অমরনাথের উচ্ছ্বাসপ্রবণতা লক্ষ্য করা যায়—"লবঙ্গ-কলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল···আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য কখন দেখি নাই···" ইত্যাদি। অমরনাথ স্বীকার করেছেন—"···একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম।···" তার ফলেই বেদনাদায়ক লজ্জা—যার জের অমরনাথ জীবনব্যাপী বয়ে চলেছেন। অমরনাথ রজনীর রূপের তীব্র আকর্ষণও অনুভব করেছেন।—"···রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন।···" কিংবা ···"এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলতে পারি না।···" কিন্তু শক্তিমান পুরুষ বলেই অমরনাথ রূপের তীব্র আকর্ষণে আকৃষ্ট হ'লেও শেষ পর্যন্ত নিজেকে সংযত করতে পেরেছেন। একবার লবঙ্গের আকর্ষণকে জয় করবার জন্য তাঁর গৃহত্যাগ, আবার রজনীর রূপমোহ থেকে মুক্তি পেতে তাঁর সন্ন্যাসীর জীবনকে বরণ। অমরনাথ অধ্যাত্মজীবনের মধ্যে শান্তি খুঁজে পেতে চেয়েছেন। প্রবৃত্তির দাহ থেকে নিস্তার পাবার জন্য নিবৃত্তির সাধনায় তিনি গৃহত্যাগ করেছেন। দেহের আকর্ষণকে জয় করতেই আত্মিক সাধনায় নিয়োজিত রাখতে চেয়েছেন নিজেকে। আত্মকথনের দ্বারা কাহিনী বিবৃত বলেই পাত্রপাত্রীদের মানসিক দ্বন্দ্ব ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া নিজেদের কথাতেই প্রকাশ পেয়েছে। অমরনাথ নিজের মুখেই তাঁর রূপমুগ্ধতা ও তার থেকে পরিত্রাণের কথা বর্ণনা করেছেন।

শচীন্দ্র যখন রজনীকে প্রথম দেখেছে, সেই রূপই তাকে রজনীর প্রতি মমত্ব প্রকাশে প্রণোদিত করেছে—"রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী।···রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না। সে মূর্তি সহজে ভুলিবেও না। কেননা সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় শক্তি আছে। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।···আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে।···" এ ধরনের মন্তব্যে রজনীর রূপের প্রতি অবচেতন মনে একটা তীব্র আকর্ষণ প্রকাশ পেয়েছে। শেষে দৈব প্রভাবে যখন সে উপলব্ধি করলো, অবচেতন মনে রজনীর রূপই তার চিত্তকে

আচ্ছন্ন করে রেখেছে, তখন সে রজনীকে পাওয়ার জন্য কাতর হয়ে উঠলো—"হায়! রজনী! পাথরে এত আগুন?"

তবে সমগ্র বঙ্কিম-সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম রজনী-চরিত্র। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসগুলিতে আমরা দেখেছি, পুরুষের রূপমুগ্ধতা; নারী সেখানে পুরুষের চিত্তে আকর্ষণ সৃষ্টি করে তার রূপের ডালি মেলে ধরেছে। কিন্তু রজনী নারী হওয়া সত্ত্বেও তার রূপমোহ ও তজ্জনিত কাতরতা বঙ্কিম-সাহিত্যে ব্যতিক্রম। অন্ধ রজনীর রূপমুগ্ধতার দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র আর একটি সত্যকে প্রমাণ করতে চেয়েছেন" · শুনিয়াছি—স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কানা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই? কথা শুনিব বলিয়া? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে? ··তবে কি সেই স্পর্শ?···রূপ চেন, রূপই বুঝ।··· রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে একজনকে সকলে সমান রূপবান দেখে না কেন?···রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্বময় না হইবে?"

অন্ধ রজনী শচীন্দ্রের স্পর্শ ও কণ্ঠস্বর শুনে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। এই দেহজ আকর্ষণ পাশ্চাত্য জীবনাদর্শের দ্বারা চিত্রিত। আত্মিক শক্তিকে আচ্ছন্ন করে দেহগত আকর্ষণ তীব্রভাবে প্রকাশ পেয়েছে—এক্ষেত্রে রজনী নারী (অন্যক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষ-চরিত্রের মাধ্যমে এই সত্যকে প্রকাশ করেছেন)—"পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ!···আমাকে দেখিলে কখন কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই?···" বলেছে রজনী, "অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে?···" রজনীর এই রূপ-মুগ্ধতা এমনই ব্যতিক্রম আচরণ যে, লবঙ্গ তাতে বিস্ময় প্রকাশ করেছে, নারী হয়েও নারীর এই রূপমোহকে সম্যক্ উপলব্ধি করতে পারেনি—"তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ!···"

···একদিকে যেমন বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথ ও শচীন্দ্রের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বটিকে সপ্রমাণ করেছেন, অন্যদিকে রজনীর-মাধ্যমেও সেই সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছেন। তাঁর সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে দেহ ও আত্মার যে দ্বন্দ্ব, প্রবৃত্তি-নিবৃত্তির সমন্বয়সাধনের চেষ্টা ও ব্যর্থতা তার চিত্র এই উপন্যাসেও পাই। অমরনাথ শক্তিমান পুরুষ বলে দ্বন্দ্বে

ক্ষত-বিক্ষত হয়েও শেষ পর্যন্ত আত্মিক জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে শান্তি খুঁজে পেতে চেয়েছেন। কিন্তু শচীন্দ্র রূপের আকর্ষণে নিজের চিত্তের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে রজনীর জন্য কাতর হয়ে উঠেছে। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবে রূপকে বঙ্কিমচন্দ্র সচেতন মনকে চাপা দিয়ে অবচেতন মনকে প্রকাশ করেছেন। রজনীও শচীন্দ্রকে পাওয়ার জন্য কাতরতা প্রকাশ করেছে। সচেতন মনে সামাজিকরূপে রজনী অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাকে অস্বীকার করতে পারেনি, কিন্তু মনে মনে সে শচীন্দ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। এ আকর্ষণ রূপজ, তবে দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা নয়, স্পর্শানুভূতি ও শ্রবণানুভূতি তার চিত্তে এই মুগ্ধতা সৃষ্টি করেছে। সামান্য আঘাতে তার চিত্তের সমস্ত আবরণ ছিন্ন হয়ে অন্তরের সত্য প্রকাশ পেয়েছে। অমরনাথ যখন নিজের থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে, তখন রজনীর কোনোও কাতরতা প্রকাশ পায়নি। শচীন্দ্রকে পেয়ে রজনী তৃপ্ত, রজনীকে পেয়ে শচীন্দ্র তৃপ্ত। তাদের এই প্রেমের যে পারস্পরিক আকর্ষণ ও দাম্পত্যজীবনে যার পরিণতি—সেই প্রেমপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করেছে রূপ এবং রূপজাত মোহ—যা বঙ্কিম উপন্যাসের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু অমরনাথ দুই প্রান্তের মধ্যে সমন্বয়সাধন করতে ব্যর্থ হয়ে শান্তির অন্বেষণে জীবন কাটিয়েছে। কিন্তু শান্তি পেয়েছে কি ?

নয়

চরিত্র-বিশ্লেষণ ঃ

রজনী উপন্যাসে আমরা চারটি উল্লেখযোগ্য প্রধান চরিত্র পাই। রজনী, লবঙ্গলতা, অমরনাথ ও শচীন্দ্র।

রজনী ঃ রজনী নামকরণটি তাৎপর্যপূর্ণ। রজনী অন্ধ যুবতী। তার কাছে পৃথিবীর আলো সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। চির-অন্ধকারময় জগতে যে বিরাজ করে, সেই নারীর 'রজনী' নামকরণ বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিভঙ্গীর মুন্সীয়ানার পরিচয় দেয়।

পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ পরিপূর্ণ পৃথিবীকে মানুষ আস্বাদ করে। কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব রজনীর অন্য ইন্দ্রিয়গুলিকে অনেক বেশী প্রখর করে তুলেছে। কাহিনীর শুরু রজনীর যৌবনে উপনীত হওয়ার মুহূর্ত থেকেই, যখন মানুষ পৃথিবীকে অন্য দৃষ্টিতে দেখে। কাহিনীর শুরু রজনীর নিজের কথা দিয়ে। রজনী নিজেই নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছে। অন্ধ যুবতী তার অন্ধত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন ঃ "আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব, আর ষোলোকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডল মধ্যস্থ হইয়া বিকশিত হইলেও আমি সুখী হইব না।...তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়, আমার জীবন অন্ধকার।" অন্ধ রজনী

সম্পর্কে আর একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয়। তা হচ্ছে রজনী ফুলওয়ালী। ফুলের কোমল পেলব স্পর্শ অন্ধ রজনীর চিত্তে কোমল স্পর্শানুভূতির অভিজ্ঞতা সঞ্চার করেছে এবং ফুলের ঘ্রাণ চিত্তের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। ফলে চক্ষুর দ্বারা যে সৌন্দর্য উপলব্ধি করে তার চিত্তের জাগরণ ঘটতো, চক্ষুর অভাবে সেই সৌন্দর্যের মহিমা সে উপলব্ধি করেছে—ঘ্রাণের দ্বারা এবং স্পর্শের দ্বারা। তাই বলছিলাম, অন্ধ রজনীকে ফুলওয়ালীরূপে চিত্রিত করা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্ধের শ্রবণশক্তির প্রখরতা। এই স্পর্শানুভূতি ও শ্রবণানুভূতি তাকে শচীন্দ্রের প্রতি আকৃষ্ট করেছে, প্রেমের পদধ্বনি শোনা গেছে রজনী-চিত্তে শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে।

এই জন্মান্ধ যুবতী যৌবনোচিত আবেগ নিয়েই জগৎ ও জীবনকে আস্বাদ করতে চেয়েছে। অন্ধত্বের জন্য কোনো তীব্র ক্ষোভ বা বেদনা এই অন্ধ নারীর যৌবনসত্তাকে ম্লান করতে পারেনি। তাই সে বলতে পেরেছে, “সুখদুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী।” এই অন্ধ নারী মালা গেঁথে তার বাবা-মাকে সাহায্য করতো। নিতান্ত দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে তার জীবন অতিবাহিত হলেও যৌবনোচিত চিত্তচাঞ্চল্য থেকে রজনীর চিত্ত মুক্ত ছিল না। এই ফুল এবং মালা যোগান দেওয়ার উপলক্ষেই রামসদয় মিত্রের গৃহে লবঙ্গলতার কাছে তার যাতায়াত। লবঙ্গলতা রজনীকে বিশেষ স্নেহের চোখে দেখত। রজনীর নম্র, বিনীত ভাব, তার রূপ ও সৌন্দর্যকে আরো বেশী আকর্ষণীয় করে তুলেছিল। এই অন্ধ সুন্দরী যুবতী অন্যের দর্শনেন্দ্রিয়কে আকৃষ্ট করলেও নিজে সেই রূপের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারত না। কিন্তু এখানে বঙ্কিমচন্দ্র রূপ এবং রূপজাত মোহকে কেন্দ্র করে রজনী-চরিত্রের মাধ্যমে একটি নতুন পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছেন। প্রচলিত অর্থে আমরা রূপ বলতে বুঝি দেহগত সৌন্দর্য। রূপবান বা রূপবতী আমরা তাদেরই বলি যারা দেহ-সৌন্দর্যের অধিকারী। এই দেহগত সৌন্দর্যকে প্রত্যক্ষ করা যায় শুধু চক্ষুর দ্বারাই। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রমণীচিত্তে রূপজাত মোহের সৃষ্টি করে প্রমাণ করতে চেয়েছেন, রূপ শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই আস্বাদ্য নয়। যাকে কেন্দ্র করে চিত্তে রম্যতা প্রকাশ পায়, যাকে উপলব্ধির দ্বারা সুন্দর করে তুলি, তাই সত্যকার রূপবান্। এ রূপ যদি দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই একমাত্র আস্বাদ্য হত, তাহলে একজনকে সবাই সুন্দর দেখত। কিন্তু পৃথিবীতে আমরা দেখি একজনের চক্ষে পরম কুৎসিত অন্যের চক্ষে পরম সুন্দররূপে প্রতিভাত হয়েছে। তাই কেকাধ্বনি যেমন বাহ্যতঃ কর্কশ হলেও ‘কান তাহার মাধুর্য জানে না, মনই জানে।’ তেমনি বাহ্যতঃ অসুন্দরকেও মনের দ্বারা সুন্দর করে নেওয়া যায়। শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা কেন, যে-কোনো ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমেই

রূপের আস্বাদ এবং তজ্জনিত মোহ প্রকাশ পেতে পারে। তাই অন্ধ নারী রজনীর শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা এবং স্পর্শানুভূতির দ্বারা শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে যে রূপমোহ তার চিত্তে সঞ্চারিত হয়েছিল, তা দর্শনজাত রূপমোহের চেয়েও কম তীব্র নয়। লবঙ্গলতার গৃহে শচীন্দ্র যখন প্রথম রজনীকে দেখল এবং রজনীর অন্ধত্বকে পরীক্ষা করবার জন্য তার চিবুক স্পর্শ করল, সেই স্পর্শানুভূতির প্রতিক্রিয়া রজনী-চিত্তে তীব্র আলোড়ন সৃষ্টি করেছে—"সে স্পর্শ পুষ্পময়।...কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল...। সে নবনীত সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে?" এই স্পর্শানুভূতি রজনী-চিত্তে শচীন্দ্রকে অবলোকন করার তীব্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তুলেছে—"বহুমূর্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষ জাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা। তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন ..বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে থাকুক মা, আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে আমি দেখিব না কেন?...অদৃষ্টে নাই। হৃদয় মধ্যে খুঁজিলাম শুধু শব্দ স্পর্শ গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না" বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী-চরিত্রের রূপজাত মোহ এবং তজ্জনিত দ্বন্দ্ব চিত্রণে রজনী অনন্যা। কারণ বঙ্কিম-সাহিত্যে নারী ও পুরুষের দ্বন্দ্বে পুরুষ-চরিত্রের রূপজাত মোহ-এর চিত্র তাঁর অনেক উপন্যাসে লক্ষ্য করা যায়।

অন্ধ যুবতীর বহির্জগতের কার্যকলাপ স্বভাবতই অনেক কম। তাই মুখ্যত অন্তর্জীবনের আলোড়ন ও চিত্তের নানা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম আন্দোলনই এখানে প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে রজনীর মানসিক দ্বন্দ্ব ও তার ফলে চিত্তের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চিত্র-চিত্রণেই উপন্যাসটি কেন্দ্রীভূত। তাই পণ্ডিতেরা একে 'মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস" হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উপন্যাসের অন্যান্য পাত্রপাত্রীদের বহিরঙ্গ কার্যকলাপ লক্ষ্য করা যায় সত্য, কিন্তু রজনী-অসম্পৃক্ত কার্যাবলী মূল বিষয়কে অতিক্রম করে কোনোও খানেই প্রাধান্য বিস্তার করেনি। যেন রজনী-কাহিনীকে বিকশিত করবার জন্যই এই সব চরিত্রের কার্যাবলী নিয়ন্ত্রিত।

রজনীর রূপ সম্পর্কে বলতে গিয়ে শচীন্দ্র বলেছে—"... রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর।...গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশত: সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই

কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া, কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকারের যত্ননির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রীমূর্তি বলিয়া বোধ হইত।" শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে অন্ধ যুবতী রজনী প্রথম প্রেমের পদসঞ্চারে আবেগে উদ্বেল। যৌবনোচিত উচ্ছ্বাস, রক্তে আবেগ-চাঞ্চল্য রজনী-চিত্তকে একান্তভাবে বিহ্বল করে তুলেছে। এই বিভ্রান্ত চিত্তে তার পাশেও কেউ নেই যে তাকে পথ-নির্দেশ করবে। প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে তার পাশে কোনও সখী নেই, যার কাছে সে সান্ত্বনা পাবে। শকুন্তলার পাশে অনুসূয়া ও প্রিয়ংবদা না থাকলে শকুন্তলা অসহায়তা বোধ করতো নাকি? সখীর অভাবে রজনী দ্বন্দ্বে আরও বেশী বিহ্বল হয়ে পড়েছে। বস্তুজগতের রূপ-রস যেমন সে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি, তার ব্যাকুলতাকেও কেউ এসে সান্ত্বনার প্রলেপ লাগায়নি। প্রেমের দাহ বড় তীব্র, কিন্তু তাকে তীব্রতর করে তোলে সমব্যথীর অভাব। তাই চক্ষুষ্মান সাথীর অনুপস্থিতির ফলে রজনীর অন্তরের গভীর উপলব্ধি সাধারণ মানসভঙ্গী অপেক্ষা অনেক তীব্র ও দ্বন্দ্ববহুল। এই অন্ধত্ব তার একাগ্রতা বা নিষ্ঠাকে বৈচিত্র্যের ছলনায় বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তাই তার অনুভূতি ঋজু ভঙ্গীতে আত্মপ্রকাশ করেছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির একাগ্রতা বাইরের জগতের নানা আকর্ষণের ফলে অনেক সময়ে উপলব্ধিগুলি এতখানি স্পষ্টভাবে আত্মপ্রকাশ করতে পারে না। রজনীর মনকে বিক্ষিপ্ত করবার অবকাশ নেই। তা ছাড়া তার অনুভূতির তীব্রতা বাইরের জগতের বৈচিত্র্য ক্ষুণ্ণ করতে পারেনি। তাই রজনী-চরিত্রের বিশ্লেষণে বঙ্কিমচন্দ্র যে পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, অন্যান্য নারী-চরিত্রের ক্ষেত্রে সেভাবে বিশ্লেষণ করেননি। অন্যত্র ঘটনা-বিবৃতির মাধ্যমে চরিত্রের রহস্য উদ্ঘাটিত হয়েছে। এখানে রজনীর চরিত্র-বিশ্লেষণের প্রয়োজনে ঘটনার উপস্থাপনা লক্ষ্য করা যায়। তাই রজনীর আবেগাকুলতা তার চরিত্রকে স্পষ্টভাবে আমাদের কাছে তুলে ধরেছে। এই ভঙ্গীতেই রজনী চরিত্র আমাদের কাছে সহানুভূতি ও মমত্ব আকর্ষণ করতে পেরেছে।

'জনৈক সমালোচক যথার্থই বলেছেন—"রজনী চরিত্র সৃষ্টির মধ্য দিয়া বঙ্কিমচন্দ্র গোপন অন্তর্জগতের এমন গভীর রহস্যের মধ্যে আমাদের লইয়া যান, যেখানে প্রত্যক্ষ কিছুই নাই, যেখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুগুলি চিত্তের আলোকে উদ্ভাসিত হইয়া অপরূপ রূপ ধারণ করিয়াছে, যেখানে আমাদের পরিচিত এবং লৌকিক ধারণাগুলি সম্পূর্ণ পৃথক দৃষ্টিকোণ হইতে দেখানোর ফলে রহস্যময় ও বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছে।"'

বঙ্কিম-উপন্যাসের অন্যত্র আমরা দেখেছি, কপালকুণ্ডলার মানসিকতা জানবার জন্য শ্যামাসুন্দরীর সাহায্য প্রয়োজন হয়েছে, সূর্যমুখীর মানসিক দ্বন্দ্ব

প্রকাশের জন্য কমলমণির সাহায্য লেগেছে। কিন্তু রজনীর মানসিক দ্বন্দ্ব সে নিজেই প্রকাশ করেছে। লবঙ্গলতার সাহায্য যেটুকু লেগেছে তা হচ্ছে বাইরের ঘটনার প্রতিফলনের দ্বারা রজনী-চিত্তের অগ্রগতি বা বিকাশ ঘটাবার জন্য। তাই বোধ করি বঙ্কিমচন্দ্র নতুন আঙ্গিকের মাধ্যমে রজনীর বক্তব্য বা মানসিকতা রজনীর মাধ্যমেই ব্যক্ত করেছেন অন্যনিরপেক্ষ হয়ে।

রজনী-চরিত্র পরিকল্পনায় লর্ড লিটনের কানা ফুলওয়ালী নিডিয়া-চরিত্র বঙ্কিমচন্দ্রকে অনুপ্রাণিত করেছে বলে তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন। কিন্তু আমাদের মনে হয়, সে সাদৃশ্য নিতান্তই ঘটনাগত বা বহিরঙ্গিক। চরিত্র-বিশ্লেষণে রজনী বঙ্কিমচন্দ্রের মৌলিক সৃষ্টি। রজনী-চরিত্রের মানসিক বিকাশ চিত্রিত করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র এমন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ করেছেন, যার ফলে আমরা ধীরে ধীরে চরিত্রের গভীরে অনুপ্রবেশ করে তার রহস্য উপলব্ধি করতে পারি। বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকায় তার ইঙ্গিত দিয়েছেন, যার দ্বারা আমরা বুঝতে পারি তিনি এই রীতি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন— "যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই এরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।" নিছক প্রেমের একটি নিটোল কাহিনী বর্ণনাই বঙ্কিমচন্দ্রের উদ্দেশ্য নয়। কাহিনী-বিবৃতির মাধ্যমে তিনি কতকগুলি বিশেষ তত্ত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছেন।

শচীন্দ্রের স্পর্শলাভ করবার পূর্ব পর্যন্ত রজনী আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে যে নিজস্ব জগৎ রচনা করেছিল, সেখানে বাইরের পৃথিবীর কোনও চাঞ্চল্য তার চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করতে পারেনি। সে নিজস্ব জগতের মধ্যে পরম সন্তোষ নিয়ে বিরাজ করতো। সংসারের নানা টুকরো অভিজ্ঞতা, সামাজিক বা পারিবারিক নানা রীতিনীতি তার মনের দ্বারে এসে আঘাত করতো সত্য, কিন্তু তার চিত্তে তা কোনোও চিহ্ন অঙ্কিত করতে পারেনি। চক্ষুষ্মান ব্যক্তির সঙ্গে সে নিজেকে তুলনা করে তার সুখের পরিমাণ করতে চায়। ফলে এক বিচিত্র মানসিকতার দ্বারা সে পৃথিবীর রূপ ও সৌন্দর্যকে আস্বাদ করতে চেয়েছে। চেতন-অচেতন বস্তুভেদ তার নেই। তার প্রখর অনুভূতি চারটি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা পঞ্চম ইন্দ্রিয়ের অভাব পূরণ করে নিয়েছে। দারিদ্র্য তার আত্ম-মর্যাদাকে কখনও ম্লান করেনি। ঐশ্বর্যের জৌলুষ নিয়ে রজনী উজ্জ্বল হতে চায়নি— নিজ চরিত্র মহিমাতেই এই আত্মপ্রচার-বিমুখ নারী মহিমান্বিতা।

লবঙ্গলতা সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতা সে বিবৃত করেছে নারীসুলভ কৌতুকবহতা নিয়ে। কিন্তু কোথাও ব্যঙ্গের খোঁচা তার সেই কৌতুকতাকে ম্লান করেনি। লবঙ্গের

প্রতি শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়েই সে লবঙ্গের পরিচয় প্রদান করেছে। রজনী সরলা ও অনভিজ্ঞা বলেই তার আবেগের কথা সহজে প্রকাশ করতে পেরেছে। প্রেমের প্রথম পদসঞ্চারে তার চিত্তচাঞ্চল্য অকপটে বিবৃত করেছে। তা না হ'লে শচীন্দ্র সম্পর্কে এমন অসঙ্কোচ বিবরণ সে দিতে পারতো না। অন্ধের রূপোন্মত্ততার চিত্র আমাদের চিত্তকে রজনীর প্রতি সহানুভূতিশীল করে তোলে।

এই অবিশ্লেষিত তীব্র আকর্ষণে রজনী রোজই রামসদয়ের গৃহে যাতায়াত শুরু করলো। অন্ধ রজনীর কথা শুনে শচীন্দ্র রজনীর চোখ পরীক্ষা করবার অছিলায় তার চিবুক স্পর্শ করেছে। সেই স্পর্শ কুমারী রজনীর জীবনে বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো তাকে সচকিত করে তুলেছে। তার এই তীব্র স্পর্শানুভূতির স্মৃতিই রজনীর চিত্তে দুরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাকে প্রতিদিন টেনে নিয়ে যেতো ঐ বড় বাড়ীতে আর তার সমস্ত অবসর মূহূর্তগুলি রমণীয় হয়ে উঠতো শচীন্দ্রের চিন্তায়। সে শুনেছে, পুরুষের রূপের আকর্ষণে নারী মুগ্ধ হয়। কিন্তু সে তো চক্ষুষ্মানের অভিজ্ঞতা! সে তো পুরুষকে দেখেনি। তবুও সে এই আকর্ষণ অনুভব করছে কেন? "মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই? শুনিয়াছি—স্ত্রী জাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কানা, কাহার রূপ দেখিয়াছি? তবে কেন যাই?···কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে?···তবে কি সেই স্পর্শ?···" নিজের প্রশ্নের উত্তর তাকে নিজেকেই খুঁজে নিতে হয়েছে, এখানে সখীর ভূমিকার অভাব আমরা অনুভব করি। সে বলেছে—"রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার মাত্র, শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে—না হলে একজনকে সকলেই সমান রূপবান দেখে না কেন? একজনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন?" ফলে অন্ধ যুবতীর চিত্তে যখন শব্দ ও স্পর্শের মাধ্যমে পুলক জেগেছে, তখন তার চিত্তে চক্ষুষ্মতী নারীর মতই আবেগাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে। সেও রূপমোহে উন্মত্ত হয়ে প্রেমাস্পদকে কাছে পাওয়ার জন্য তীব্র আসক্তি অনুভব করেছে। ফলে সে শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনার নেশায় (চক্ষুষ্মতী যেমন রূপ দর্শনের নেশায় কাতর হয়) শচীন্দ্রের বাড়ীতে প্রতিদিন গিয়েছে। চক্ষুষ্মতী যেমন আকাঙ্ক্ষিতজনকে না দেখে কাতর হয়ে পড়ে, রজনী তেমনি অধীর হয়ে ওঠে শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনার আকাঙ্ক্ষায়। "শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে?···রূপে হউক, শব্দে হউক, স্পর্শে হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার

করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে,…অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?"

(এই অবস্থায় সে শুনেছে, তার বিবাহের কথাবার্তা হয়েছে অন্যত্র। সে বিবাহের উদ্যোক্তা যে লবঙ্গলতা, সে খবরও তার অজ্ঞাত নেই। সে লবঙ্গের এই উদ্যোগকে তিরস্কার করবে বলে মনস্থ করলো। এই আচরণ তার অনভিজ্ঞতা ও সারল্য প্রকাশ করে। কারণ এ সম্পর্কে সে বিন্দুমাত্র সচেতন নয় যে, শচীন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহ সম্ভব নয়। অন্ধত্বের জন্যই বোধ করি শচীন্দ্রের ঐশ্বর্য ও তার দারিদ্র্যের মধ্যে পার্থক্য সে প্রত্যক্ষ করতে পারেনি। শচীন্দ্রের চিন্তা তার চিত্তকে এমনই আচ্ছন্ন করে রেখেছিল যে, ব্যবহারিক জগতের ঘটে যাওয়া ঘটনা সম্পর্কে সে মোটেই সচেতন ছিল না। যখন সে একথা উপলব্ধি করলো, আপন অন্তরের বেদনায় সে নিজেই ক্ষত-বিক্ষত হলো। ছোট মা লবঙ্গলতার ভর্ৎসনায় যা হয়নি, শচীন্দ্রের স্নেহপূর্ণ বাক্যের সামান্য জিজ্ঞাসায় রজনীর চোখে শত ধারায় অশ্রু ঝরে পড়েছে। এ কান্না তো লবঙ্গের তিরস্কারজাত বেদনা নয়, এ অশ্রুর প্রকাশ শচীন্দ্রের স্নেহার্দ্র কণ্ঠের স্পর্শে আবেগাকুল যৌবনের উচ্ছ্বাসের জন্য। এই আবেগকে চেপে রাখতে অক্ষম হয়ে রজনী বলেছে, "ছোট-মা তিরস্কার করিয়াছেন।" এই কথা বলায় যে সুখ, এই অশ্রু ত্যাগে যে আনন্দ—সেই আনন্দাস্বাদ রজনী-চিত্তকে ভরিয়ে তুললো। শচীন্দ্র যখন অন্ধ যুবতীর হাত ধরে লবঙ্গর কাছে নিয়ে চললো—রজনী সেই পুলকাকুল মুহূর্তে মনে মনে শচীন্দ্রকে পতিত্বে বরণ করে নিল। এইভাবেই প্রথম প্রেমের জাগরণ ও আত্মসমর্পণ বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে চিত্রিত করেছেন।

এইভাবে সম্পূর্ণ আত্মনিবেদনের ফলে রজনী নিজেকে বাইরের ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে জড়িয়ে ফেলেছে। যখন শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে রজনী-চিত্ত স্বপ্নে বিভোর হয়ে রয়েছে, শচীন্দ্রকে স্বামিত্বে বরণ করে সে পরম তৃপ্তি খুঁজেছে।…"বোবার কবিত্ব কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য। পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে কখন কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই?…নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দর হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাথর ক্ষোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী মাত্র?…পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না, কেন?…

আমি মরিব।" সেই পরিপ্রেক্ষিতে যখন তার বিবাহের কথা হয়েছে, রজনী স্বভাবতই মনে মনে তার বিরোধিতা করতে চেয়েছে। তাই সে চাঁপার কথায় সম্মতি দিয়েছে এবং হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করবার দুর্জয় ঝুঁকি নিয়েছে। প্রেমের শক্তি বা আবেগ তাকে এতটা বেপরোয়া করে তুলেছে যে, শচীন্দ্র ছাড়া অন্য কাউকে বরণ করা যেকোনোও ভাবে সে বন্ধ করতে চেয়েছে। শচীন্দ্রের প্রতি তার আসক্তির প্রকাশ এই পর্বে সমস্ত ধূম্রাবরণ পরিত্যাগ করে প্রদীপ্ত অনলশিখায় প্রজ্বলিত হয়ে উঠেছে। তাই এখানে রজনীর প্রেমের তীব্রতা যতই আবেগাকুল হোক্, তার শক্তিকে অস্বীকার করার উপায় নেই। "রজনীর অসংকোচ সরলতা যেমন তাহার পিতামাতার নিকট বিবাহ না দিবার দাবীতে প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনই তাহার নির্ভীক অন্তরের একনিষ্ঠ প্রেমের শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে হীরালালের পাপ প্রস্তাবের বিরোধিতায় এবং তাহার অত্যাচারের প্রতিরোধ চেষ্টায়।"

এই পর্বে রজনী তার প্রথম যৌবনের আবেগাকুল স্তর উত্তীর্ণ হয়ে যৌবনশক্তির দৃঢ়তা, পরিপূর্ণতা ও সাহস নিয়ে আত্মবিশ্বাসে ও আত্মপ্রত্যয়ে নিজেকে প্রকাশ করেছে। নারীসুলভ দ্বিধাসঙ্কোচ, জড়তা ও লজ্জা কাটিয়ে সে নিজের শক্তিতে দাঁড়িয়েছে। অন্ধত্বের পরনির্ভরতার গ্লানি মুহূর্তের জন্য তাকে ম্লান করতে পারেনি বলেই প্রেমের সত্যকার শক্তি তাকে অনুপ্রাণিত করেছে।

রজনী এখানে অসাধারণ। একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি আসক্তিজনিত দুর্বলতায় কাতর, নিবেদিতপ্রাণ রজনী যেমন পেলবচিত্তের অধিকারিণী, অন্যদিকে প্রেমের শক্তিতে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর রজনী তার সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও হীরালালের অন্যায় প্রস্তাবে তীব্রভাবে প্রতিবাদ করেছে। যে-কোনো বিপদকে সে বরণ করে নিতে প্রস্তুত, এমনকি মৃত্যুর ঝুঁকি নিতেও সে রাজী। কিন্তু বাঁচার তাগিদে সে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও হীরালালের বিবাহের প্রস্তাবকে ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছে। মনে মনে সে একজনকেই বরণ করে নিয়েছে, সেখানে অন্যকে স্থাপনা তো ব্যভিচারের নামান্তর। অনভিজ্ঞা, সরলা রজনী যেন তার প্রেমের মহিমায় অন্তর্দৃষ্টি লাভ করে জীবনে নিবিড় সত্যকে উপলব্ধি করেছে। জীবন বিসর্জনের মানসিক প্রস্তুতি নিয়েই সে গঙ্গাবক্ষে নিজেকে সমর্পণ করেছে— "জীবন অসার সুখ নাই বলিয়া, অসার, তাহা নহে।...অসার বলি এইজন্য যে, দুঃখই দুঃখের পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্মের দুঃখ আজি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না।...কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম

তো শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন?…মরিব!…ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না।" মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সে জীবনের পরম সত্যকে আবিষ্কার করলো। জীবনে নির্মল সুখেরও সাক্ষাৎ যে ঘটে না তা নয়, তবে অন্ধের রূপোন্মত্ততা সাধারণ মানুষের কাছে তো অস্বাভাবিক মনে হতে পারে। না দেখার যে দুঃখ, তা কে বুঝবে? রজনী নিজের জীবন-কাহিনীর যে পর্ব বিবৃত করেছে, তা তার মানস দ্বিধা-দ্বন্দ্ব, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া—সেখানে বাইরের ঘটনার ঘনঘটা নেই।

যেখান থেকে কাহিনী গতিময় হয়ে উঠেছে, সেখান থেকে রজনী-জীবনের কাহিনী বিবৃত করেছে অন্যজন। তার কারণ, আমরা আগেই বলেছি, অন্ধ রজনী বাইরের দিক দিয়ে কর্মচঞ্চল নয়। ফলে আত্মপ্রকাশ-বিমুখ, সঙ্কুচিত, সর্বদা সন্ত্রস্ত রজনী নিজের মনে যতই ক্ষত-বিক্ষত হোক্, বাইরে সে সংযত করে রেখেছে নিজেকে। তাই দেখি, লবঙ্গলতার কর্মমুখরতা (যদিও তা রজনীকেন্দ্রিক) রজনীর তুলনায় অনেক বেশী। সেজন্য কোনও কোনও সমালোচক লবঙ্গলতাকে এই উপন্যাসের নায়িকা বলে মনে করেন। বিবাহের রাত্রে নববধূকে কেন্দ্র করে বা উপলক্ষ করে যে কর্মযজ্ঞের আয়োজন, সেখানে সেই কন্যা যতই মানসিক উত্তেজনায় চঞ্চল হোক্, তার কর্মমুখরতা দেখা যায় না। সে তুলনায় বাড়ীর গৃহিণী অনেক বেশী কর্মচঞ্চল। কিন্তু তাতে কেউ বলবে না যে, আজকের উৎসবের প্রধান উপলক্ষ বাড়ীর গৃহিণী। লবঙ্গলতার যা কিছু কর্মচাঞ্চল্য সবই তো রজনীকে উপলক্ষ করে বা রজনী-জীবনের ঘটনাসঞ্জাত। তাই লবঙ্গলতার কর্মমুখরতা স্বভাবতই রজনীর তুলনায় বেশী হবেই।

রজনীর আত্মকথনের মধ্যে তার চরিত্রটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে। তার চিত্তের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই উপন্যাসের কাহিনীভাগ গড়ে উঠেছে। আমরা বলেছি, রজনীর কথাবার্তা বা মানসিকতা এমনভাবে সে নিজে বর্ণনা করেছে, যাতে তার চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের সম্যক্ ধারণা হতে কোনও অসুবিধা হয় না। এই আত্মকথনের মধ্যেই তার যে আত্মস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কোনও ভাবে তা এতখানি স্পষ্ট হয়ে উঠতো না। অন্ধ নারীর স্পর্শানুভূতি তার রূপোন্মত্ততা, শচীন্দ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ সবই সে নিজেই বলেছে। এভাবে নিজের কথা নিজে না বললে এতো আবেগ, প্রেমসঞ্চারের প্রতিক্রিয়া অন্য কোনও ভাবে এমন মহিমময়

হয়ে প্রকাশ পেতো না। কারণ অন্ধের রাজ্য অনুভূতির রাজ্য এবং শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব সে পূরণ করে নেয়।

শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে রজনী-চিত্তের যে জাগরণ এবং তার ফলে তার গৃহত্যাগ ও আত্মহত্যার চেষ্টা কাহিনীকে রজনীর ব্যক্তিগত, আয়ত্তের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। আমরা পরিশিষ্ট অংশে বলেছি—"প্রেমের পদসঞ্চার অনাঘ্রাতা কুমারী-জীবনে যে লজ্জার নবারুণ রাগ সঞ্চার করে, সেই দ্বিধাই রজনীর বক্তব্য বা অনুভূতিকে লেখক অন্যের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। প্রেমের স্পর্শে রজনীর কুমারী-চিত্তের যে জাগরণ তার ফলে সরলরেখায় যে জীবন প্রবাহিত হচ্ছিল, তা অকস্মাৎ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে রজনীর আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এই কাহিনী তখন রজনীর একার কাহিনী না থেকে বিচিত্র জীবন-সম্ভারে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটার বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম খণ্ডে রজনীর প্রেম-পূর্ব জীবনের সরল কাহিনী প্রেমসঞ্চারের আবেগাকুল ঝোড়োবাতাস রজনীর নিস্তরঙ্গ জীবনে যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, তার ফলে রজনী রুটিন-বাঁধা সংকীর্ণ জীবন থেকে দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ বিরাট সংসারের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায়ভাবে সেই স্রোতে এগিয়ে গেছে। সেখানে রজনীর কথা আর একার কথা নয়, সকলের সঙ্গে তার কথা বিবৃত।"

রজনী অন্ধ যুবতী। তার অসহায়তা তাকে আকুল করে তুললেও ধৈর্যের বাঁধ ভেঙ্গে তাকে ভেসে যেতে দেয়নি। তার পেছনে রয়েছে রজনী-চরিত্রের অন্তর্নিহিত সততার শক্তি। এই সারল্য ও সততা তাকে বিপর্যস্ত করতে পারেনি। বাইরের জগতের ঘটনা বা জীবনপ্রবাহ প্রত্যক্ষ করা তার পক্ষে সম্ভব নয়, সেজন্য সে অভিজ্ঞতাও তার নেই। সেই বিষয়ীবুদ্ধি বা সাংসারিক জ্ঞানও তার নেই। শচীন্দ্রকে না-পাওয়ার তীব্র বেদনা, অন্যদিকে গঙ্গাতীরে নির্জন অবস্থার অসহায়ত্ব অন্ধ যুবতীকে জীবনবিসর্জনে প্রণোদিত করেছে।

এই অবস্থায় অমরনাথের আবির্ভাব কাহিনীর গতিকে শুধু নিয়ন্ত্রিত করেনি, রজনী-চরিত্রের বিকাশেও সহায়তা করেছে। রজনীর জীবন এখান থেকে যেন অন্য খাদে প্রবাহিত। কাহিনী তীব্র বেগে ঘটনার নানা বৈচিত্র্যজাল বিস্তার করে এগিয়ে গেছে, রজনী সেখানে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় সক্রিয় না হলেও তার চরিত্রের সেই নমনীয়তা, সেই মিতবাক্ ভঙ্গী, সেই সারল্য সমগ্র কাহিনীকে অদৃশ্যজালে আবৃত করে রেখেছে। তাই বাইরের থেকে মনে হয়, রজনী ঘটনাস্রোতে ভেসে চলেছে। কিন্তু এ আত্মসমর্পণ, ঘটনার ঘনঘটা ও বিস্তার, তীব্র গতিবেগের সঙ্গে তাল রাখতে না পারার জন্য। তাতে রজনী-চিত্তের দ্বন্দ্ব তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে। এই বেদনা-

বিহ্বল চিত্তে রজনীর পক্ষে এককভাবে নিজের কাহিনী বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তাকে কেন্দ্র করে এমন সব ঘটনা ঘটে চলেছে যা রজনীর একান্ত অনভিপ্রেত। তাই রজনী সাংসারিক বুদ্ধি নিয়ে কোনও কিছুই যেন গ্রহণ করতে চায়নি।

অমরনাথ যখন তার জীবন শুধু নয়, তার নারীত্বের মর্যাদাকে রক্ষা করেছেন, তখন অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে উঠেছে। অমরনাথ যখন তার সম্পত্তি উদ্ধার করেছেন, তখন সেই সম্পত্তির প্রতি তার কোনও আসক্তি দেখা যায়নি। চিরকাল দারিদ্র্যের মধ্যে প্রতিপালিত হয়েও সে প্রাচুর্যের প্রতি কোনও আকর্ষণ বোধ করেনি। এর পেছনে রয়েছে শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমের তীব্রতা ও আত্মনিবেদন, আনুগত্য। এই নিষ্ঠা রজনী-চরিত্রের দৃঢ়ভিত্তি। অমরনাথ যখন তাকে বিবাহ করতে চেয়েছেন, তখন সে মুখ ফুটে তার মনোভাব বলতে সঙ্কোচবোধ করেছে। শুধু তাই নয়, অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতার জন্য সে নীরবে অশ্রুবিসর্জন করলেও নিজের আকাঙ্ক্ষাকে জোর করে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়নি। যে প্রেমের মহিমায় রজনী মহিমান্বিতা, তার প্রকাশ ভোগে নয়, ত্যাগে; প্রাপ্তিতে নয়, অপ্রাপ্তিতেই সে বিরহের দহন জ্বালায় নিজেকে দগ্ধ করতে চেয়েছে। একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি প্রথম প্রেমের তীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত দুর্বলতা রজনী-চরিত্রকে শুধু বেদনায় ক্ষত-বিক্ষত করেছে, কোন সমাধানের পথ নির্দেশ করতে পারেনি। যদি অমরনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নিজেকে সারিয়ে না নিতেন, রজনীর পক্ষে নিজের প্রথম প্রেমের মহিমা ঘোষণা করা সম্ভব হত না। তার চিত্তের আকাঙ্ক্ষাকে ত্যাগ করতেও সে রাজী নয়, আবার আকাঙ্ক্ষাকে সরব ঘোষণার দ্বারা প্রচার করে প্রতিষ্ঠিত করতেও তার সঙ্কোচ। এর ফলে চিত্তের দ্বন্দ্বই তার একমাত্র প্রাপ্য। তাই শচীন্দ্রের সঙ্গে তার বিবাহের প্রস্তাব লবঙ্গলতা যখন তার কাছে করেছে, তখনও সে চোখের জল ফেলেছে, কারণ অমরনাথকে 'না' বলার শক্তি (বা অকৃতজ্ঞতা!) তার নেই। বিষয়-সম্পত্তির প্রতি সম্পূর্ণ অনীহা তার প্রেমের মহিমাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলেছে। এটুকু বুঝতে কারুরই কোনও অসুবিধে হয়নি যে, বিষয়-সম্পত্তি নিয়ে বাইরের সংসারে যতই লড়াই হোক, তার অভাব রজনী-চিত্তকে বিন্দুমাত্র আন্দোলিত করতে পারেনি। যার চিত্ত প্রেমের মহিমায় আচ্ছন্ন, জাগতিক লাভক্ষতি দিয়ে সে জীবনকে কথনই বিচার করে না।)

(অমরনাথ যখন তাঁর একদিনের দুর্বলতার কাহিনী রজনীর কাছে বিবৃত করে নিজের বিবেককে মুক্ত রাখতে চেয়েছেন, তখন রজনীও বলেছে—"আমিও আপনার যোগ্য নহি—"। এর বেশী কিছু বল্‌তে চায়নি সে। আত্মনিবেদনে যে চিত্ত নম্র,

সে বেশী বাগাড়ম্বরের দ্বারা তার অনুরাগের গভীরতাকে সপ্রমাণ করতে চায় না। তাই রজনীর অন্তরের কথাটি বলেছে লবঙ্গলতা।

ঘটনার তীব্র গতিপ্রবাহে এই সংসার অনভিজ্ঞা অন্ধ যুবতী যেন বিহ্বল হয়ে পড়েছে। সে তার অনুভূতির দ্বারা যতখানি প্রেমকে উপলব্ধি করেছে, ভাষার দ্বারা তাকে ততখানি প্রকাশ করতে পারেনি। তাই "অনুভূতির মধ্যেই চিরন্তন প্রেমের স্বরূপটি এমন প্রত্যক্ষরূপ ধারণ করিয়াছে, এমন জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে, এমন গভীর ব্যঞ্জনায় মুখর হইয়া উঠিয়াছে যে ইহাকে একটি প্রেম কাব্যের আখ্যানেও বিভূষিত করা চলে।"

একথা ভুললে চলবে না যে, রজনীর প্রথম প্রেমের পদসঞ্চার থেকে তার প্রেমের বিকাশ ও সার্থকতার স্বর্গে পরিণতি সবই রজনীর মানসগতিপথে বিচরণ করেছে; বাইরের ঘটনাপ্রবাহ তার মনের এই প্রবণতাকে খুব বেশী প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করতে পারেনি। তা না হ'লে তার দারিদ্র্য থেকে মুক্তির সুযোগ, অমরনাথের মত পুরুষের সান্নিধ্য ইত্যাদি নানা ঘটনায় রজনীর জীবনের ও মনের গতি ভিন্নমুখী হতে পারতো। কিন্তু শচীন্দ্রকে পাওয়ার আগেও যেমন সে মনের দিক থেকে যতই ক্ষত-বিক্ষত হোক না কেন, বাইরে যেমন নিষ্কম্প, শচীন্দ্রকে প্রাপ্তির পরেও সে তেমনি স্নিগ্ধ, নম্র। সেখানেও তাকে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতে দেখি না আমরা। হয়তো প্রেমের একনিষ্ঠ শক্তি তাকে বাইরের দিক থেকে বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারেনি। তাই কেউ কেউ বলেন, রজনীর জীবনকাহিনী নয়, তার প্রেমের মহিমাই এই উপন্যাসের মূল শক্তি। আর রজনী অন্ধ বলেই বোধ করি, তার চিত্ত কোনও অবস্থাতেই বিক্ষিপ্ত হয়নি—একাগ্রতাই বা একনিষ্ঠতাই তার প্রেমের মূল ভিত্তি।

রজনীর প্রেমের মহিমাকে বা শক্তিকে বঙ্কিমচন্দ্র ক্ষুণ্ণ করেছেন অলৌকিকতার সাহায্য নিয়ে। প্রেমের শক্তিতে নয়, সন্ন্যাসীর দৈবশক্তিতে যেন রজনী তার প্রেমাস্পদ শচীন্দ্রকে লাভ করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর একনিষ্ঠ প্রেমের শক্তিতে যেন ভরসা রাখতে পারেননি। তাই পরিশিষ্টে আমরা মন্তব্য করেছি—"নরনারীর মধ্যে প্রেমের যে অঙ্কুরোদ্গম এবং পারস্পরিক আকর্ষণের জলসিঞ্চনে তা যেমন ধীরে ধীরে বর্ণবৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, প্রেমের সেই স্বাভাবিক লীলারহস্য এখানে অনুপস্থিত। রজনীকে বিবাহ করার যে মানসিকতা শচীন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার পশ্চাতে যে কারণটি সক্রিয়, তার দ্বারা প্রেমের মহিমা লাঞ্ছিত। সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবের দ্বারা যেভাবে শচীন্দ্রের বিরূপ মনকে রজনীর প্রতি

অনুরক্ত করে তোলা হয়েছে, তা যেমনই আকস্মিক, তেমনই অস্বাভাবিক। এর জন্য লেখকের কোন পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না।”

অমরনাথের প্রতি রজনী যে অকৃতজ্ঞ নয়, অমরনাথের ত্যাগের মহিমাকে সে পূর্ণ মর্যাদাই দিয়েছে—সে প্রতি মুহূর্তে মনে রেখেছে, অমরনাথের আনুকূল্য ভিন্ন তার সঙ্গে শচীন্দ্রের মিলন সম্ভব হতো না। এই কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রজনী-শচীন্দ্র দাম্পত্য-প্রেমের মিলন-মাধুর্যকে চিহ্নিত করে রেখেছে, তাদের সন্তানের নামের মধ্যে —'অমরপ্রসাদ' অর্থাৎ অমরের কৃপায়।)

লবঙ্গলতা

লবঙ্গলতা চরিত্রটি বঙ্কিম-সাহিত্যে একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র-সৃষ্টি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সমগ্র উপন্যাস-সাহিত্যে যে ক'টি প্রেমিকা চরিত্র চিত্রিত করেছেন, লবঙ্গলতা তাদের মধ্যে স্বাতন্ত্র্যে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। যৌবনের প্রথম পর্বে লবঙ্গলতা ও অমরনাথের মধ্যে বিবাহের কথা ওঠে। কিন্তু অমরনাথের পারিবারিক কোনো কলঙ্কের জন্য সে বিবাহ পরিণতিলাভ করে না। লবঙ্গলতা অপরূপ সৌন্দর্যের অধিকারিণী। সেই রূপ সম্পর্কে তার মনে মনে যে দেমাক ছিল, অমরনাথের প্রতি আচরণে তা প্রকাশ পেয়েছে। সেই উনিশ বছরে যুবতী লবঙ্গলতার সঙ্গে ঘটনাচক্রে বিবাহ হয় তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ রামসদয় মিত্রের। যৌবনোচিত আবেগ উচ্ছ্বাস এই বৃদ্ধকে কেন্দ্র করে লবঙ্গলতা যতই প্রকাশ করতে চেয়েছে, সেটা যে তার অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা ও বেদনাকে চাপা দেবার জন্য একটা কৌশল মাত্র, তা বুদ্ধিমতী লবঙ্গলতা সবসময় গোপন রাখতে পারেনি।

আমরা জানি, লবঙ্গলতা নিঃসন্তানা। সন্তান লাভের মধ্য দিয়ে দাম্পত্য-জীবনের যে পরিণতি তার অভাব আমরা লবঙ্গলতার মধ্যে অনুভব করি। লবঙ্গলতার প্রায় সমবয়স্ক শচীন্দ্রনাথের প্রতি লবঙ্গের যে বাৎসল্য প্রকাশ পেয়েছে, তা আতিশয্যে পরিপূর্ণ। যেখানে হৃদয়ের প্রকাশ স্বাভাবিক নয়, সেখানে এই কৃত্রিমতাকে স্বাভাবিক করতে গেলে আতিশয্য আসবেই। তার বধূজীবন ব্যর্থ হ'লেও জীবনের আচরণ দিয়ে সে সেই অভাবকে ভুলতে চেয়েছে।

রামসদয় মিত্রের প্রতি লবঙ্গলতা কোনোদিন অশ্রদ্ধার ভাব প্রকাশ করেনি সত্য, 'পতি পরম গুরু' বলে সম্ভ্রমও প্রকাশ করেছে সে। কিন্তু স্বামীকে কেন্দ্র করে নারী-চিত্তের আবেগ ও উচ্ছ্বাস, তা এই তেষট্টি বছরের বৃদ্ধ রামসদয়কে কেন্দ্র করে কখনই প্রকাশ পেতে পারে না। দাম্পত্য-প্রেমের এই উষ্ণতার অভাব লবঙ্গলতার নিঃসন্তান

হওয়ার মধ্যে যেন সেই ইঙ্গিতই বহন করছে। কিন্তু লবঙ্গলতা এতই বুদ্ধিমতী যে, তার এই হৃদয়ের শূন্যতাকে সে কোনভাবেই বাইরে প্রকটিত করতে চায়নি। তাই দান-ধ্যানে, পরোপকারের মধ্য দিয়ে, হাসি-ঠাট্টা-গল্পে লবঙ্গলতা তার হৃদয়ের হাহাকারকে চেপে রাখতে চেয়েছে।

এ তো গেল লবঙ্গলতা চরিত্রের একটি দিক। অন্যদিকে জীবনের স্বাভাবিক বিকাশ যেখানে ব্যাহত, সেখানে লবঙ্গলতা বিকৃতির পথ ধরেছে। বাইরের আচরণে যতই সে হাসিখুশী হোক, তার জীবনপথ এবং চরিত্র মোটেই সরল নয়। দম্ভ, আত্মম্ভরিতা তাকে স্বার্থ চরিতার্থতার পথে এমনই মরিয়া করে তুলেছে যে, তার জন্য যে-কোনো পথ অবলম্বন করতে সে কুণ্ঠিত নয়। এই প্রবণতা তার জীবনের প্রথম পর্ব থেকেই আমরা লক্ষ্য করেছি। এই দাম্ভিকতা তাকে এমনই বেপরোয়া করে তুলেছে যে, সে অমরনাথের সাময়িক রূপমুগ্ধতার দুর্বলতায় তাঁর পিঠে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে 'চোর' লিখে দিয়ে তার দম্ভকে চরিতার্থ করেছে। এ তো গেল তার বিবাহ-পূর্ব জীবনের কথা। রামসদয়ের গৃহে গৃহিণী হওয়ার পরেও তার এই মানসিকতার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন ঘটেনি। তাই সে রজনীকে যেখানে পাত্রস্থ করতে চেয়েছে, তা সার্থক করার জন্যে যে-কোনোও পন্থা নিতে কুণ্ঠিত হয়নি।

দীর্ঘ ব্যবধানের পর অমরনাথ যখন পুনরায় তার জীবনে এসে উপস্থিত, তখনও সে অমরনাথের বিরোধিতা করবার জন্য আত্মপ্রত্যয়ে বলীয়ান। যখন সে শুনেছে রামসদয় মিত্রের সমগ্র সম্পত্তির মূল অধিকারিণী রজনী এবং সেই রজনীকে অমরনাথ বিবাহ করতে উদ্যত, তখন আহতা ফণিনীর মতো প্রতিহিংসা গ্রহণে লবঙ্গ রুখে দাঁড়িয়েছে। অমরনাথকে সে ভয় দেখিয়েছে, তার প্রথম জীবনের কলঙ্ক কাহিনী প্রকাশ করে দেওয়ার। কিন্তু তাতেও সে অমরনাথকে খুব বেশী বিব্রত করতে পারেনি। রজনীর পরিচয় জানতে পেরে এবং সম্পত্তি রক্ষা তথা আত্মরক্ষার তাগিদে লবঙ্গ শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিতে বদ্ধপরিকর। যে বিবাহের প্রস্তাব রামসদয় অত্যন্ত দ্বিধাভরে উত্থাপিত করেছে, লবঙ্গ সেই বিবাহকে সার্থক করে তুলতে যে-কোনো পন্থা অবলম্বনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। এজন্য সে রজনীর দ্বারস্থ হতেও কুণ্ঠিত হয়নি। লবঙ্গের এই দৃঢ়তা, এই কর্মকুশলতা বা সক্রিয়তার পশ্চাতে যে সত্যটি বার-বার প্রকট হয়ে উঠেছে, তা হলো লবঙ্গের স্বার্থপরতা। এই স্বার্থপর নারী শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিতে চেয়েছে তাদের প্রেমের মহিমাকে মর্যাদা দিতে নয়, বিষয়-সম্পত্তি হারিয়ে নিঃস্ব হবার আতঙ্কে লবঙ্গ এত কর্মতৎপর।

এজন্য সে সন্ন্যাসীর সাহায্য নিয়ে শচীন্দ্রের চিত্তে রজনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের

জন্যে সচেষ্ট হয়েছে। ফলে শচীন্দ্রের চিত্তবিকার ঘটেছে এবং রজনী ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের সমগ্র সত্তাকে অধিকার করে লবঙ্গের অভিলাষকে সার্থক করে তুলতে চেয়েছে। পাছে লবঙ্গের এই মানসিকতা ধরা পড়ে যায়, শচীন্দ্রের এই চিত্ত-বিকৃতির জন্য সকলে তাকে দায়ী করে, এজন্য লবঙ্গ শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেওয়ার উদ্দেশ্যে অমরনাথের বিরুদ্ধে কৌশল অবলম্বন করেছে। অবশ্য এত করেও অমরনাথের মহত্ত্বের কাছে লবঙ্গলতাকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছে এবং অমরনাথ যে মুহূর্তে জেনেছে রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত, তখনই সে মাঝখান থেকে সরে দাঁড়িয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত অমরনাথের মহত্ত্বের কাছে, আত্মত্যাগ ও ঔদার্যের কাছে লবঙ্গকে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। যে নারী জীবনের প্রথম পর্ব থেকে শুধু জয়মাল্য লাভ করে দম্ভে স্ফীত হয়ে কোনো বাধাকেই সহ্য করতে পারেনি, আজ অমরনাথের ঔদার্যের বিরাট আকাশ তলে তাকে নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা চাইতে হয়েছে। এই পরাজয়ের বেদনায় লবঙ্গ এমনই বিহ্বল হয়ে পড়েছে যে, তার জীবনের বাইরের মুখোশের অন্তরাল থেকে তার চিত্তের সত্য-স্বরূপটি আর গোপন থাকেনি। মুখে সে বলেছে, রামসদয়ের স্ত্রীরূপে সে পরম সুখী, প্রমাণ করতে চেয়েছে স্বামীর প্রেমই তার ধ্যান-জ্ঞান। কিন্তু সে জানতেও পারেনি তার এই ছদ্ম-আচরণের পর্দাটি কখন খসে পড়ে গিয়ে অশ্রুসিক্ত লবঙ্গলতা অমরনাথকে বলেছে, "স্ত্রীলোকের কত বল, তা নাই বা পরীক্ষা করলে।" লবঙ্গলতা অমরনাথের কাছে ক্ষমা চেয়েছে, কিন্তু এইখানে অমরনাথের সঙ্গে তার কথাবার্তায় এতদিন ধরে লালিত তার মুখোশটি অজ্ঞান্তে কখন খসে পড়েছে। অমরনাথ বলেছে—"আমি আর আসিব না। আর কখনও তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখনও ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কু-চরিত্র নহে তবে তুমি আমার প্রতি একটু অনুমাত্র স্নেহ করিবে।

লবঙ্গ—তোমাকে স্নেহ করিলে আমি অধর্মে পতিত হইব।

অমর—না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই।

লবঙ্গ—না। যে আমার স্বামী না হইয়া আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখনও হইবে না।

আবার ইহলোকে···দেখিলাম লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।" এই সাক্ষাৎকারই লবঙ্গের সঙ্গে অমরনাথের শেষ সাক্ষাৎকার। তার দু'বছর বাদে অমরনাথের সঙ্গে শচীন্দ্র-

রজনীর সাক্ষাৎকার ঘটেছিলো বটে, কিন্তু তা লবঙ্গের কাছ থেকে অনেক দূরে ভবানীনগরে। ঠিক এই কথাবার্তার আগে যখন লবঙ্গ অমরনাথের মহত্ত্বের কাছে পরাজয় স্বীকার করে ক্ষমাপ্রার্থী, তখনকার সংলাপও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য—"লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল···তুমি নাকি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ?

আমি—যাইব।

লবঙ্গ—কেন?

আমি—যাইব না কেন? আমাকে যাইতে বারণ করিবার তো কেহ নাই।

লবঙ্গ—যদি আমি বারণ করি।

আমি—আমি তোমার কে যে বারণ করিবে।

লবঙ্গ—তুমি আমার কে। তা তো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, যদি লোকান্তর থাকে তবে?

লবঙ্গলতা বলিল, আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে। আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।

আমি বড় বিচলিত হইলাম। বলিলাম, আমি সেকথায় বিশ্বাস করি···।"

বিবাহিতা নারী অন্য পুরুষের প্রতি আসক্ত হওয়া সত্ত্বেও বঙ্কিম-লেখনীতে পরম দরদে তা চিত্রিত হলো। শৈবলিনী শাস্তি পেয়েছে, রোহিণীও শাস্তি পেয়েছে, কুন্দর জীবনেও বেদনার কণ্টকমালা জুটেছে, কিন্তু মনের দিক দিয়ে নিঃস্ব হলেও লবঙ্গের এই মানসিকতা বঙ্কিমচন্দ্রের সহানুভূতি লাভ করেছে। কেননা, বাইরের দিক দিয়ে অর্থাৎ লৌকিক বিচারে বঙ্কিম তার সম্পর্কে কোনো কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেননি। তাই বলেছিলাম, লবঙ্গলতা-চরিত্র বঙ্কিম-সাহিত্যে অনন্যা।

রামসদয় মিত্রের সংসারের পরিচয় দিতে গিয়ে রজনী লবঙ্গলতার সঙ্গে পাঠকের পরিচয় করিয়ে দিয়েছে—"রামসদয় মিত্রের দেড়খানা গৃহিণী। একজন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা আর যিনি পুরা একখানা গৃহিণী তাঁহার নাম লবঙ্গলতা···দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিনী মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলআনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।" রজনীর বিবৃত পরিচিতির মধ্য দিয়ে আমরা জানতে পারি, লবঙ্গ শুধু রূপসী নয়, গুণবতীও।—"গৃহকার্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা; কেবল

বাক্যে বিষময়ী।" রামসদয়কে লবঙ্গলতা যৌবনের ভালবাসা দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চেয়েছিল। অন্ধ রজনীর কাছে লবঙ্গলতার এই ছলনা ধরা পড়া কখনই সম্ভব নয়। কারণ সংসার সম্পর্কে রজনী সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞা। বৃদ্ধের তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতা বাক্‌পটুতায় ও রসিকতায় সহজেই অন্যের চিত্তকে আকৃষ্ট করতে পারত। এবং তার এই সামাজিক মানসিকতা সকলের কাছেই তাকে প্রিয় করে তুলেছিল। রজনীর ফুলের মালা বা ফুল কেনা উপলক্ষে যে অতিরিক্ত মূল্য দিয়ে এই পরিবারকে সাহায্য করতে চাইত। সুতরাং বাইরের আচরণ দিয়ে লবঙ্গ তার মনের বাসনাকে সম্পূর্ণ গোপন করতে চাইত। তাই সাধারণের চোখে তার দয়ামায়া বা সহানুভূতি সহজেই মন হরণ করতে পারত। লবঙ্গ তার সযত্নলালিত প্রেমসত্তাকে নিপুণ কৌশলে গোপন রেখে হাসি-গল্পে সংসারের দায়দায়িত্ব কর্তব্য পালনে নিজেকে এমনভাবে মাতিয়ে রাখত যে, সেই আবরণ ছিন্ন করে তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করা সম্ভব ছিল না। মাঝে মাঝে কোনও অসতর্ক মুহূর্তে তার পরিহাস-রঙ্গের মধ্য দিয়ে বেদনার কালোমেঘ মুহূর্তের জন্য উঁকি দিত। এই মুহূর্তের আত্মবিস্মৃতির জন্যেই পাঠকের কাছে তার মানসিকতা গোপন থাকেনি। যেমন, যখন সে রজনীকে বলেছে—"কানি, তুই ভালবাসার কি জানিস! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্রগুণে সুখী।" তখন আমরা লবঙ্গের মানসিকতাকে ধরে ফেলি। কিংবা কাহিনীর শেষ অংশে অমরনাথের সঙ্গে কথাবার্তার মুহূর্তে লবঙ্গলতা সম্পূর্ণভাবে পাঠকের কাছে ধরা দেয়।

সপত্নীপুত্র শচীন্দ্রের প্রতি তার স্নেহের আতিশয্য শুধু নিজেকে ভুলিয়ে রাখার জন্য। এই স্নেহ থেকে রজনীও বঞ্চিত হয়নি। লবঙ্গলতা নিজে রূপসী, তাই তার অতৃপ্ত কামনাকে হয়তো সে তৃপ্ত করতে চেয়েছিল সুন্দরী রজনীকে বিবাহ দেওয়ার ব্যবস্থা করে। সম্পদ নয়, দাম্পত্য-প্রেমের মহিমায় যে জীবন সত্যকার সার্থক হয়ে ওঠে, রজনীর বিবাহ দিয়ে লবঙ্গলতা সেটাই যেন সপ্রমাণ করতে চেয়েছে। ফলে রজনীকে ভালবাসা দিয়ে আপন করে নিয়ে সে যেন তার Experimentকে সার্থক করতে চেয়েছে। লবঙ্গলতার আচরণের মধ্যে স্নেহের তুলনায় রজনীর প্রতি অনুকম্পার ভাগই বেশী।

লবঙ্গ শচীন্দ্রকে রজনীর বিবাহের জন্য সম্বন্ধ ঠিক করতে বলে নিজের অজান্তেই রজনী-জীবনে তীব্র গতিবেগ সঞ্চার করেছে। গোপালের সঙ্গে বিবাহের কথাবার্তা লবঙ্গ নিজ দায়িত্বে করেছে, কিন্তু সে একবারও বুঝতে পারেনি, রজনী ঘটনাচক্রে শচীন্দ্রকে মনে মনে পতিত্বে বরণ করে নিয়েছে। ফলে রজনীর গৃহত্যাগের ঘটনা এবং হীরালাল কর্তৃক নির্জন নদীতীরে পরিত্যাগ ও অমরনাথ কর্তৃক রজনীর উদ্ধার ইত্যাদি

ঘটনার মধ্য দিয়ে কাহিনীতে অমরনাথের অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যে অমরনাথকে কেন্দ্র করে লবঙ্গলতার জীবনে এমন একটি নাটকের অভিনয় গোপন রয়েছে, যাকে আর কেউ ভুললেও অন্ততঃ লবঙ্গ ভোলেনি। বরং অমরনাথকে লবঙ্গ ভুলতে পারেনি বলেই ভোলবার চেষ্টায় তার আচরণে আতিশয্য লক্ষ্য করা গেছে। তাই লবঙ্গ যখন জেনেছে অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করতে চায়, তার জিদ্ চেপেছে এবং সে বলেছে—"অমরনাথের এ বড় স্পর্ধা। আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়েছি—আর একবার না হয় কিছু শিক্ষা দিব।" অমরনাথকে সে ব্যঙ্গ করে বলেছে, "তুমি কস্মিন কালে স্ত্রীলোক চিনলে না…চোরেরা বুঝিতে পারে না যে পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য…।" অমরনাথ যখন রজনীর সম্পত্তি উদ্ধার করেছেন, তখন তিনি জানতেন না লবঙ্গলতা রামসদয় মিত্রের স্ত্রী। যৌবনে লবঙ্গের রূপে আকৃষ্ট অমরনাথ লবঙ্গের রূপবহ্নিতে যেভাবে আহত, তার জ্বালা ভুলতে অমরনাথকে অনেক সাধনার পথ উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

এই প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠতে পারে, রজনী উপন্যাসের নায়িকা রজনী না লবঙ্গলতা। এ বিষয়ে কোনো মতবিরোধ নেই যে, রজনীর তুলনায় লবঙ্গলতা অনেক বেশী কর্মতৎপর। কিন্তু কর্মতৎপরতাই নায়িকা হবার একমাত্র যোগ্যতা নয়। শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী মন্তব্য করেছেন—"পূর্ণিমা রজনীর নায়িকা কে? রজনী না পূর্ণশশী? চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তি মাত্রেই বলিবে পূর্ণশশী। রসিক পাঠক মাত্রেই বলিবে লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা-অমরনাথের প্রেমকাহিনীর সূত্রে রজনী উপন্যাস গ্রথিত।" কিন্তু আমাদের বক্তব্য, পূর্ণশশী তার সৌন্দর্য যে বিকীর্ণ করতে পেরেছে, তার পেছনে রজনীর পটভূমিকা রয়েছে বলেই। পূর্ণশশী যদি নিজের শক্তিতেই প্রাধান্য পেতো, তাহলে দিনের আলোতে পূর্ণশশীর দীপ্তি কোথায়? তার সৌন্দর্য বিকীর্ণ (কর্মতৎপরতা) করবার জন্য রজনীর উপস্থিতি অপরিহার্য। তাছাড়া, অমরনাথ-লবঙ্গের প্রেমকাহিনী মুখ্য উপাদান নয়। রজনী-জীবনের কাহিনীর একটি অংশে লবঙ্গ-অমরনাথের কাহিনী বিবৃত। ফলে অমরনাথ-লবঙ্গের সংঘর্ষের অন্তর্নিহিত কারণ আমরা উপলব্ধি করতে পারি। অমরনাথকে লবঙ্গলতা কোনোদিন ভুলতে পারেনি বলেই তার স্মৃতির দহনে লবঙ্গের অন্তর দগ্ধ হয়েছে। যে অমরনাথ যেভাবেই হোক, তার জীবনকে এইভাবে ব্যর্থ করে দিয়েছে, তাকে সে দংশন করতে উদ্যত। এ দংশন আসলে নিজের ভাগ্যকেই দংশন। উপন্যাসের শেষে রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়া যেমন অনেকটা রূপকধর্মী, তেমনি লবঙ্গলতার অমরনাথকে আঘাত করার পেছনেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই রূপকধর্মী মনোভাব কাজ করেছে। সমাজ-জীবনে লবঙ্গলতা রামসদয়ের স্ত্রী, কিন্তু

অন্তর্জীবনে অমরনাথ তার সমস্ত সত্তাকে আচ্ছন্ন করে আছে। তাই লবঙ্গ মুখে যা বলেছে তা তার বক্তব্যের অর্ধাংশ। বাকি অর্ধাংশ অনুচ্চারিত। মুখের সত্যটাই তো একমাত্র সত্য নয়। শুধু কি মুখের বাক্য শুনেছ দেবতা, শোননি কি লবঙ্গের অন্তরের কথা! তাই সেই সুপ্ত আধখানাতে সে অমরনাথকে ভালবাসে; আর ব্যক্ত আধখানার মালিক রামসদয়। এ প্রসঙ্গে প্রমথনাথ বিশীর মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"রামসদয় তাহার স্বামী মাত্র, অমরনাথ তাহার কাছে পুরুষ; তাহাদের মধ্যে স্ত্রী-পুরুষের সম্বন্ধ, সমস্ত মানবিক সম্বন্ধের আদিমতম বন্ধন। লবঙ্গলতা জানুক আর নাই জানুক, স্বীকার করুক আর নাই করুক, সে একমাত্র অমরনাথকেই ভালবাসে। যেমন ভালবাসিত প্রতাপ শৈবলিনীকে। লবঙ্গলতা প্রতাপের নারীমূর্তি।"

অমরনাথ

বঙ্কিম-সাহিত্যে যে-সব পুরুষ-চরিত্র পাওয়া যায়, অমরনাথ তার মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য চরিত্র। বঙ্কিম-সাহিত্য বিশ্লেষণ করে আমরা দেখেছি নারী ও পুরুষের যে দ্বন্দ্ব তাকে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করেছেন দেহ ও আত্মার দ্বন্দ্ব রূপে। প্রকৃতির অমোঘ নিয়মপাশকে এবং প্রবৃত্তির দাসত্বকে অতিক্রম করে যাবার চেষ্টায় পুরুষের জীবনে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। তার ফলস্বরূপ আমরা দেখেছি হয় জীবনকে অস্বীকার করে অধ্যাত্মলোকে প্রয়াণ, নয়তো সম্পূর্ণভাবে প্রবৃত্তির কাছে আত্মসমর্পণ। জীবনের এই অতি সত্য উপলব্ধিকে উপন্যাসের মধ্য দিয়ে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র পুরুষের মধ্যে চিত্তদ্বন্দ্ব দেখিয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে নারী প্রবৃত্তির ইন্ধনস্বরূপা। শক্তিমান পুরুষ এই প্রবৃত্তির তীব্র আকর্ষণে নারীর কাছে ছুটে গেছে, কিন্তু পুনরায় আপন আত্মিক শক্তিতে নিজে সচেতনতা ফিরে পেয়েছে। কিন্তু দুর্বল পুরুষ নারীর আকর্ষণে নিজের জীবনকে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে।

অমরনাথ কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ করেছেন রজনীর পরিত্রাতারূপে। ঘটনাচক্রে রজনীকে নির্জন নদীবক্ষে পরিত্যাগ করে হীরালাল যখন চলে যায়, অন্ধ রজনী ঘটনাচক্রে নির্জন নদীতীরে দুর্বৃত্ত কর্তৃক আক্রান্ত হলে অমরনাথ অকস্মাৎ সেখানে দেখা দিয়ে রজনীকে উদ্ধার করেন। অন্ধ রজনীকে নিয়ে আহত অমরনাথ তাঁর আত্মীয়ের বাড়িতে রজনীর পরিচর্যায় ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করেন। রজনীর কাছে তার পলায়নের কাহিনী শুনে অমরনাথ তাকে নিয়ে কলকাতায় আসেন ও রজনীর সত্যকার পরিচয় উদ্ঘাটনে তৎপর হয়ে ওঠেন।)

(দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথ নিজের পরিচয় প্রদান করেছেন। বিদ্যা, বুদ্ধি, অর্থ, রূপ,

যৌবন কিছুরই অভাব অমরনাথের জীবনে ছিল না। কিন্তু সব থেকেও অমরনাথ সংসারে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। ধনী, শিক্ষিত অমরনাথের জন্য বিবাহের সম্বন্ধ তাঁর পারিবারিক কুলকলঙ্কের জন্য বারবার ভেঙে গেছে। শেষে তাঁর পিসীর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে লবঙ্গলতার সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ হয়। লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের পূর্বপরিচয় ছিল, কেননা পড়াশুনার ব্যাপারে লবঙ্গকে সাহায্য করতেন অমরনাথ। কিন্তু এ বিবাহের সম্বন্ধও ভেঙে যায়। লবঙ্গলতা সত্যকারের রূপসী। এই রূপের তীব্র আকর্ষণে অমরনাথ মোহগ্রস্ত হন। এই রূপমোহ অমরনাথের সমস্ত ঔচিত্যবোধকে সাময়িকভাবে শুদ্ধ করে দেয়। ফলে, লবঙ্গকে পাওয়ার নেশায় অমরনাথ তস্করের মতো গোপনে লবঙ্গের কাছে গিয়ে শুধ্ লাঞ্ছিত হয় তাই নয়, দুরপনেয় কলঙ্ক চিহ্নস্বরূপ লবঙ্গলতা তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠে লিখে দেয় 'চোর'। এই আঘাত অমরনাথ-জীবনে সম্পূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে। রূপমোহের আকর্ষণের তীব্রতা থেকে তিনি নিজেকে মুক্ত করেন বটে তাঁর পরিশীলিত মানসিক শক্তিতে। কিন্তু অন্তরের অন্তস্তলে লবঙ্গলতার জন্য মমত্ববোধকে অমরনাথ লালন করে চলেছেন। রূপসঞ্জাত মোহ থেকে অমরনাথ নিজেকে মুক্ত করতে পারেননি, যদিও সংযত করেছেন। তাই তাঁর এই মানসিক দ্বন্দ্ব থেকে পরিত্রাণের আশায় অমরনাথ ভবঘুরের জীবন গ্রহণ করেছেন। তাঁর এই বৈরাগ্য বেদনার তীব্র দহনে অগ্নিশুদ্ধ। তাই নিজের কাহিনী বলতে বসে অমরনাথের কণ্ঠে বেদনার স্পষ্ট আমেজ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে—"আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙিয়াছে তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব। দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সর্তক হইতে পারিবে।"

নিজের কাহিনী বলতে গিয়ে লবঙ্গ-ঘটিত কলঙ্কটুকু বাদে অমরনাথ কিছুই গোপন রাখেননি। একদিন তাঁর সবই ছিল। নিবাস শান্তিপুর, সৎ কায়স্থ বংশজাত, ধনী, শিক্ষিত, স্বাস্থ্যবান্ যুবক অমরনাথ। পিতার মৃত্যুর পর পিসীমার শ্বশুরবাড়ী সম্পর্কের গ্রাম কালিকাপুরে লবঙ্গের প্রতি রূপমুগ্ধতা তাঁর বর্ণনার মধ্যেই ধরা পড়েছে—"তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গ-কলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনি চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না! বস্তুতঃ, অতীত শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত যৌবনের সৌন্দর্য এবং অস্ফুট বাক্ শিশুর সৌন্দর্য—ইহাই মনোহর; যৌবনের সৌন্দর্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-

ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনির ছটা, বেণীর দোলানি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনি, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য দেখি, তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্ত ভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্যই সৌন্দর্য।”

মনে যা সৌন্দর্য বাইরে তাই প্রেম। সৌন্দর্য থেকেই প্রেম সঞ্জাত। একজনকে সুন্দর দেখি বলেই তার প্রতি চিত্তের আসক্তি জাগে। এই আসক্তির সঙ্গে আবার মোহ বা কামও জড়িত। তাই রূপ থেকে সঞ্জাত যে মোহ, তা কাম এবং প্রেমের মিশ্রিত উপাদানে গঠিত।

অমরনাথের পরিশীলিত মন আত্মবিশ্লেষণ করে সত্যকে জানবার চেষ্টা করেছে। তাই মূল কাহিনীতে তার ভূমিকা ও কার্যকলাপ বর্ণনার পূর্বেই অমরনাথ নিজের চিত্তকে বিশ্লেষণ করেছেন। তিনি বলেছেন—“আমার সব ছিল। ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল কিছুরই অভাব ছিল না। অদৃষ্ট দোষে একদিনের দুর্বুদ্ধির দোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ, এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মতো দেশে দেশে বেড়াইলাম।”

নিজের সুখে ইচ্ছাকৃতভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে অমরনাথ দুঃখময় জীবনকে বরণ করে নিলেন। একটা আশাভঙ্গজনিত বেদনায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়ে অমরনাথের জীবন কাটল। তাঁর একদিনের সেই দুষ্কর্মের স্মৃতি মন থেকে মুছে ফেলতে পারেননি বলেই সংসার তাঁর কাছে শ্রীহীন, জীবন অর্থহীন মনে হয়েছিল। তাই তাঁর মনে জিজ্ঞাসা জেগেছে—“সুখদুঃখের বিধান পরের হাতে। কিন্তু মন তো আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া কেন ডুবিয়া রহিলাম! সাঁতার দিয়া তো কূল পাওয়া যায়। আর দুঃখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে তো নিজের আয়ত্তে···পর কেবল বহির্জগতের কর্তা—অন্তর্জগতে আমি একা কর্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন?” তাই তাঁর হৃদয়ক্ষত উপশমের আশায় তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়ালেন। এর পরেই অমরনাথ নিজেকে বিশ্লেষণ করেছেন। আত্মবিশ্লেষণ করতে গিয়ে অমরনাথ জীবনের সুখ অন্বেষণ করে পাননি—“চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে আমি কাল চাহি না।···কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি। দুঃখ নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি তাহা নিরূপণের আবশ্যক।” এইভাবে অমরনাথ দুঃখের স্বরূপ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। কোনো কিছুর অভাবই যদি দুঃখ হয়, অমরনাথের তো কিছুরই অভাব নেই। ধন-যশ-মান-রূপ

স্বাস্থ্য-বুদ্ধি-বিদ্যা-ধর্ম কিছুরই তো অভাব অমরনাথের নেই। আর ভালবাসাই যে দুঃখ তার প্রমাণ লবঙ্গলতা। সুতরাং ভালবাসা জীবনে না পেলাম তো দুঃখ কেন? নিজেকেই প্রশ্ন করেছেন অমরনাথ—"আবার কাম্যবস্তু কি? আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ।" অর্থাৎ অমরনাথের জীবনে কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই, কোনো প্রাপ্তির প্রত্যাশা নেই, ভবিষ্যতের স্বপ্ন নেই। তাই বুঝি জীবন সম্পর্কে, সংসার সম্পর্কে, জাগতিক সম্পদ সম্পর্কে একটা অনাসক্ত ভাব,—তাই বুঝি অমরনাথ পথ চলার মধ্যেই সান্ত্বনাকে খুঁজে পেয়েছেন। তাই বুঝি পরোপকারের মধ্যে জীবনের সত্যকে অমরনাথ খুঁজে পেয়েছেন। পরের জন্য নিজেকে সমগ্রভাবে নিয়োজিত করার মানসিকতা যখন অমরনাথকে পেয়ে বসেছে এই পটভূমিকায় রজনীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎকার এবং রজনীর সম্পত্তি উদ্ধার করতে গিয়ে অমরনাথ আবার সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছেন। এই বৈরাগী মন নিয়েই রজনীর রূপ তথা সৌন্দর্য অমরনাথ-চিত্তে মোহ বিস্তার করেছে। তাই অমরনাথকে বলতে শুনি—"এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর কখনও কাহাকে ভালবাসিব না।...সহজেই এই পুষ্পনারী কর্তৃক মোহিত হইলাম।" এই রূপমুগ্ধতাই অমরনাথকে রক্তমাংসের সজীব মানুষরূপে আমাদের কাছে উপস্থাপিত করেছে। অমরনাথের আর যেসব পরিচয় এই উপন্যাসে পাই, তাতে আদর্শবাদী, ত্যাগী ও মহৎ চরিত্রের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ ঘটে বটে, কিন্তু উষ্ণ মানুষের সাক্ষাৎ পাই না—যে মানুষ দোষে গুণে আমাদেরই মধ্যকার একজন। যার সঙ্গে প্রণয়ের নৈকট্য স্থাপন করা যায়, সম্ভ্রমের দূরত্ব নিয়েই যিনি থাকেন না। তাই বোধ করি অমরনাথ বলতে পেরেছেন—"মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রিস্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল।...মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি এমনই চিরকাল দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দন কানন আনিয়া বসাইল। আমার এ সুখের আর সীমা নাই।...যে চিরকাল পরাধীন, পরপীড়িত দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্বেশ্বর সার্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সে আনন্দ!" ভালবেসেছিলেন বলেই অমরনাথ রজনীর কাছে তাঁর প্রথম যৌবনের রূপোন্মত্ততার কথা গোপন করেননি। আমরা জানি, রজনীও অপূর্ব সুন্দরী। তাই এই "রূপ" অমরনাথ-চিত্তে পুনরায় সমস্ত যুক্তির বন্ধনকে আচ্ছন্ন করে মোহসঞ্চার করেছে।

আগেই বলেছি, সৌন্দর্য ও প্রেম একে অন্যের উপর নির্ভরশীল। প্রেমে মানুষ অসুন্দরকেও সুন্দর দেখে, সৌন্দর্যবোধ মানুষের প্রেমসত্তার জাগরণ ঘটায়। তার সঙ্গে কামনা যুক্ত থাকে। অনাস্বাদিত সুপক্ক সুন্দর ফলটির আস্বাদন-আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত কাতর হয়। এই আস্বাদনের কাতরতা-ই কাম। অমরনাথের মতো সন্ন্যাসী চরিত্র, যিনি ত্যাগে ও উদারতায় আদর্শস্থানীয়—তাঁর চিত্তে-ও এই সুন্দর মোহজাল বিস্তার করে' বিহ্বল করে তোলে।

এই উদারচেতা অমরনাথকে রূপমুগ্ধতা এতো দুর্বল করে তুলেছে যে, রজনীকে লাভ করার স্বপ্নে অমরনাথ বিভোর। রজনী-ও অমরনাথের ইচ্ছার কাছে আপত্তি জানাতে পারেনি কৃতজ্ঞতার বশে, কারণ অমরনাথ শুধু তার জীবনরক্ষাকারী নয়, মর্যাদারক্ষাকারী। নিজের মনে রজনী দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত—একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি প্রথম প্রেমের তীব্র আকর্ষণ, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাবোধ। অমরনাথ রজনীর এই মানসিকতা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

অমরনাথ সম্পর্কে লবঙ্গ মনে করেছে, অমরনাথ রজনীকে লাভ করতে চান সম্পত্তির লোভে। কিন্তু তার ভুল ভাঙতে দেরী হয়নি। লবঙ্গ চিরকাল নিজের জেদ বজায় রেখে এসেছে--কখনও পরাজয় বরণ করেনি। আজ একদিকে দারিদ্র্য বরণের চিন্তা তাকে যেমন কাতর করেছে, অন্যদিকে রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দেবার পরিকল্পনা অমরনাথের জন্য ব্যর্থ হতে চলেছে --এ ক্ষোভ লবঙ্গকে বৃশ্চিক দংশনের মতো কাতর করেছে। অমরনাথের মহত্ত্বের কাছে লবঙ্গ পরাজিত হয়ে নিষ্ফল আক্রোশে ক্রন্দনরতা; পরাজিতা লবঙ্গের এই আচরণে অমরনাথ কাতর হয়ে উঠেছেন;--"...যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, 'ক্ষমা কর। আমি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।'

আমার বুক ভাঙিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে!...লবঙ্গ তখন রজনীর কাছে যাহা শুনিয়াছিল অকপটে সকল বলিল। রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।"

এরপরেই অমরনাথকে দেখি নিজের সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্ত নিতে। অমরনাথের মধ্যে এমন একটি উদাসীন পুরুষ আত্মগোপন করে আছে, যা ঘটনাচক্রে অমরনাথকে বারবার নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। অমরনাথ রজনীকে বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত যখন নিশ্চিতভাবে নিয়েছে, তখন তিনি বলেছেন, "এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল...শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি

এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।" এর পরেই অমরনাথ আবেগময় ভঙ্গীতে পরম শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ করে সুখ এবং শান্তির অন্বেষণ করেছেন। দর্শনে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে অমরনাথ সেই পরম শক্তিকে খুঁজেছেন এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করেই শান্তি পেতে চেয়েছেন। শেষে অমরনাথ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই পরম শক্তির কাছে সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছেন। রজনীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত করে অমরনাথ যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তার দ্বারা তাঁর আত্মশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু সংসার সম্পর্কে তার এই নিরাসক্তি তিনি দেবতার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন। ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা ও দুঃখকে তিনি ভুলে থাকতে চেয়েছেন। এ এক ধরনের আত্মবিসর্জন। এই আত্মবিসর্জনের স্থির সংকল্প নিয়ে অমরনাথ তাঁর চিত্তের দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়েছেন। যে রজনীকে কেন্দ্র করে দীর্ঘদিন বাদে অমরনাথ-চিত্তে প্রেমবোধের জাগরণ ঘটেছিল, সেই রজনী সম্পর্কে অমরনাথ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা ব্যক্তিস্বার্থের দিকে তাকিয়ে নয়। যে শচীন্দ্রের চিত্তবিকার রজনীকে উপলক্ষ করে দেখা দিয়েছিল, শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর প্রেমের যে পরিচয় অমরনাথ পরে উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মসংযমের দ্বারা অমরনাথ সে সমস্যা দূর করে শচীন্দ্র-রজনীর মিলন ঘটিয়েছেন ও লবঙ্গলতার প্রতিজ্ঞাও তাতে পূরণ করতে পেরেছেন। নিজেদের লাভক্ষতি নিয়ে মানুষগুলি সংসারে চলতে চেয়েছে। তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন অমরনাথ আত্মসংযমের দ্বারা নিজেকে বঞ্চিত করে। তাঁর চিত্তের দাহ, তাঁর বেদনা তাঁকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। সমুদ্রের প্রশান্তি নিয়ে অমরনাথ তাঁর ঔদার্যকে প্রকাশ করেছেন, সমুদ্রের অন্তরে যে অন্তঃ-প্রবাহের প্রচণ্ড বেগ, বাইরের প্রশান্তিভেদ করে তার প্রকাশ ঘটেনি। সে অগ্নিদহনে অমরনাথ নিজেকে দগ্ধ করে পরিশুদ্ধ করতে চেয়েছেন, নিজের বেদনাকে নিজেরই করে রাখতে চেয়েছেন। তাই সেই বহ্নিজ্বালা অন্যকে স্পর্শ করেনি, অন্যেরা দেখেছে শুধু সেই অগ্নিসঞ্জাত দীপ্তি।

তাই দেখি, অমরনাথ চিত্তের সমস্ত দ্বিধা-দ্বন্দ্বকে চাপা দিয়ে শচীন্দ্রের কাছে খুব স্থিরভাবে রজনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তাঁর প্রতি শচীন্দ্রের সমস্ত বিরূপতাকে দূর করে সমস্ত ত্রুটি নিজে মাথা পেতে নিয়ে রজনী-শচীন্দ্রের মিলনের পথ নিষ্কণ্টক করেছেন।

লবঙ্গলতার সঙ্গে সেই একদিনের কাহিনী যে অমরনাথকে ঘরছাড়া করেছিলো,

দেশে দেশে ঘুরে যে অমরনাথ চিত্তের অস্থিরতাকে দূর করতে চেয়েছিলেন, ঘটনাচক্রে রজনী-জীবনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন করে সংসার-জীবন শুরুর যে স্বপ্ন তিনি দেখলেন—তাও যে ব্যর্থ হয়ে গেল! তাই রজনী-শচীন্দ্রের মিলন ঘটিয়ে অমরনাথ "ভবের হাট" থেকে "দোকানপাট" উঠিয়ে নিতে চাইলেন। রজনী-কাহিনীর সূত্র ধরে যে লবঙ্গলতা আবার তাঁর জীবনে দেখা দিয়েছিল, এবার তার সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার করে অমরনাথ সংসার থেকে বিদায় নিতে চেয়েছেন। কারুর প্রতি কোন ক্ষোভ নিয়ে নয়, কারুর প্রতি কোন অভিযোগ নেই বলেই নিজের বেদনাদীর্ণ চিত্ত নিয়ে অমরনাথ লবঙ্গলতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। জীবনে সব থেকেও যে কিছুই পেলো না—বিদায়ের আগে অমরনাথ শুধু একটু স্নেহ, একটু ভালবাসা কামনা করেছেন। কলকাতা ত্যাগের পূর্বে অমরনাথ তাই লবঙ্গের সঙ্গে শেষ সাক্ষাৎকার করতে গেলেন—"তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।" লবঙ্গের সঙ্গে কথাবার্তায় অমরনাথ জানলেন তাঁর এই আত্মসংযমের কথা লবঙ্গলতা জানে। তাঁর এই মহত্ত্বে লবঙ্গলতা মুগ্ধ, বিচলিত। মুহূর্তের অনবধানতায় লবঙ্গলতা অমরনাথ সম্পর্কে যে দুর্বলতা অন্তরের অন্তস্তলে গোপনে লালন করছিল তা সমস্ত সংযমের ও সামাজিক আচরণের রীতি লঙ্ঘন করে প্রকাশ পেলো। এই দুর্বল মুহূর্তে লবঙ্গলতা তার বালিকা বয়সের কর্মের জন্য অমরনাথের কাছে মার্জনা ভিক্ষা চাইল। এতে স্বভাবতই অমরনাথও বিচলিত হয়ে পড়লেন। যে লবঙ্গের স্মৃতি অমরনাথকে সংসার সম্পর্কে উদাসীন করেছিলো, বিদায়ের কালে সেই লবঙ্গের কাছে অমরনাথ তাঁর হৃদয়ে একটু স্থান চেয়েছিলেন। মুখে প্রত্যাখ্যান করলেও লবঙ্গ তার অন্তরের বেদনাকে গোপন করে রাখতে পারেনি।

এদিকে অমরনাথ তাঁর ভূসম্পত্তি সমস্ত কিছু রজনীর ভাবী স্বামীর নামে দানপত্র করে গেলেন এবং সেই দানপত্রটি দিয়ে গেলেন লবঙ্গের হাতে। রজনীর জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র করে যে অমরনাথ সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এরপর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন করে নিরাসক্ত অমরনাথ দেশত্যাগী হয়ে কাশ্মীর যাত্রা করলেন।

আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে, অমরনাথ-চরিত্র লবঙ্গ-শচীন্দ্র-রজনীর সঙ্গে আকস্মিকভাবে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং কাহিনীর উত্থান-পতনের দ্বারা এই তিনজনের জীবনকে তোলপাড় করে দিয়ে আবার কাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছেন বটে, কিন্তু অমরনাথ কাহিনী নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। কাহিনীর দিক্ নির্ণয় ও নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা সম্পূর্ণ অমরনাথের আয়ত্তের মধ্যে। যে জীবন সম্পর্কে অমরনাথ উদাসীন হয়ে উঠেছিলেন, জীবনে চরম আঘাত পেয়ে তাঁর অবচেতন মনের বাসনাকে সম্পূর্ণভাবে জয় করতে চেয়েছিলেন, অকস্মাৎ রজনীর অপূর্ব স্বাভাবিক সৌন্দর্য তাঁর

চিত্তে নতুন করে রূপমোহজাত প্রেমাকাঙ্ক্ষা সঞ্চারিত করেছে। সুন্দরের প্রতি তাঁর কামনা চরিত্রগত। রজনীকে কেন্দ্র করে সেই সুন্দরকে পেতে চেয়েছিলেন অমরনাথ। কিন্তু রজনীকে কেন্দ্র করে সেই জীবন লাভের আশ্বাসে চঞ্চল হ'লেও অমরনাথ সংযম হারাননি। আত্মিকশক্তি তাঁর রূপমোহজাত প্রেমের মহিমাকে উজ্জ্বল করে তুলেছে।

অমরনাথ জীবনবিবাগী কোনও সন্ন্যাসী নন—যদিও নিজেকে তিনি সন্ন্যাসী বলে উল্লেখ করেছেন। জীবনের আঘাত ও অভিজ্ঞতা তাঁকে সংসার তথা জীবন সম্পর্কে উদাসীন করে তুলেছিল। কর্মহীনতার গ্লানিকে কাটিয়ে উঠতে অমরনাথ কর্মের সন্ধান করতে চেয়েছেন। অধ্যাত্ম চিন্তায় বা ধ্যানে জীবন কাটানোর মতো চরিত্র তাঁর নয়, কর্মযোগী অমরনাথ কর্মের মধ্যে তাঁর ব্যক্তিগত আশা-আকাঙ্ক্ষাকে চাপা দিয়ে ভুলে থাকতে চেয়েছেন। তাই জীবনকে অমরনাথ যখন অসার বলেছেন, তখন তা সাময়িক মানসিক বিকৃতি মাত্র। জীবনকে সত্যসত্যই অর্থহীন মনে করে বৈরাগী হ'লে আবার সংসারের কর্মের মধ্যে অমরনাথ ফিরে আসতেন না। লবঙ্গলতার কাছ থেকে আঘাত পেয়ে "মনের দুঃখে বনে যাওয়া" গোছের মানসিকতা কাজ করেছে বলেই কর্মের নেশায় রজনীকে উদ্ধার ও রজনী-জীবনের রহস্য ও সম্পত্তি উদ্ধারের কাজে অমরনাথ মেতে উঠেছেন। শেষে রজনীর রূপে আকৃষ্ট হয়ে আবার ঘর বাঁধতে চেয়েছেন। তবে স্বার্থপর নন বলে, আদর্শবাদী মানসিকতা ছিল বলে সহজেই রজনীর প্রতি আকর্ষণকে জয় করে অমরনাথ আবার সংসার ত্যাগ করেছেন। তাই যাঁরা অমরনাথকে অস্বাভাবিক ও জিতেন্দ্রিয় ত্যাগী মহাপুরুষ চরিত্র বলে মনে করেন, তাঁরা অমরনাথ-চরিত্রকে সম্যক উপলব্ধি করতে পারেননি। অমরনাথ জিতেন্দ্রিয় নন, সংযমী পুরুষ; মহাপুরুষ নন, রক্তমাংসের সজীব মানুষ—যিনি দুঃখে কাতর হন, স্মৃতির বেদনায় ভেঙে পড়েন, রূপমোহে চঞ্চল হন, ঘর বাঁধাবার স্বপ্নও দেখেন। তবে তিনি স্বার্থপরের মতো শুধু নিজের কথাই ভাবেননি—লাভক্ষতি টানাটানি, অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ কলহ সংশয় নিয়ে জীবনকে ধূমাঙ্কিত কালিতে ম্লান করেননি। তাই জীবনের প্রতি অভিমান বশে শুধু রজনীর প্রতি আকর্ষণকেই তিনি সংযত করেননি, তাঁর সমস্ত সম্পত্তিও দান করে গেছেন রজনীর ভাবী স্বামীকে। অর্থের প্রতি, জাগতিক সম্পদের প্রতি কোনও আকর্ষণ ছিল না। জীবনে তিনি সুখী হতে চেয়েছিলেন—কাউকে বঞ্চিত করে নয়, নিজের যোগ্যতায় প্রাপ্যটুকু পেতে। তাই শশাঙ্কবাবু যথার্থই বলেছেন—"‥ ক্ষুদ্র সুখের আশায় সে বহু সন্ধান করিয়াছে, কিন্তু সুখ পায় নাই।…অবশেষে সেই বৃহত্তর জীবনের ডাকই আসিয়া তাহার কানে

বাজিল।...জীবনের সুখদুঃখ প্রেমবিরহকে অস্বীকার না করিয়াও তাহার সীমাবদ্ধ গণ্ডি হইতে বাহির হইয়া জীবনের সার্থকতা লাভের জন্য সে পা বাড়াইয়াছে।..."

বঙ্কিমচন্দ্র "রজনী" উপন্যাসে যে নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করতে চেয়েছেন, অমরনাথ-চরিত্রের মাধ্যমে তা খানিকটা সাধিত হয়েছে। সত্যকার প্রেমের মহিমা প্রিয়জনকে শুধু কাছেই টানে না, অনেক সময়ে দূরেও ঠেলে দেয়। রজনীর প্রতি অমরনাথের যে রূপমোহসঞ্জাত আকর্ষণ পরে প্রেমে রূপান্তরিত হয়েছিল, সেই প্রেমবোধই রজনীর মনোবাসনা চরিতার্থ করতে নিজের মনের মধ্যে সমস্ত বেদনাকে দহন করে সংসার থেকে নিজেকে সরিয়ে নিল। এই ত্যাগ শচীন্দ্র-রজনী মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছে। প্রেমেরই এই মহিমায় শচীন্দ্র-রজনীর প্রেমজীবন যে আলোকিত ও সম্পূর্ণ, সেই সার্থকতার পশ্চাতে যে অমরনাথ—এই কৃতজ্ঞতাটুকু চিহ্নিত করে রাখবার বাসনায় তাদের বংশধরের নামকরণ করেছে—"অমরপ্রসাদ"। প্রেমের স্বরূপ রজনী-শচীন্দ্রের জীবনকে সার্থক করলেও অমরনাথকে দুঃখ দিয়েছে, আবার আত্মসংযমে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর এই ঔদাসীন্য সংযমের প্রকাশ, সংসার-বৈরাগী চিত্তের প্রকাশ নয়। লবঙ্গলতা অমরনাথের সত্যস্বরূপের পরিচয় পায়নি বলে মনে করেছে, রজনীর সম্পত্তির লোভে অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করতে চান। নিজের স্বার্থকেন্দ্রিক মানসিকতা নিয়ে লবঙ্গ অমরনাথকে বিচার করে তাঁর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য কোমর বেঁধেছে। কিন্তু যখন মরনাথের সত্যকার পরিচয় পেয়েছে, তখন লবঙ্গ একেবারে ভেঙে পড়ে অমরনাথের পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে চোখের জলে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এর পরেই লবঙ্গলতার অবচেতন মনের সত্যস্বরূপ—যাকে সে এতদিন অত্যন্ত গোপনে লালন করেছে, আবেগের প্রচণ্ড ধাক্কায় তা সমস্ত গোপনীয়তার আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। উপন্যাসের পরিচ্ছেদ আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা তাই বলেছি, "অমরনাথ লবঙ্গের পারস্পরিক দুর্বলতা সমস্ত আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। অমরনাথ সংসার সম্পর্কে পুনরায় উদাসীন হয়ে উঠেছেন এবং সংসারের সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আবার সন্ন্যাস জীবনে ব্রতী হয়েছেন। অমরনাথের এই আচরণ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমস্ত কিছু ত্যাগ করে চলে যাবার আগে তিনি শুধু রজনীর স্বত্ব শচীন্দ্রকে দিয়ে যাননি, সেই সঙ্গে জাগতিক সম্পদ সমস্তই রজনীর স্বামীকে দানপত্র করে দিয়ে গেছেন। এবং সেই দানপত্রটি দিয়ে গেছেন তিনি লবঙ্গলতার হাতে। অমরনাথের এই মহত্ত্বে লবঙ্গলতা নিজের হৃদয়কে আর গোপন রাখতে পারেনি। শুধু তাই নয়, লবঙ্গ অমরনাথের প্রতি প্রশংসাবাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে নিজের দীনতার জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে নিয়েছে, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি স্পষ্টভাবে

দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। ধর্মানুসরণ ও সতীত্বের দোহাই দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যতই লবঙ্গলতার মুখে জবাবদিহি বসান না কেন, লবঙ্গলতা তার অবচেতন মনের সত্যকে আর গোপন রাখতে পারেনি। তাই লবঙ্গ অমরনাথের যাত্রা স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে আবেগময় কণ্ঠে বলেছে, "তুমি আমার কে? তাতো জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও, কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না…আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" লবঙ্গ-চিত্তের এই উন্মোচনে পরমুহূর্তেই লবঙ্গ নিজেকে সামলে নেবার চেষ্টা করে এবং নীতিবাদের দোহাই দিয়ে নিজেকে সামলে নিলেও—"কিন্তু দেখিলাম লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।" অমরনাথ সর্বস্ব ত্যাগ করে যাবার আগে এইটুকুই সান্ত্বনা প্রত্যাশা করেছিলেন। এই তৃপ্তিটুকু নিয়ে অমরনাথ এই পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। তাই তিনি মন্তব্য করলেন "দোকানপাট উঠিল।"

অমরনাথের আত্মত্যাগের ফলেই যে শচীন্দ্র-রজনীর মিলন, তাদের সন্তান লাভ, রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটি সুখী দম্পতির পরিচয় পেয়ে অমরনাথ কাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছেন। শচীন্দ্র-রজনী পরস্পর সুখী। লবঙ্গ হয়ত বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে তার দিন কাটিয়ে দেবে, কিন্তু অমরনাথ? জীবনে যে সব পেয়েও সব হারাল—সম্পদ, সংসার সবকিছু আয়ত্তের মধ্যে থেকেও যে কিছুই ভোগ করল না, সংসারের মধ্যে থেকেও যে সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য নিয়ে জীবন কাটাতে চাইল, বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে অমর করে রাখলেন রজনীর সন্তানের নামের মধ্যে। যে অমরের প্রসাদে আজ রজনী-শচীন্দ্রের মিলন, সেই মিলনের ফলই তো অমরপ্রসাদ। শচীন্দ্র-রজনী কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন ঠিক, কিন্তু লেখক স্বয়ং! যৌবনের উন্মাদনায়, মুহূর্তের ভুলে যে কলঙ্কের রেখা অমরনাথকে লাঞ্ছিত করল, সেই বোঝা জীবনব্যাপী বয়ে চললেন অমরনাথ। আর তাঁর এই বৈরাগ্যের পুরস্কার হিসাবে তিনি পেলেন শচীন্দ্র-রজনীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা। আর লবঙ্গ যে তাকে এখনো ভোলেনি, সেই সান্ত্বনা। জীবন-সংগ্রামে বারবার জয়ী হতে গিয়েও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় লাঞ্ছিত অমরনাথ। বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথের হাতে তুলে দিলেন ঐটুকু সান্ত্বনা পুরস্কার।"

শচীন্দ্রনাথ

শচীন্দ্রনাথ রামসদয় মিত্রের কনিষ্ঠ পুত্র এবং বিমাতা লবঙ্গলতার স্নেহের পাত্র। নিঃসন্তান লবঙ্গলতা শচীন্দ্রনাথকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই স্নেহের আতিশয্য স্বাভাবিকতার মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। হয়তো সেই কারণেই শচীন্দ্রনাথ যে

পরিমাণে বিদ্যাশিক্ষা অর্জন করেছিল, সে পরিমাণে তার ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। শচীন্দ্রনাথ সুপুরুষ এবং সুকণ্ঠধারী। তবে ব্যক্তিত্বহীনতা তার পৌরুষের মহিমাকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিয়েছে এবং তার আচরণের মধ্যে এই সত্যটিই বার বার প্রকাশ পেয়েছে।

শচীন্দ্র-চরিত্রের যা কিছু গৌরব তা রজনী-চিত্তে প্রেমের জাগরণ ঘটানোর জন্য। শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে রজনীর জীবনে প্রেমের যে সঞ্চার, সেই অনুচ্চারিত প্রেম রজনীকে দগ্ধ করলেও শচীন্দ্রের চিত্তে পুরুষোচিত কোনো প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। রজনীর রূপে শচীন্দ্র মুগ্ধ হলেও লবঙ্গলতার মুখে রজনীর পরিচয় ফুলওয়ালী শুনে তার চিত্ত প্রতিক্রিয়াহীন। নর-নারীর আকর্ষণ-বিকর্ষণের যে বিচিত্র লীলা সাহিত্যে যুগ যুগ ধরে বন্দিত, শচীন্দ্রের অন্ততঃ বঙ্কিম-সাহিত্যে এ ধরনের আচরণ ব্যতিক্রম বলা চলে।

শচীন্দ্রনাথ চিকিৎসাশাস্ত্রে কতদূর পারদর্শী আমরা জানি না, তবে মনস্তত্ত্বের অ-আ-ক-খ সম্বন্ধে যে সে নিতান্ত শিশু, এ ধারণা অস্পষ্ট থাকে না। কারণ, রজনীর সঙ্গে তার প্রথম সাক্ষাৎকার ও আচরণে এই সত্যই প্রমাণিত হয়। শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে এবং তার ক্ষণিক স্পর্শে অন্ধ যুবতীর চিত্তে যে বিহ্বলতা দেখা দেয়, প্রেমের প্রথম আবির্ভাবে অন্ধ যুবতীর চিত্ত বিমথিত করে শচীন্দ্রের প্রতি যে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করে, শব্দ ও স্পর্শানুভূতি রজনী-চিত্তকে যেভাবে আকুল করে তোলে; তার বিন্দুমাত্র প্রভাব শচীন্দ্র-চিত্তকে স্পর্শ করে না।

এদিকে, রজনী সম্পর্কে সে যে নিরাসক্ত এমনও মনে করার কারণ নেই। কারণ রজনীর সৌন্দর্য বর্ণনায় যে আবেগ প্রকাশ পেয়েছে, তা নির্লিপ্ততার নয়—"রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের যে মোহিনী গতি নাই···কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই·· নাই কি?" এই শেষ জিজ্ঞাসাটুকুর মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে শচীন্দ্রের অবচেতন মনের সত্যটি গোপন থাকে না। শচীন্দ্রের সচেতন মনের বিদ্যাবুদ্ধির অহংকার নিয়ে সে, তার মনের গভীরের সত্যকে অস্বীকার করতে চেয়েছে। তার এই চিকিৎসা বিদ্যার দম্ভ নিয়ে সে রজনীর চক্ষু পরীক্ষা করে মতামত জানিয়েছে বটে, কিন্তু তার হৃদয়ানুভূতি দিয়ে অন্ধ নারীর রোমাঞ্চিত দেহের পুলকের উষ্ণতা অনুভব করতে পারেনি।

শচীন্দ্র রজনীর অন্যত্র বিবাহ দেবার ব্যাপারে উদ্যোগী হয়েছে লবঙ্গলতার নির্দেশে। এবং রজনী যখন হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে, তখন ভেবেছে রজনী অন্যের

প্রতি প্রণয়াসক্ত। এদিকে রজনীর অপাপবিদ্ধ সারল্যে তার রূপের কমনীয়তায় শচীন্দ্র তার প্রতি মমত্ব বোধ করেছে। কারণ, আমরা দেখেছি রজনীকে কাঁদতে দেখে সে তার হাত ধরে লবঙ্গলতার কাছে নিয়ে গেছে এবং অভিযোগ করেছে যে, কেন রজনীকে লবঙ্গ ভৎ´সনা করেছে। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে, রজনীর প্রতি এই স্নেহাতিশয্য কি নিতান্তই ইন্দ্রিয়মুক্ত? জৈবআকর্ষণের ক্ষীণ পদধ্বনিও কি এখানে অনুচ্চারিত? পরবর্তী ঘটনাবলী প্রমাণ করে শচীন্দ্রের অবচেতন মনে রজনীর প্রতি দুর্বলতা জেগেছিল। রজনীর সামাজিক পরিচিতি যতদিন অজ্ঞাত ছিল, ততদিন শচীন্দ্রের এই মানসিকতা। কিন্তু যখনই রজনীর সত্য পরিচয় শচীন্দ্র জেনেছে এবং যখন বুঝেছে তার এই সম্পত্তির সত্যকার মালিক রজনী, তখন শচীন্দ্র শুধু বিহ্বল হয়ে পড়েনি, রজনীর প্রতি ধীরে ধীরে তার অবচেতন মনের উদ্‌ঘাটন আমরা লক্ষ্য করেছি।

নিজের সামাজিক দম্ভ ও মর্যাদাকে শচীন্দ্র সম্পূর্ণ ত্যাগ করতে পারেনি, তাই রজনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব নিয়ে যখন রামসদয় বা লবঙ্গ তাকে অনুরোধ করেছে অকস্মাৎ তার যেন পৌরুষ জেগে উঠেছে। এই অবস্থায় বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসীর সাহায্য নিয়ে অলৌকিক উপায়ে শচীন্দ্রের অবচেতন মনের প্রতিফলন ঘটিয়ে শচীন্দ্রের চরিত্রকে শুধু অকিঞ্চিৎকর করেননি, তার পুরুষোচিত সমস্ত মহিমা ধুলায় লুন্ঠিত। সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রক্রিয়া, স্বপ্নে রজনীকে দর্শন আসলে রূপকধর্মী। তা শচীন্দ্রের অবচেতন মনের আকস্মিক বহিঃপ্রকাশ মাত্র।

ব্যক্তিত্বহীন শচীন্দ্র-চরিত্রে একবারই সামান্য দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে, যখন সে সম্পত্তির লোভে রজনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। কিন্তু সন্ন্যাসীর সাহায্যে তার অবচেতন মনের সত্যকে যখন সে উপলব্ধি করেছে, তখন অকস্মাৎ রজনীকে পাওয়ার নেশায় মেতে ওঠা এবং তার ফলে চিত্তবিকারে অসুস্থ হয়ে পড়া মোটেই তার প্রেমের মহিমাকে বাড়ায়নি। শুধু তাই নয়, তার মধ্যে মুহূর্তের জন্য যেটুকু পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছিল (সম্পত্তির জন্য রজনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে), লবঙ্গলতার নির্দেশে তার পৌরুষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় এবং সে রজনীকে বিবাহ করতে রাজী হয়।

এইভাবে প্রকারান্তরে লবঙ্গের ধমক খেয়ে যেন তার চিত্তবৃত্তির জাগরণ ঘটল। এবং যেটুকু দ্বিধা নিতান্ত সামাজিকতার খাতিরে ছিল, সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবে সেটুকু এমনভাবে ভেসে গেল যে, শেষ পর্যন্ত শচীন্দ্র রজনীর প্রেমে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ল। এই কৃত্রিম উপায়ে হৃদয়ের জাগরণ ঘটানো কতখানি স্বাভাবিক এ প্রশ্ন

আমাদের মনে থাকবেই। অর্থাৎ হৃদয়যন্ত্র স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় সচল না থাকলে, কৃত্রিম উপায়ে তাকে চালনা করলে সেই সচলতাকে কেউই স্বাভাবিক বলবেন না। তাই শচীন্দ্র ক্রমে যেন লবঙ্গের হাতে খেলার পুতুল হয়ে উঠল এবং দক্ষ বাজীকর যেভাবে পুতুলকে নাচায় নিজের ইচ্ছামত, লবঙ্গ সেইভাবেই শচীন্দ্রকে চালিয়েছে। শচীন্দ্র যেন একটি প্রতীক পুরুষ, যার সাহায্যে রজনী-চিত্তে প্রেমের আবেগ প্রকাশ পেয়ে এই অন্ধ নারীর জীবনকে জাগিয়েছে।

"ধীরে, রজনী ধীরে" শচীন্দ্রের এই উক্তি এবং বারবার তার পুনরাবৃত্তি তার বিকারগ্রস্ত চিত্তে প্রকাশ ঘটালেও প্রেমের মহিমা প্রকাশ করেনি। শচীন্দ্রের চরিত্রে তাই প্রেমের কোনো দ্বন্দ্ব নেই। যখন সে রজনীকে চায়নি, তখনও যেমন তার চিত্ত নির্দ্বন্দ্ব, আবার যখন রজনীকে চেয়েছে, তখন সে বিকারগ্রস্ত অবস্থায় এবং যখন পেয়েছে তখন যেন সহজলভ্য বস্তুর মত তার পরিসমাপ্তি ঘটেছে। অর্থ, সুন্দরী স্ত্রী এবং পুত্র সন্তানের মধ্যে একটি সুখী সংসারের অধিকারী শচীন্দ্র যেন রূপকথার গল্পের পরিসমাপ্তি অর্থাৎ এরপর "রাজা ও রাণী সুখে ঘরকন্না করতে লাগল।"

তাই বলছিলাম শচীন্দ্র যেন গল্পের অনুরোধে রজনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। নরনারীর মধ্যে প্রেমের যে অঙ্কুরোদ্‌গম এবং পারস্পরিক আকর্ষণের জলসিঞ্চনে তা যেমন ধীরে ধীরে বর্ণবৈচিত্র্যে বিকশিত হয়ে ওঠে, প্রেমের সেই স্বাভাবিক লীলারহস্য এখানে অনুপস্থিত। রজনীকে বিবাহ করার যে মানসিকতা শচীন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার পশ্চাতে যে কারণটি সক্রিয় তার দ্বারা প্রেমের মহিমা লাঞ্ছিত। তাই যে পাত্রকে কেন্দ্র করে রজনীর চিত্তের এই জাগরণ, তার সম্পর্কে রজনী যেমন বিস্তারিত পরিচয় দেয়নি, লেখকও তেমনি শচীন্দ্রের বক্তব্য বিবৃত করতে গিয়েও তার সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানাননি। এ ধরনের নিষ্ক্রিয় পুরুষ-চরিত্র বঙ্কিম-সাহিত্যে বিরল।

শচীন্দ্র রজনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারত, আমাদের আপত্তি শচীন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তায়। এর দ্বারা শচীন্দ্রের প্রেমের মহিমাও লাঞ্ছিত। এই স্বার্থমগ্ন প্রেম প্রেমের ব্যভিচার। শচীন্দ্র যেভাবে তার চিত্তবিকার বিবৃত করেছে তাতে মনে হয় শচীন্দ্রের চিত্ত চেতন ও অবচেতনের মধ্যে দোলায়িত। তাই তার অবচেতন মনে যে রজনীর রূপ সে সচেতন মন দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতে চেয়েছিল, সচেতন মনের সাময়িক বিভ্রান্তির জন্য হয়তো বা অলৌকিকতার দ্বারা সচেতন মনের পর্দা অপসারিত হওয়ার ফলে অবচেতন মনে রজনীর রূপ ধীরে ধীরে তার সমগ্র সত্তাকে মোহগ্রস্ত করে তুলল। ধীরে ধীরে রজনী শচীন্দ্রের সচেতন মনেও প্রভাব বিস্তার করেছে। তাই শচীন্দ্র

বলেছে, "দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর। দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে। কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।"

শচীন্দ্র-চিত্তের এই জাগরণের পর অমরনাথ-শচীন্দ্রের কথাবার্তার মধ্য দিয়ে আমরা প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি করি শচীন্দ্র রজনীর প্রতি সত্যই আসক্ত। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী বলেছেন—"রজনী শচীন্দ্রকে না-পাওয়ার দুঃখে ডুবে মরতে গিয়েছিল, আবার তাকে পাওয়ার আশাতেই মরতে পারেনি। আর রজনীর অন্ধত্বের অনুরোধে শচীন্দ্র অন্ধ হতে ইচ্ছা করেছে" কিংবা "রজনী, এ অন্ধ নয়ন উন্মীলিত কর।" এই তো প্রেমের চরম লক্ষণ। দুজনের একাত্ম হওয়ার আকাঙ্ক্ষা। শচীন্দ্রের জগৎ এখন রজনীময়। কিন্তু একি। কেন, রজনী, এত জ্বালা কেন? দাহ কেন? "হায় রজনী! পাথরে এত আগুন।"...আগে পাথরে আগুন ছিল না, পাথর তুষারবৎ শীতল ছিল। তারপরে একদা প্রেমের স্পর্শে আগুন জ্বলল।...ক্রমে এই আগুনে, এই তাপে তুমিও রজনী গলে গিয়ে একীভূত হবে...এই আগুনেরই নামান্তর প্রেম। রজনী...সুন্দর হয়ে উঠল শচীন্দ্রের চোখের গুণে, সেই গুণটি প্রেমের উপাদান।...দ্রষ্টা যখন দৃশ্য বস্তুতে সৌন্দর্য দেখে, তখন বুঝতে হবে যে প্রেমের আগুন জ্বলেছে।"

শচীন্দ্রনাথ ও রজনীর মধ্যে যে প্রেম সঞ্চারিত, তা সম্পূর্ণ সমাজ অনুমোদিত। সেদিক দিয়ে এই প্রেমের মহিমা বঙ্কিমচন্দ্রের নৈতিকতা প্রমাণের কোনো অন্তরায় সৃষ্টি করেনি। আমাদের সেক্ষেত্রে বলবার কিছু নেই। আমাদের আপত্তি শচীন্দ্রের প্রেমসত্তাকে জাগরিত করবার জন্য বঙ্কিমচন্দ্র অলৌকিকতা ও সন্ন্যাসীর সাহায্য নিলেন কেন? সন্ন্যাসীর দৈববলের সাহায্যে শচীন্দ্র জেনেছে, রজনী তার প্রতি আসক্ত এবং সেই অলৌকিক শক্তির দ্বারাই শচীন্দ্রনাথকে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট করা হয়েছে। এভাবে বাইরের চাপ সৃষ্টি করে সংসারের যে কার্যই উদ্ধার হোক, প্রেমের সত্যকার মহিমা তাতে ক্ষুণ্ণই হয়। এ যেন মনে হয় কাহিনীর প্রয়োজনে শচীন্দ্রকে রজনীর প্রতি অনুরক্ত করা হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছি রজনীর রূপ বর্ণনায় শচীন্দ্রের চিত্তে মোহ সৃষ্টির ইঙ্গিত বা তার উক্তি "যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি তাহাকে বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে" ইত্যাদি ছোটখাট অস্পষ্ট ইঙ্গিতের মধ্য দিয়ে শচীন্দ্র-চিত্তে রজনীর প্রতি প্রেমের যে সূক্ষ্ম ইঙ্গিতটুকু বঙ্কিমচন্দ্র দেখিয়েছেন, সেই মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণই রজনী-শচীন্দ্রের প্রেমস্বরূপের কাছে বাঞ্ছনীয় ছিল।

শুধু বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রের চিত্ত-বিকারের বর্ণনার মধ্যে "রজনীর প্রতি প্রেম কিরূপে বদ্ধমূল হইল তাহার একটি সুন্দর উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা বঙ্কিম শচীন্দ্রের মুখে দিয়াছেন এবং

এই পরিবর্তনের যতটুকু মনস্তত্ত্বমূলক ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব, তাহা…সন্ন্যাসীর নিকট পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য ইহা ঠিক যে শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিতেছে। বাস্তব জগতের বিশ্লেষণ প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটি অপরিহার্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে।" (ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়)।

অপ্রধান চরিত্র :—অপ্রধান চরিত্রগুলির মধ্যে আমরা প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি **হীরালাল** চরিত্রটির। রজনীর সঙ্গে লবঙ্গ যার বিবাহ দেওয়ার কথা ঠিক করেছিল, সেই গোপালের স্ত্রী চাঁপাসুন্দরীর ভাই এই হীরালাল। হীরালালের পরিচিতি প্রসঙ্গে রজনী জানিয়েছে, "হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল।…হীরালাল মদ খায়, তাহাও অল্পমাত্রায় নহে। শুনিয়াছি গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই। কোনো প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র। তথাপি রামসদয়বাবু তাহাকে কোথায় কেরানীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরিটি গেল।…কোনো গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাস্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে একখানা খবরের কাগজ করিল। দিনকতক তাহাতে কতক লাভ হইল।…কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশ টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া গাপোশ হইল। কিছুদিন পরে হীরালাল আবার ভাসিয়া উঠিয়া ছোটবাবুর মোসায়েবী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোটবাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা-আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানাও বিক্রয় হইল না।"

এ হেন হীরালালকে দিয়ে চাঁপা রজনীর সঙ্গে তার স্বামীর বিবাহ বন্ধে নিযুক্ত হোল। কারণ, হীরালাল শেষ পর্যন্ত সব কিছু ছেড়ে চাঁপাদিদির আঁচল ধরে বসে রইলো।

বঙ্কিম জীবনীকার শচীন্দ্রের মতে, হীরালাল চরিত্রটি তৎকালীন এক সংবাদপত্র সম্পাদকের ছায়া অবলম্বনে রচিত। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কালীপ্রসন্ন ঘোষকে বলেন, ব্যক্তিবিশেষ কোনো সম্পাদককে তিনি আক্রমণ করেননি। সেই সময়কার অনেক সম্পাদকের সাধারণ চরিত্র বৈশিষ্ট্যই এতে প্রকাশ পেয়েছে।

হীরালালকে টাকা দিয়ে চাঁপা এই বিবাহ বন্ধ করার কাজে নিযুক্ত করলো। কারণ চাঁপা জানলো, "যেই কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে।" হীরালাল যখন রজনীদের বাড়িতে গেল তার বাবার সঙ্গে দেখা করতে, অন্ধ রজনী তার কণ্ঠস্বর

শুনে হীরালাল-চরিত্র সম্পর্কে সম্যক্ অবহিত হলো—"হীরালালের কি কর্কশ, কদর্য স্বর।" হীরালাল রজনীর পিতার কাছে প্রস্তাব করলো যে, সে রজনীকে বিয়ে করতে রাজী। কারণ তার বক্তব্য, সতীনের উপর কেন মেয়ে দেবে। এই বলে হীরালাল তার বিদ্যা জাহির করবার জন্য নিজের যোগ্যতার বর্ণনা দিল—এখন বয়স্থা মেয়ে তো লোকে চায়। আমি যখন ··এডিটর ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকল লিখেছি। পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্য বিবাহ! ছি ছি।...এস, আমাকে দেশের উন্নতির একস্‌জ্যামপেল সেট করিতে দাও, আমি এ মেয়ে বিবাহ করিব।" রজনীর সরল পিতা হীরালালের কথাবার্তায় স্বভাবতই একটু বিচলিত হলেন। কিন্তু পরমুহূর্তেই লম্পট-চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশ হয়ে পড়ল। শচীন্দ্ররা যে গোপালের সঙ্গে তার বিবাহ স্থির করেছে, সে সম্পর্কে হীরালাল অশালীন মন্তব্য করলো। যা রজনীর কানে পৌঁছুলো না বটে, কিন্তু পরে যখন সে মদের সন্ধান করলো, তখনই তার স্বরূপ আর গোপন রইলো না।

কাহিনীর সূত্রপাতে হীরালাল সম্পর্কে এই পরিচিতি দিলেও পরে রজনী জানিয়েছে যে, "হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না।" এই হীরালালের সহযোগিতায় রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে সকলের অজ্ঞাতে রজনী গৃহত্যাগ করেছে। চাঁপা সতীন সম্ভাবনার সমস্ত পথ বন্ধ করতে বদ্ধপরিকর। তাই ভালমন্দ কিছু না ভেবেই সে হীরালালের সঙ্গে রজনীকে গোপনে পাঠিয়ে দিয়েছে। আর রজনীও আপত্তি করেনি, কেননা তখন তার মানসিক বিপর্যয় এমনই যে, যে-কোনও উপায়ে বিবাহের এই সম্ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চায়। ঈশ্বরের করুণার উপর ভরসা করে রজনী অন্ধকার রাস্তায় বের হল। অকস্মাৎ আত্মবিশ্বাসে বলবতী হয়ে উঠলো সরলা রজনী। সলজ্জ, সঙ্কুচিতা, ব্রীড়াবনতা রজনীর চিত্তে দৃঢ়তা জেগে উঠলো। হীরালাল যে অসৎ, সে যেন তার অন্ধ অনুভূতির সাহায্যে তা টের পেয়েছে। তাই অকস্মাৎ সে বলেছে—"হীরালালবাবু, আপনার গায়ে জোর কেমন ?···তোমার হাতে কিসের লাঠি ? আমার হাতে দাও দেখি। আমি তাহা ভাঙিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া আধখানা আপনি রাখিলাম।" হীরালাল রাগ করাতে রজনী স্পষ্টই বললো, "তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না। হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।"

রজনী-চরিত্রের এই দৃঢ়তার পরিচয় পেয়ে অসৎ-প্রকৃতির হীরালাল নিজেকে খানিকটা সংযত করতে চেষ্টা করেছে।

নির্জনতার সুযোগ নিয়ে হীরালাল রজনীকে বিবাহের প্রস্তাব দিল। বঙ্কিমচন্দ্র ব্যঙ্গচ্ছলে হীরালালকে চিত্রিত করলেও, তার আচরণ ও কথাবার্তা নিয়ে ব্যঙ্গ করলেও হীরালালের অসৎপ্রকৃতি ও আচরণ পাঠকের ঘৃণা ও ক্রোধের উদ্রেক করে।

নিজের যোগ্যতা সপ্রমাণ করেও রজনীকে হীরালাল রাজী করাতে পারলো না। শেষে ক্রুদ্ধ হীরালাল নির্জন নদীর চড়ায় অন্ধ রজনীকে নামিয়ে দিয়ে অসহায়তার সুযোগ নিয়ে রজনীকে বিবাহে রাজী করাতে চাইল। কিন্তু তাতেও রজনীকে রাজী করাতে পারলো না। "শেষে রজনী তার হাতের লাঠির অর্ধাংশ নিক্ষেপ করিয়া হীরালালকে আঘাত করিল। কিন্তু হীরালাল অশ্রাব্য ভাষায় গালি দিয়া চলিয়া গেল।"

রজনীর সঙ্গে হীরালালের নিরুদ্দিষ্ট হওয়াকে কেন্দ্র করে ভবানীনগরে নানা ধরনের কথা রটতে লাগলো যে, হীরালাল রজনীকে নিয়ে পালিয়ে গেছে। কারণ রজনীর রূপে আকৃষ্ট হয়েই হীরালাল এই ধরনের আচরণ করেছে বলে শচীন্দ্র ইত্যাদির ধারণা হল। হীরালাল গ্রামে ফিরে এলো বটে, কিন্তু রজনী সম্পর্কে কোনও খবর জানে বলে স্বীকার করতে চাইল না।

হীরালাল-চরিত্র সম্পর্কে কেউ কেউ বলেন, হীরালাল 'ভিলেন' চরিত্র। কিন্তু আমাদের মনে হয়, 'ভিলেন' চরিত্র হ'তে গেলে যে ব্যক্তিত্বের দরকার, হীরালাল-চরিত্রে তার একান্ত অভাব। হীরালাল স্বভাবদুর্বৃত্ত, লম্পট, মদ্যপ। কর্মহীনতার মধ্যে সে এইভাবেই তার জীবন কাটায়। এই শ্রেণীর চরিত্র সংসারে অনেক দেখা যায়, যারা নিজেদের মহিমা নিজেরাই প্রচার করতে ব্যস্ত। তারা এক শ্রেণীর হীনম্মন্যতায় ভোগে। তাই নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করতে নানা ছলনার আশ্রয় নেয়। যোগ্যতা নেই, সততা নেই, চরিত্রবল নেই। শুধু কৌশলের দ্বারা তারা সংসারকে প্রতারিত করতে গিয়ে নিজেরাই শুধু প্রতারিত হয় ও সকলের অশ্রদ্ধা ও ঘৃণাই তাদের জীবনে একমাত্র প্রাপ্য হয়। হীরালাল সেই শ্রেণীর চরিত্রের প্রতিভূ।

হীরালাল এই কাহিনী নিয়ন্ত্রণে ও অগ্রগতিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। তার মতো মদ্যপ, লম্পট চরিত্র না হলে অন্ধ রজনীকে সেই নির্জন নদীর চড়ায় ত্যাগ করার মতো হৃদয়হীন কাজ করা সাধারণ কোনোও পুরুষের পক্ষে সম্ভব হতো না। রজনীর রূপে মুগ্ধ হয়ে সে যদি মোহগ্রস্ত হতো বা দুর্বলতা প্রকাশ করতো, তার একটা সঙ্গত ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া যেতো। কিন্তু এই শ্রেণীর চরিত্র শুধু নিজের স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু বোঝে না। হীরালালের প্রাথমিক পরিচয়টুকু দিয়ে তার চরিত্র সম্পর্কে পাঠকদের বঙ্কিমচন্দ্র অবহিত করেছেন। এই শ্রেণীর

চরিত্র অর্থের বিনিময়ে ও স্বার্থ চরিতার্থ করতে রজনীকে নিয়ে গৃহত্যাগ করেছে। এ যে চাঁপার প্রতি দরদবশত ভাইয়ের কর্তব্য করেছে, এমন কথা মনে করার কোনও কারণ নেই। রজনীকে নিয়ে গোপনে গৃহত্যাগ ও তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে পলায়ন এবং হৃদয়হীনের মতো নিজে গৃহে প্রত্যাবর্তনের মধ্যে দিয়ে হীরালাল কাহিনীতে গতি সঞ্চার করেছে। রজনীকে এইভাবে ভবানীনগরের বাইরে স্থাপন করে বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথকে কাহিনীর মধ্যে খুব স্বাভাবিকভাবে নিয়ে এসেছেন। রজনীরূপ সূত্রের সাহায্য নিয়ে অমরনাথ কাহিনীতে প্রবেশ করে সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন। সেদিক দিয়ে হীরালাল-চরিত্র কাহিনীর গতিপ্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। অপ্রধান চরিত্রের সার্থকতা সেখানেই। মূল কাহিনী বা প্রধান চরিত্রগুলি এগিয়ে যায় নিজস্ব ধারায় একথা সত্য, তবে অপ্রধান চরিত্রগুলি সেই অগ্রগতিতে অনেক সাহায্য করে। কাহিনীকে এগিয়ে দিতে সাহায্য করে প্রধান চরিত্রের বিকাশে প্রয়োজনীয় ভূমিকা গ্রহণ করে। মূল কাহিনী বা চরিত্রের অগ্রগতিতে সেই ভূমিকাটুকু পালন করেই সে কাহিনী থেকে বিদায় নেয়। এ ধরনের ভালমন্দ চরিত্র কাহিনীর বিস্তারে সাহায্য করে। বৃক্ষের শোভা শুধু মূল কাণ্ডের ওপরে দাঁড়িয়ে থাকে বটে, কিন্তু তার বৈচিত্র্য ও সৌন্দর্য পত্র-পুষ্প-ফলের মিলিত প্রকাশে। তেমনি প্রধান চরিত্র বা মূল কাহিনী অপ্রধান চরিত্রের সাহায্য ছাড়া কখনই সম্পূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পারে না।

এইসব অপ্রধান চরিত্রের কাহিনীগত সার্থকতা হচ্ছে ততখানি, যতখানি তা মূল কাহিনীর অগ্রগতিতে সাহায্য করে বা মূল চরিত্র বিকাশে অংশগ্রহণ করে।

চাঁপাসুন্দরী ঃ—গোপাল বসুর বিবাহিতা স্ত্রী চাঁপা। চাঁপাকে মুখরা বলা যেতে পারে। চাঁপা মনের দিক দিয়ে খুব দৃঢ়। তাই অন্য কোনো মেয়ে হ'লে যেখানে কান্নায় ভাসিয়ে নিজের ভাগ্যকে দোষারোপ করত, চাঁপা সেই অবস্থায় পড়ে প্রতিকারের জন্য নিজেই উদ্‌যোগী হয়েছে। তাই দেখি, যখন চাঁপা শুনেছে তার স্বামীর সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেওয়ার আয়োজন চলছে, রজনীকে সতীন হতে না দেবার জন্য সে নিজেই উদ্‌যোগী হয়েছে বিয়ে ভাঙতে। চাঁপা নিজেই রজনীর কাছে একা গেছে।

রজনী বলেছে, "চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়, তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।" চাঁপা তার লম্পট ভাই হীরালালকে এই কাজে নিযুক্ত করল। কারণ, হীরালালকে চাঁপা এই কথা বুঝিয়েছে যে, 'অন্ধ রজনীকে

যে বিবাহ করবে, সেই টাকা পাবে। কিন্তু হীরালাল এ কাজে তেমন সুবিধে করতে পারল না দেখে চাঁপা একাকী একদিন রজনীর কাছে গিয়ে উপস্থিত হল। চাঁপা অত্যন্ত কঠোর ভাষায় রজনীকে হুমকি দিল যে, তার স্বামীর সঙ্গে বিয়ে হ'লে সে তাকে বিষ খাইয়ে মারবে। চাঁপার এই উত্তেজনার জবাবে রজনী যখন কোনো উত্তেজনা প্রকাশ করল না, তখন স্বভাবতই চাঁপা একটু সংযত হল। আবার যখন শুনলো যে, এ বিবাহে রজনীরও সম্মতি নেই, তখন চাঁপা নিজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য রজনীকে লুকিয়ে রাখার বাসনা প্রকাশ করল। যখন রজনী শুনলো, চাঁপার বাপের বাড়ীতে তাকে লুকিয়ে রাখবে, তখন রজনী মনে করলো, এই বোধ হয় তার মুক্তির একমাত্র উপায়—"চাঁপা আমার সর্বনাশিনী, কুপ্রবৃত্তি, মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল। ...মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্তী কাষ্ঠ ফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল।" চাঁপা অভিসারিকার দূতীর মতো রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে নিজের বাড়ীতে রজনীকে নিয়ে এসে হীরালালের সঙ্গে তাকে সঙ্গে সঙ্গে নিরুদ্দেশের পথে ভাসিয়ে দিল।

এই শ্রেণীর আচরণের মধ্যে দিয়ে স্বার্থপর চাঁপার চরিত্র আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে। নিজের অমঙ্গল আশঙ্কায় চাঁপা যেন সমস্ত শালীনতাকে বিসর্জন দিয়ে জ্ঞাতসারেই রজনীকে হীরালালের সঙ্গে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়েছে। চাঁপার আচরণের মধ্যে নারীসুলভ কমনীয়তা প্রকাশ পায়নি বটে, কিন্তু অসহিষ্ণুতা তাকে বিবেকবর্জিত করেছে। তা না হলে অন্ধ রজনীকে সে এভাবে ভাসিয়ে দিত না। চাঁপা-চরিত্রে দুঃসাসিকতা এবং নিজের স্বার্থকে বাঁচাতে যে-কোনও ঝুঁকি নেওয়ার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তাই ঘটনাচক্রে চাঁপা আমাদের কাছে কঠোর মনোভাবাপন্ন নারী রূপেই প্রতিভাত। কিন্তু সতীন নিয়ে ঘর করার আশঙ্কাই হয়তো তাকে এতখানি বেপরোয়া করে তুলেছে।

চাঁপাসুন্দরীকে এইভাবে চিত্রিত করার সার্থকতা এই যে, এই ধরনের বেপরোয়া শক্ত প্রকৃতির মেয়ে না হলে সকলের অজান্তে অন্ধ রজনীকে গৃহ থেকে বের করে সীমাবদ্ধ পরিবেশ থেকে বাইরের বিরাট জগতের মধ্যে নিক্ষেপ করে কাহিনীর মধ্যে জটিলতা সঞ্চার করা সম্ভব হত না। চাঁপা তার স্বার্থ সিদ্ধ করবার জন্য এই ধরনের আচরণ করেছে বটে, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র তার সাহায্যে কাহিনীতে নূতন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন। এইভাবে সতীন হবার আশঙ্কায় কাতরা চাঁপা বিবাহে সমভাবেই অনিচ্ছুক রজনীকে গৃহের বাইরে এনে হীরালালের মতো পাষণ্ড চরিত্রের সাহায্যে তাকে যেভাবে বিপর্যয়ের মুখে ঠেলে দিল, সেই পথেই কাহিনীতে অমরনাথের প্রবেশ ঘটলো

এবং কাহিনীর মধ্যে জটিলতা ও দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে পরিণতি লক্ষ্য করা যায়। সেদিক দিয়ে চাঁপা-চরিত্রের সার্থকতা রয়েছে।

রামসদয় মিত্র :—তেষট্টি বছরের এক বৃদ্ধ। একজন গৃহিণী থাকা সত্বেও উনিশ বছরের যুবতী লবঙ্গলতাকে দ্বিতীয়বার বিবাহ করেছেন। লবঙ্গলতা রঙ্গরসে, কৌতুকে এই বৃদ্ধকে এমনভাবে মাতিয়ে রেখেছে যে, বাইরে থেকে মনে হতে পারে এই দম্পতি পরম সন্তোষে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু লবঙ্গলতার গর্ভে রামসদয়ের কোনো সন্তান হয়নি। তাছাড়া বয়সের এই বিরাট ব্যবধানের ফলে লবঙ্গলতা হয়তো রঙ্গরসিকতা করে নিজের অন্তর্নিহিত বেদনাকে বা জীবনের ব্যর্থতার দীর্ঘশ্বাসকে চেপে রাখতে চেয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমাদের সহজেই মনে পড়ে, শরৎচন্দ্রের 'দেবদাস' উপন্যাসের পার্বতী ও তার স্বামী ভুবন চৌধুরীর কথা। সাধারণের চোখে লবঙ্গলতাকে পতিপরায়ণা স্ত্রী বলেই মনে হতে পারে, কিন্তু লবঙ্গলতার আচরণের মধ্যে যে পরোক্ষ ব্যঙ্গ রয়েছে, রামসদয় তরুণী ভার্যাকে নিয়ে এমনই মেতে থাকতেন যে, সেটুকু উপলব্ধি করার ক্ষমতাও তাঁর থাকত না—"আপন হস্তে নিত্য শুভ্র কেশে কলপ মাথাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোনদিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিল পেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা তাহার নিদ্রাবস্থায় সর্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চশমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত। সোনাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গাইয়া দিত।"

রামসদয় যেভাবে সংগ্রাম করে আত্মপ্রতিষ্ঠিত, তাতে তাঁকে কর্মযোগী পুরুষই বলা চলে। পিতার সঙ্গে বিবাদ করে তিনি নিজের চেষ্টায় ও পরিশ্রমে কলকাতায় বিষয়-সম্পত্তি করেছিলেন। সমগ্র কাহিনীর মধ্যে আমরা রামসদয়ের যে পরিচয় পাই, তাতে রামসদয়ের কর্মনিপুণতার পরিচয়টা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কিন্তু, রামসদয় পিতার মৃত্যুর পর ভবানীনগর ত্যাগ করে কলকাতাতেই বাস করতে লাগলেন এবং যে সম্পত্তি তিনি ভোগ করে ধনী, সে সম্পত্তি আসলে রজনীর। যে রজনী রামসদয় মিত্রের পরিবারের অনুগ্রহপুষ্ট বলেই সকলে জানে। কিন্তু অমরনাথের অনুসন্ধানের ফলে যখন প্রকাশ পেল, এই সম্পত্তি রজনীর, তখন রামসদয় সে সম্পত্তি রজনীকে ফেরৎ দিতে চাইলেন না। বরং যখন নিঃসন্দেহ হলেন যে, রজনীকে সম্পত্তি

ফিরিয়ে দিতেই হবে, তখন দারিদ্র্যের আশঙ্কায় কাতরা রামসদয় কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিয়ে সম্পত্তি রক্ষা করতে চাইলেন। তাতে পুত্র আপত্তি করাতে রামসদয় স্বভাবতঃই খুব ক্ষুব্ধ হলেন। শেষে, লবঙ্গলতা শচীন্দ্রকে তবুও নিমরাজী করাতে পারলেন। রামসদয়ের কর্মনিপুণতা দেখে তাকে যতখানি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মনে হয়, এই ধরনের আচরণে তার ব্যতিক্রম লক্ষ্য করি।

রামসদয়ের অস্তিত্ব লবঙ্গলতার দ্বারা এমনভাবেই আচ্ছন্ন যে, কাহিনীর ঘটনাবর্তের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব অল্পই অনুভূত হয়। এই বৃদ্ধকে চিত্রিত করবার একমাত্র সার্থকতা যুবতী লবঙ্গলতার স্বামীরূপে এই ধরনের এক ব্যক্তিত্বহীন পুরুষকে চিত্রিত করে বঙ্কিম লবঙ্গলতার অতৃপ্তিজনিত বেদনাকে চাপা দিয়ে অমরনাথ লবঙ্গের প্রণয়ের স্বরূপকে চিত্রিত করেছেন।

এছাড়া অপ্রধান চরিত্র হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে রাজচন্দ্র দাস। যদিও কাহিনীর সূত্রপাত থেকে আমরা জেনেছি তিনিই রজনীর পিতা, কিন্তু ঘটনার রহস্য উদ্ঘাটনের পর জানা গেছে, তিনি রজনীর পালক-পিতা—আসলে তিনি তার মেশোমশাই। বাল্যকাল থেকে অন্ধ রজনীকে তিনি পিতার ন্যায় স্নেহে লালন করেছেন। দারিদ্র্য কখনই তাঁকে সংসারের দায়িত্ব পালন থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি। তাই তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ফুল বিক্রী করে যেভাবে সংসার চালিয়েছেন, যুবতী রজনীকে বিবাহ দিতে চেয়ে তেমনি নিজের কর্তব্য পালন করতে চেয়েছেন। স্নেহাতুর রাজচন্দ্র বলেছেন—"আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নহিলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।" লবঙ্গলতার অনুগ্রহের প্রতি এই পরিবারের প্রচণ্ড আস্থা। তাই তাঁর ব্যবস্থাপনায় বিবাহের আয়োজন তাঁরা নিশ্চিন্ত মনে গ্রহণ করেছিলেন। তাই হীরালাল যখন বিবাহের প্রস্তাব নিয়ে এলো, তিনি সহজেই তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন—তার স্বরূপ সম্পূর্ণ না জেনেই।

ক্রমে অমরনাথের দ্বারা রজনীর সত্যকার পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়—"এক্ষণে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর।"

অমরনাথ যখন রজনীর সত্য পরিচয় রাজচন্দ্রকে জানালেন, রাজচন্দ্র অত্যন্ত কাতর হয়ে উঠলেন—"আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।" রজনীর প্রতি স্নেহাতুর চিত্তের প্রকাশ এখানে লক্ষ্য করা যায়। রাজচন্দ্র রজনীর পুনঃপ্রাপ্তি সম্পর্কে বিস্ময়করভাবে নীরব হয়ে রইলেন।

তারপর ক্রমে ঘটনার আবর্তে রজনীর পরিচয় ও সম্পত্তি অধিকার সম্পর্কে সত্য প্রতিষ্ঠিত হল। অমরনাথের অর্থে ও নির্দেশমত রাজচন্দ্র কলকাতার সিমলায় একটি

বাড়ী কিনে কিছুদিন আত্মগোপন করে রইলেন। শেষে রামসদয় মিত্র রাজচন্দ্রকে একদিন ডেকে পাঠালেন, শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহের বন্দোবস্ত করে সম্পত্তি বাঁচাবার তাগিদে। কিন্তু শেষদিকে স্নেহাতুর রাজচন্দ্রকে বঙ্কিমচন্দ্র অর্থলোভাতুর করে চিত্রিত করেছেন। টাকার লোভে তিনি শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহে সম্মতি দিলেন। তাতে রামসদয়ের আগ্রহ বুঝতে পারি, কিন্তু রাজচন্দ্রের আচরণ অসঙ্গত। লবঙ্গ বলেছে—"রজনীর মাসী-মাসুয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী আমাদিগের দিকে। তাহার কারণ…বিবাহ যদি হয়, তবে…ঘটকবিদায় স্বরূপ…কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু আঁচটা দু-হাজার দশ হাজার।…" কিন্তু রাজচন্দ্র বা তাঁর স্ত্রী রজনীকে সম্পত্তি গ্রহণে রাজী করাতে পারেননি।

এ ধরনের স্নেহপ্রবণ চরিত্র সৃষ্টি ক'রে রজনীর সাংসারিক জীবনের গতি স্বাভাবিকভাবে প্রবাহিত করা সহজ হয়েছে। তাছাড়া রাজচন্দ্র নিঃসন্তান বলে অপত্যস্নেহে লালিত হয়েছে রজনী—সেখানে কোনও প্রত্যাশা ছিল না বলেই চরিত্রটি মহৎ, কিন্তু পরের আচরণ অসঙ্গতিপূর্ণ বলেই মনে হয়।

দশ

কেন্দ্রীয়-চরিত্র

কেন্দ্রীয়-চরিত্র বলতে আমরা সাধারণতঃ বুঝি, সমগ্র কাহিনী-ভাগের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে যিনি সমগ্র কাহিনীর গতি-প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করছেন। এমন একটি চরিত্রকে অনেক সময় আমরা কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা দিই, যে চরিত্র বহিরঙ্গ বিচারে গৌণ মনে হলেও সমগ্র কাহিনীর বিস্তারে এবং নিয়ন্ত্রণে তার অনির্দেশ্য উপস্থিতি অনুভব করা যায়। তাই কাহিনীতে কর্মমুখর না থেকেও লেখকের বক্তব্য প্রকাশ করে সেই চরিত্র কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা পেয়েছে। আবার, মূল কাহিনীর সঙ্গে যদি এক বা একাধিক উপকাহিনী যুক্ত থাকে, সেক্ষেত্রে মূল কাহিনীর প্রধান চরিত্র সব সময় সমগ্র কাহিনীর মুখ্য চরিত্র নাও হতে পারে। সেক্ষেত্রে মুখ্য এবং গৌণ কাহিনীর মধ্যে সমান প্রভাব বিস্তার করেছে এমন চরিত্রই কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা পায়।

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমার-চরিত্র কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা পেতে পারে। কেননা, নবকুমার একদিকে কপালকুণ্ডলা-চরিত্র, অন্যদিকে মতিবিবি-চরিত্রের ওপরে প্রভাব বিস্তার করে কাহিনীকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কপালকুণ্ডলা নামকরণ করার পেছনে বঙ্কিমচন্দ্র কেন্দ্রীয়-চরিত্রের নামে নামকরণ না করে যে চরিত্রের মাধ্যমে একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য বিষয় প্রমাণ করতে চেয়েছেন, সেদিকে পাঠকের

দৃষ্টি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করার জন্য কপালকুণ্ডলার নামে উপন্যাসে নামকরণ করেছেন। চন্দ্রশেখর উপন্যাসে একদিকে প্রতাপ-শৈবলিনীর কাহিনী, অন্যদিকে দলনীবেগম-মীরকাশেমের কাহিনী। দুই কাহিনীর ওপরে চন্দ্রশেখরের প্রভাব অনুভব করা যায়। প্রতাপ-শৈবলিনীর প্রণয়ের ব্যর্থতা ও মিলনে বাধা চন্দ্রশেখরের দ্বারাই সাধিত হয়েছে। অন্যদিকে দলনীবেগমের ভাগ্যবিপর্যয় ও তার জীবনকাহিনীর মধ্যে চন্দ্রশেখরের অস্তিত্ব বারবার অনুভব করা যায়। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র কেন্দ্রীয়-চরিত্রের নামেই নামকরণ করেছেন। যদিও তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয় প্রতাপ-শৈবলিনীর বাল্যপ্রণয়ের ব্যর্থতাকে প্রমাণ করা। রাজসিংহ উপন্যাসে ভারত সম্রাট ঔরঙ্গজেব তাঁর ঐতিহাসিক মহিমা নিয়ে যতই কাহিনীকে প্রভাবিত করুন না কেন রাজসিংহের অস্তিত্ব অনুভব করা যায় অনৈতিহাসিক এবং ঐতিহাসিক দুই কাহিনীতেই। সেদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র রাজসিংহের নামে উপন্যাসের নামকরণ করেছেন।

রজনী উপন্যাসে যে চারটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র পাই সেখানে রজনীর তুলনায় অমরনাথ এবং লবঙ্গলতা অনেক বেশী সক্রিয়। কিন্তু একথা আমাদের ভুললে চলবে না, রজনী গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, একটি বিশেষ মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যেই তিনি এই অন্ধ যুবতীর সাহায্যে তাঁর বক্তব্যকে স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। সেদিক দিয়ে বিচার করলে গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখেই 'রজনী' গ্রন্থের নামকরণ এবং রজনীকেই আমরা কেন্দ্রীয়-চরিত্র হিসেবে চিহ্নিত করতে পারি। তার কারণ, রজনীকে কেন্দ্র করেই সমগ্র কাহিনীর বিস্তার। কাহিনীর মধ্যে রজনী তার জীবনকাহিনী বিবৃত করেছে, অন্য তিনজন কথক (অমরনাথ, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র) রজনীর জীবনের বা তার চরিত্রের ঘটনা বিবৃত করতে গিয়ে নিজেদের কথা প্রসঙ্গতঃ বলেছেন। সেই প্রসঙ্গের সূত্র ধরেই কাহিনীতে অমরনাথ-লবঙ্গের কাহিনীর উপস্থাপনা। অমরনাথ-লবঙ্গের কাহিনীর মধ্যে যতই নাটকীয়তা এবং ঔপন্যাসিক উপাদান থাকুক না কেন, সে কাহিনী এখানে প্রধান হয়ে ওঠেনি। সুতরাং সক্রিয়তার দিক দিয়ে লবঙ্গলতা-অমরনাথ অনেক বেশী ক্রিয়াশীল সন্দেহ নেই, কিন্তু যার জীবন-কাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে তাদের এই কর্মমুখরতা সে চরিত্রটি হচ্ছে রজনী। অমরনাথের কাহিনীতে আত্মপ্রকাশ রজনীকে উদ্ধার করার সূত্র ধরেই। সেই সূত্র ধরে অমরনাথ-চরিত্রের সক্রিয়তা লক্ষ্য করা যায় রজনীর পরিচয় উদ্ধার এবং সম্পত্তি উদ্ধারের মধ্য দিয়ে। ঘটনাচক্রে এই সম্পত্তি উদ্ধারের সূত্র ধরে কাহিনীতে

লবঙ্গলতা-অমরনাথের পূর্ব-পরিচিতির কথা পাঠক জানতে পারে এবং সেই সূত্রে অমরনাথ-লবঙ্গের পূর্ব প্রণয়কাহিনী বিবৃত। রজনীকে বিবাহ করার উপলক্ষে অমরনাথ-লবঙ্গ প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের সম্মুখীন হয়েছে। লবঙ্গ চেয়েছে তার সপত্নী-পুত্র শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দিতে। লবঙ্গের স্বামী রামসদয়েরও তাই ইচ্ছে। এর দ্বারা তারা হৃতসম্পত্তি বাঁচাতে চেয়েছে, রজনীর প্রতি বিশেষ কোন অনুগ্রহ করার জন্য নয়। এই কার্যসিদ্ধির পথে অমরনাথ বাধাস্বরূপ। কারণ, তিনি রজনীকে বিবাহ করতে চেয়েছেন। শেষে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবে ও দৈব অনুগ্রহে শচীন্দ্র রজনীর প্রতি আসক্ত হয়ে পড়েছে—যে শচীন্দ্রকে রজনী তার প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য গোপনে বহু পূর্বেই নিবেদন করেছিলো। এ সংবাদ জানতে পেরে অমরনাথ নিজেকে সংযত করে নিয়েছেন এবং তাঁর নিজের সমস্ত সম্পত্তি রজনীর ভাবী স্বামীর নামে দানপত্র করে দিয়েছেন। রজনী-শচীন্দ্রের মিলন, এই সুখী দম্পতির সন্তানলাভ এবং এই মিলনের জন্য যে অমরনাথই দায়ী তার প্রতি কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ নিজের পুত্রের নাম 'অমরপ্রসাদ' রাখাতেই কাহিনীর সমাপ্তি।

সুতরাং আমরা দেখলাম, সমগ্র কাহিনীর বিস্তার ও পরিণতি রজনীকে কেন্দ্র করেই এবং বঙ্কিমচন্দ্র যে বক্তব্য সপ্রমাণ করতে চেয়েছেন, তা রজনীর মাধ্যমেই। সেইজন্যই রজনীকে আমরা এই উপন্যাসেই কেন্দ্রীয়-চরিত্র বলতে পারি। আগেই বলেছি, অধিক কর্মমুখরতাই চরিত্রের প্রাধান্যের কারণ হতে পারে না। কারণ, বিবাহের আসরে কন্যার চেয়েও কন্যার জননী অনেক বেশী সক্রিয়। তার জন্য কেউই কন্যার জননীকে সেই উৎসবের কেন্দ্রীয়-চরিত্র বলবেন না। অন্ধ রজনী গোপনে শচীন্দ্রের প্রতি তার প্রণয় নিবেদন করেছিলো, নিজে মনে মনেই। তার ফলে সে অন্তর্দাহে ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। শেষে সে যখন এক সংকটজনক মুহূর্তে এসে উপস্থিত, তখন তার চরিত্রে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছে। একদিকে অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত আত্মনিবেদন, অন্যদিকে শচীন্দ্রের প্রতি দুর্বলতা। কোনো স্থির সিদ্ধান্তে না পৌঁছে এই অন্ধ যুবতী নিজেকেই শুধু দ্বন্দ্বে ক্ষত-বিক্ষত করেছে। তার একমাত্র কর্মমুখরতা নিজের ন্যায্য সম্পত্তি ফিরে পেয়েও তা দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করা। সে তুলনায় লবঙ্গলতার কর্মমুখরতা কাহিনীর সূত্রপাত থেকেই লক্ষ্য করি। রজনীর কাছ থেকে ফুল কেনা উপলক্ষে তার প্রতি স্নেহাতিশয্য, রজনীর বিবাহের জন্য বন্দোবস্ত করা, রজনীর সত্য পরিচয় জেনে শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর মিলনের উদ্‌যোগ আয়োজন এবং শেষ পর্যন্ত নিজের গোপন সযত্নলালিত মনোভাবের প্রকাশ ঘটিয়েও রজনী-শচীন্দ্রের মিলন ঘটানোর পশ্চাতে লবঙ্গলতার সক্রিয়তা রজনীর তুলনায়

অনেক বেশী সন্দেহ নেই। আর অমরনাথের সক্রিয়তার কথা তো আগেই বলেছি। কিন্তু সবই রজনীর জীবনকাহিনী বর্ণনা প্রসঙ্গেই। তাছাড়া, আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় প্রথম খণ্ডটি শুধু রজনীর কথা। সে নিজের কথা বলে, নিজের পরিচয় দিয়ে কাহিনী গ্রন্থনের সূত্রপাত করেছে, যেটা তার নিতান্ত গোপন মনের প্রকাশ। কিন্তু দ্বিতীয় খণ্ডের বক্তা অমরনাথ, তৃতীয় খণ্ডের বক্তা শচীন্দ্র, চতুর্থ খণ্ডের বক্তা লবঙ্গ-শচীন্দ্র-অমরনাথ বটে, কিন্তু রজনী নয় এবং পঞ্চম বা শেষ খণ্ডের বক্তা আমরনাথ। সেদিক দিয়ে রজনী নিশ্চয়ই লবঙ্গ অমরনাথের মত সক্রিয় নয়। এ সত্যকে মেনে নিয়েও রজনীকে কেন্দ্রীয়-চরিত্রের মর্যাদা দিতে হবে।

এগার

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র কখনই শুধু গল্প শোনাবার জন্য লেখনী ধারণ করেননি। নবীন লেখকদের উদ্দেশ্যে তিনি এই কথাই বলেছেন, "যদি মনে এমন বুঝিতে পারেন যে লিখিয়া দেশের বা মনুষ্য জাতির কিছু মঙ্গলসাধন করিতে পারেন অথবা সৌন্দর্য সৃষ্টি করিতে পারেন তবে অবশ্য লিখিবেন।" বঙ্কিমচন্দ্রের সব ক'টি উপন্যাসের মধ্যে তিনি কোনো-না-কোনো বক্তব্য প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছেন। প্রবন্ধ গ্রন্থের কথা বাদ দিলেও বঙ্কিমচন্দ্রের বিশেষ বক্তব্য এক একটি উপন্যাসকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে; কখনও তিনি ভূমিকায় সে কথা উল্লেখ করেছেন, কখনও উপন্যাসের মধ্যে বর্ণনা প্রসঙ্গে সে কথা জানিয়েছেন। উপন্যাসের ভেতরেই হোক আর বাইরেই হোক, বঙ্কিমচন্দ্র বিশেষ বক্তব্য প্রমাণ করতে গিয়ে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর শিল্পীসত্তাকে ক্ষুণ্ন করেননি। দু' একটি ক্ষেত্রে শিল্পী বঙ্কিমের পরাজয় ঘটেছে নীতিবাগীশ বঙ্কিমের কাছে।

উপন্যাসে প্রতিপাদ্য বিশেষ তত্ত্ব

রজনী উপন্যাস বঙ্কিম সাহিত্যধারায় নানাদিক দিয়েই বিশিষ্ট। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র যে তত্ত্বটিকে প্রমাণ করার জন্য কাহিনা গ্রন্থন করেছেন, সেখানে শিল্পীর কবিমানস সবসময়েই প্রাধান্য বিস্তার করেছে। গ্রন্থের ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতা লাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মণ করা গিয়োছে।" রজনীর অন্ধত্বকে কেন্দ্র ক'রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন। আমাদের মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রমাণ করতে চেয়েছেন রূপের উপলব্ধি এবং রূপজাত মোহ, শুধু দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারাই প্রকাশ পায় না,

অন্য ইন্দ্রিয়ও সেখানে সমান সক্রিয়, তাই জন্মান্ধ রজনী শ্রবণেন্দ্রিয় এবং স্পর্শানুভূতির সাহায্যে শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর এবং স্পর্শ অনুভব করে তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে। তৃতীয় খণ্ডে শচীন্দ্রের মন্তব্য এখানে স্মরণ করা যেতে পারে—"যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেননা, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহৎ তত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব?" রজনী যখন শচীন্দ্রের প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করেছে, তখন সে উপলব্ধি করেছে, রূপজাত মোহ অন্ধের জীবনেও সমান সত্য রূপে প্রতিভাত।—"তোমাদের চক্ষু আছে রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকার-মাত্র, শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই, রূপ দর্শকের মনে, নহিলে একজনকে সকলে সমান রূপবান দেখে না কেন। একজনে সকলে আসক্ত হয় না কেন! সেইরূপ শব্দও তোমার…শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র…শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে। রূপে হৌক, শব্দে হৌক, স্পর্শে হৌক শূন্য রজনীর হৃদয়ে সুপুরুষ সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে। দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে, মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে…অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে। আমার নয়ন বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না।"

অন্ধ রজনী স্পর্শ ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের দ্বারা প্রেমের আবির্ভাবকে হৃদয়ে অনুভব করেছে। স্পর্শানুভূতির জগতে সে বিভিন্ন পুষ্পের কোমলতা ও সৌরভকে বাল্যকাল থেকে অনুভব করেছে। এই পেলব স্পর্শ তার হৃদয়ে এমনই আচ্ছন্ন যে, শচীন্দ্রের প্রথম স্পর্শলাভে সে সেই রকমই পুষ্পের কোমল স্পর্শ অনুভব করেছে। কারণ দর্শনেন্দ্রিয়ের দ্বারা রূপকে আস্বাদ করার ক্ষমতা তার নেই—"সে স্পর্শ পুষ্পময়; সে ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম, বোধ হইল আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল, আমার পরণে ফুল, আমার ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি! মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল।" চিত্তের এই আচ্ছন্নতা মানুষকে প্রেমে অন্ধ করে। রজনীকে অন্তরে-বাহিরে অন্ধ করে তুলেছিলো।

রজনীর এই রূপমুগ্ধতার সূত্র ধরেই বঙ্কিমচন্দ্র প্রেমের অসীম শক্তি ও মহিমা চিত্রিত করেছেন। প্রেম তার আদিমতা নিয়ে যখন মানুষের চিত্তকে অধিকার করে, তখন তার সামাজিক পরিচিতি বা মর্যাদা, রীতি-নীতি, ঔচিত্য-অনৌচিত্য-বোধ সবকিছুকে আচ্ছন্ন করে তার মহিমা প্রতিষ্ঠিত করে। দীন দরিদ্র যে, সমাজের কাছে অবহেলিত যে আতুর অন্ধ পঙ্গু প্রেমের মহিমময় স্পর্শে ঐশ্বর্যশালী হয়ে

ওঠে। প্রেমের এই দৈবীশক্তি রজনীর মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। দরিদ্র পুষ্পনারী শচীন্দ্রের স্পর্শে তার চিত্তকে শচীন্দ্র-প্রেমে যে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিলো, তখন তার চিত্ত কি একবারও বিচার করতে বসেছিলো শচীন্দ্রকে প্রাপ্তির সম্ভাব্যতা সম্পর্কে। সঙ্গোপনে যে প্রেমকে রজনী লালন করেছে, কোনো অবস্থাতেই তার মহিমাকে সে ক্ষুণ্ণ করতে চায়নি। প্রেমের শক্তি তাকে দুর্জয়, দুঃসাহসী করে তুলেছে। শান্ত, কোমল রজনী বিপর্যয়ের ঝুঁকি নিয়েও হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করতেও কুণ্ঠাবোধ করেনি। শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমের ঐকান্তিকতার জন্যই অমরনাথকে সে গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত এবং প্রথম সুযোগেই সে অমরনাথের কাছে নিজের চিত্তকে প্রকাশ করেছে। এই প্রেমের শক্তিতেই রজনী দারিদ্র্য সত্ত্বেও সম্পত্তির প্রলোভনকে অগ্রাহ্য করতে পেরেছে। এই প্রেমের একাগ্রতাই রজনী-শচীন্দ্রের মিলনকে সম্ভবপর করে তুলেছে এবং যাঁর সহযোগিতায় তাদের এই সুখী পরিণতি তাঁর প্রতি রজনীর কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। এই প্রেমের শক্তিও অলৌকিক। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী এ সম্পর্কে যথার্থই মন্তব্য করেছেন—"সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি যদি দৃষ্টি দিতে পারে, প্রেমের অলৌকিকতার শক্তি দৃষ্টি দিতে না পারবে কেন। দুয়েরই স্বরূপ সমান অজ্ঞেয়, তবে একটির বদলে আরেকটিকে কারণ বলে গ্রহণ করতে বাধা কি।"

কিন্তু, এই বিশেষ তত্ত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে রজনী উপন্যাস কোনোভাবেই ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠেনি। এই বিশেষ মানসিক তত্ত্বকে বঙ্কিমচন্দ্র শিল্পসম্মতভাবে প্রকাশ করতে পেরেছেন।

এই তত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের দৃষ্টিতে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সৌন্দর্যের চেয়েও বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সৌন্দর্যবোধের উপলব্ধি। সেইজন্যই অন্ধ রজনীর চিত্তে রূপজাত যে মোহ, তার থেকে প্রেমের সঞ্চার মূলতঃ সৌন্দর্যানুভূতির প্রতি আসক্তি। যা নিছক দৃষ্টিগ্রাহ্য নয়। রজনীর মধ্যে এই রূপ, প্রেম ও তজ্জনিত সৌন্দর্যের কথা বলতে গিয়ে শ্রদ্ধেয় শ্রীপ্রমথনাথ বিশী যে মন্তব্য করেছেন, তা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য— "রজনী উপন্যাস সৌন্দর্য জিজ্ঞাসার কাব্য···বঙ্কিমচন্দ্রের জগতে সমস্তই সুন্দর··· তাঁর উপন্যাসে নারীগণ সকলেরই অতুল সৌন্দর্য···অন্তপক্ষে তাঁর পাত্রপাত্রীদের নামগুলিও কম সুন্দর নয়···আর এক গুরুতর সৌন্দর্য আছে ··মহৎ কর্ম, মহৎ চেষ্টা, মহৎ ব্রতও সুন্দর। অন্তরে-বাহিরে, মানবে-নিসর্গে যত সৌন্দর্য আছে, সব একত্র হয়ে সঞ্চিত হয়েছে বঙ্কিমচন্দ্রের মধুচক্রে।···প্রেমই সৌন্দর্যের চক্ষু। সেই চক্ষু যেদিন লাভ করবে রজনী, সেদিন দেখবে জগৎ সুন্দর, জগৎ দেখবে সে

সুন্দরী···বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে প্রেমহীন সৌন্দর্য সুন্দর নয়।···তাঁর কাছে সৌন্দর্যের অন্তর অংশ প্রেম। অর্থাৎ বাহির থেকে দেখলে যাকে বলি সৌন্দর্য, ভিতর থেকে দেখলে তাই প্রেম। প্রকৃতির মধ্যে অনন্তের উপলব্ধিতে সৌন্দর্য। মানুষের মধ্যে অনন্তের উপলব্ধিতে প্রেম, মন্তব্য করেছেন রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে সৌন্দর্য ও প্রেমের সম্পর্ক অনুরূপ।···অমরনাথ ও শচীন্দ্র দুজনেই রজনীর মধ্যে বিশুদ্ধ সৌন্দর্যকে···দেখেছে। রক্তমাংসের মানুষটিকে দেখে নাই। দেখলে এমন কথা বলতে পারত না।···শচীন্দ্রের সংস্পর্শে রজনীর হৃদয়ে প্রেম অবতীর্ণ হয়েছে। এতদিন পরে সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের মিলন ঘটলো।···প্রেম জাগ্রত হ'লে পরস্পরের সংস্পর্শে প্রেম ও সৌন্দর্য পূর্ণতা লাভ করে।···'সৌন্দর্য বস্তুতে নাই, দ্রষ্টার চোখে আছে'···মানুষ সেই দৃষ্টি নিয়ে এলো, জগৎকে দেখল সুন্দর।"

আমরা জানি, বঙ্কিমচন্দ্র রজনী উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন, "লর্ড লিটন প্রণীত Last Days of Pompeii নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি কানা ফুলওয়ালী আছে। রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়।··· উপাখ্যানের অংশবিশেষ বা নায়ক-নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না। কিন্তু ইহা নূতন নহে। উইল্‌কি কলিন্স কৃত Woman in White নামক গ্রন্থ প্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।"

বিদেশী প্রভাব

নিদিয়া দরিদ্র অন্ধ ফুলওয়ালী। গ্লকার্স নামে এক গ্রীক যুবকের প্রতি তার গভীর প্রণয় হয়। সে প্রণয় সে প্রকাশ করতে পারেনি, কারণ সে ক্রীতদাসী এবং অন্ধ। কিন্তু নিদিয়া কারো সাহায্য ব্যতিরেকেই রাস্তাঘাট চিনিত, একা যাতায়াত করত। যখন বিসুবিয়াসে অগ্ন্যুৎপাত পম্পাই নগরীকে ধ্বংস করতে উদ্যত, তখন চতুর্দিক ঘোর অন্ধকারে আচ্ছন্ন। মাঝে মাঝে পাহাড় থেকে আগুনের আলো চোখ ঝলসে দিচ্ছে বটে, কিন্তু অন্ধের কাছে সবই সমান। প্রকৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ দান যে দৃষ্টিশক্তি, কিন্তু প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের দিনে চক্ষুষ্মান্ গ্লকার্স ও তার প্রণয়িনীর হাত ধ'রে তাদের বাঁচিয়ে পথ দেখিয়ে সমুদ্রতীরে নিয়ে এলো অন্ধ নিদিয়া। লিটন অন্ধ নিদিয়ার প্রণয়-কাহিনীর এক আকর্ষণীয় পটভূমি রচনা করেছেন। কিন্তু নিদিয়া তার মনের কথা বলতে পারত না। সে যে অন্ধ ক্রীতদাসী!

তাই তার ঈর্ষাকাতর প্রেমের প্রকাশ অন্যভাবে ঘটত। কখনো সে হঠাৎ রেগে উঠত, কখনো সে প্রতিদ্বন্দ্বী Lone-র ক্ষতি করতে চাইত, কখনও প্রসন্ন মনে গ্লকার্স-এর সুখের জন্য নিজের সুখ বিসর্জন দিত। সেজন্যই বোধ করি, সমুদ্রের জলে ঈর্ষা ও ব্যর্থ প্রণয়ের জ্বালা ডুবিয়ে দিল সে। তার অনুভব চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তির অনুভবের থেকে পৃথক হবেই। অনুভূতি ইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় বলেই অনুভূতির ক্ষেত্রে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু অনুভূতির প্রকাশ তো ইন্দ্রিয় দিয়েই। তাই যার দৃষ্টি নেই সে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্নতা দিয়ে জগতের সৌন্দর্যকে আস্বাদ করে। লিটন এই দৃষ্টিহীন নারীর উপলব্ধি ও অভিব্যক্তিকে নতুনভাবে প্রকাশ করেছেন।

কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র রজনীর চরিত্র সৃষ্টি করেছেন মানসিক ও নৈতিক তত্ত্ব ব্যাখ্যার জন্য, নিতান্ত অনুভূতি প্রকাশের জন্য নয়। তাই শ্রদ্ধেয় ডঃ সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন—"রজনী ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী। ইহাতে যে অপ্রত্যাশিত ঘটনা আছে তাহা বিসুবিয়াসের অগ্ন্যুৎপাত নহে; সম্পত্তির হস্তান্তর সম্ভাবনা। অন্ধের অনুভূতি যাহাতে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইতে পারে, সেইজন্য বঙ্কিমচন্দ্র নিজে এই কাহিনী বর্ণনা করেন নাই। ..গ্রন্থকারের বলিবার ভঙ্গী এবং রজনীর বলিবার ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য থাকিবেই। কারণ ইহাদের উপলব্ধি করিবার রীতি স্বতন্ত্র। লিটন গ্লকার্সের দুইটি প্রণয়িনীর চিত্র আঁকিয়াছেন। ইহাদের বাহিরের বিভিন্নতার প্রতি তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্ধ রমণীর অনুভূতির যথার্থ রূপ তিনি আঁকিতে চেষ্টা করেন নাই। বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান কৃতিত্ব এই যে, তিনি এই বৈশিষ্ট্যের যে অভিব্যক্তি দিয়াছেন তাহার মাধুর্য ও বৈচিত্র্য অনন্যসাধারণ। রজনী রূপ দেখিতে পায় না; সে রূপকে গ্রহণ করে শব্দ শুনিয়া, গন্ধ আঘ্রাণ করিয়া, কোমল স্পর্শ অনুভব করিয়া। রজনী তাহার অন্ধকার জগতের অপূর্ণতা সম্পর্কে সচেতন, কিন্তু এই জগতে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের সাহায্যে সে যে সৌন্দর্যের সন্ধান পাইয়াছে তাহার তুলনা নাই।"

রজনী উপন্যাসের ওপর বিদেশী প্রভাব সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বঙ্কিম অভিধানকার শ্রীঅশোক কুণ্ডু বলেন—"নিদিয়া এবং রজনী দু'জনেই জন্মান্ধ। এছাড়া আর কোন মিল নেই উভয়ের মধ্যে। বিদেশিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্যে নিদিয়া পথে পথে ঘুরে বেড়ায় এবং অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পাদন করে। রজনীও একবার পথে বেরিয়েছিল, কিন্তু সে-ও নিতান্ত দায়ে পড়ে এবং অন্যের সহায়তা লাভের আশায়। বাঙালী চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে রজনীকে কোমল-

চরিত্ররূপে অঙ্কন করা হয়েছে। নিদিয়া নিজেই ফুল বিক্রি করত, কিন্তু রজনী দু'একজন ভদ্র গৃহস্থের বাড়ী ছাড়া কোথাও যেত না। নিদিয়া রাস্তায় গান গাইত, রজনী রাস্তাঘাটে গান গায়নি। নিদিয়ার প্রেমজীবনের সমাপ্তি ব্যর্থতায়। রজনী কিন্তু প্রেমে সার্থক। রজনী চক্ষুও ফিরে পেয়েছে।

"তবে লিটনের উপন্যাসের কাছে ঋণ স্বীকার ক'রে বঙ্কিম সুকৌশলে সমালোচকদের পাণ্ডিত্য প্রদর্শনের সম্ভাবনাকে বন্ধ করেছেন।"

ডঃ সুধাকর চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—"রজনীর মধ্যে যেভাবে প্রণয়ের আবির্ভাব ঘটেছে শচীন্দ্রনাথের শব্দ ও স্পর্শে, জন্মান্ধ নিদিয়ার হৃদয়ের প্রেমও সেইরূপ গ্লকাসের স্পর্শে ও কণ্ঠস্বরে জাগ্রত হয়েছে। শচীন্দ্রনাথ যেমন রজনীর হৃদয়ের প্রেম উপলব্ধি করতে পারেনি…গ্লকাসও সেইরূপ নিদিয়ার অন্তরের বেদনাকে উপলব্ধি করতে পারেননি।…বঙ্কিমচন্দ্র বিষয়-বস্তুর যেভাবে পরিবর্তন করেছেন, এবং রজনী-চরিত্রকে যেভাবে পুনর্গঠিত করেছেন, তাতে "Last Days of Pompeii"-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েও রজনী একটি মৌলিক সৃষ্টিরূপে আমাদের সামনে এসেছে।…'Last Days of Pompeii' বাহিরের ঘটনানির্ভর। এই গ্রন্থ (রজনী) অন্তরের বিশ্লেষণমূলক।"

রজনী উপন্যাসে উপন্যাসধর্মী বাস্তবতা ও লৌকিক জীবনকাহিনী অলৌকিকতার অকারণ গুরুত্ব ও প্রাধান্যে বারবার পীড়িত হয়ে কাহিনীকে দুর্বল ক'রে তুলেছে।

অতিপ্রাকৃত প্রভাব ও সন্ন্যাসী

অন্ধ রজনী শচীন্দ্রের প্রতি তীব্রভাবে আকর্ষণ বোধ করেছিলো এবং প্রথম প্রেমের উষ্ণ মদিরা আকণ্ঠ পান করে শচীন্দ্রের স্বপ্নে এমনই তন্ময় হয়েছিল যে, সে সামাজিক সম্ভাব্যতার বিষয়টিকে কোনোভাবেই গুরুত্ব দিতে চায়নি। কিন্তু ঘটনাচক্রে যখন রজনীর ভাগ্যপরিবর্তন ঘটলো এবং শচীন্দ্রদের সম্পত্তির অধিকার আইনতঃ রজনীতে বর্তাল, তখন সম্পত্তি বাঁচানোর তীব্র আকাঙ্ক্ষায় রামসদয় ও লবঙ্গলতা অলৌকিকতার সাহায্য নিতে চেয়েছে। গৃহে আগত এক সন্ন্যাসী অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শচীন্দ্র-চিত্তকে এমনই প্রভাবিত করেছে যে, শচীন্দ্র স্বপ্নে সেই নারীকেই দেখেছে যে তাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী ভালবাসে। সে নারী আর অন্য কেউ নয়, সে রজনী। যে রজনীকে কেন্দ্র ক'রে শচীন্দ্রের এই চিত্তবিকার, সেই রজনীকে ডেকে পাঠিয়ে লবঙ্গলতা এই সমস্যার সমাধান করতে চাইলো। সন্ন্যাসীর সাহায্যে শচীন্দ্রের চিত্তে প্রণয়সঞ্চারের চেষ্টা রজনীর প্রেমের মহিমাকে লাঞ্ছিত করেছে। রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের যে অনুরাগ এবং তার ফলে তার যে চিত্তবিকার তা সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবের দ্বারাই সম্ভব হয়েছে। নরনারীর প্রেমের যে মহিমা পারস্পরিক

আকর্ষণ-বিকর্ষণের লীলা-বৈচিত্র্যে মহিমময় হয়ে ওঠে, এক্ষেত্রে তার একান্ত অভাব লক্ষ্য করা যায়।

তবে সন্ন্যাসীর এই প্রভাবকে যদি আমরা রূপক হিসেবে ব্যাখ্যা করি তাহলে তার আংশিক যৌক্তিকতা খুঁজে পেতে পারি। কাহিনীর শেষদিকে অন্ধ রজনীর দৃষ্টিশক্তি ফিরে পাওয়ার পশ্চাতে সন্ন্যাসীর যে অলৌকিক হস্ত কাজ করেছে তাকে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—অন্ধ রজনীর প্রেম-জীবনের সার্থকতা এবং তৃপ্তি যেন তাকে দৃষ্টিশক্তি দিয়েছে। এই ভালবাসার শক্তিই যেন সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি।

কিন্তু শচীন্দ্র-চিত্তে রজনীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চারের জন্য যে অলৌকিক প্রভাব বা সন্ন্যাসীর দৈবশক্তির প্রয়োগ তাকে কি ব্যাখ্যা করা হবে এইভাবে যে, শচীন্দ্রের অবচেতন মনে রজনীর রূপ-সৌন্দর্যের প্রতি যে আকর্ষণ বা দুর্বলতা ছিল, যা তার কথায় বা বর্ণনার মধ্যে মাঝে মধ্যে ধরা পড়েছে, সেই অবচেতন মনের প্রকাশ ঘটাতে মনকে নিষ্ক্রিয় ক'রে তুলতে হবে বলেই কি সন্ন্যাসী-চরিত্রের অবতারণা? একে সত্য বলে মেনে নিলেও এই পদ্ধতি বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাগত ত্রুটি বলেই মনে হয়। যদিও আমরা জানি, সন্ন্যাসীর প্রতি এবং অলৌকিক শক্তির প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের বরাবরই বিশেষ দুর্বলতা ছিল। সেজন্য আমরা প্রায় প্রত্যেক উপন্যাসেই একটি ক'রে সন্ন্যাসী-চরিত্র ও তাঁর অলৌকিক ক্রিয়াকাণ্ডের পরিচয় পেয়েছি। রজনী উপন্যাসও তার ব্যতিক্রম নয়।

রজনীর রূপ সম্পর্কে শচীন্দ্রের অবচেতন মনে একটা দুর্বলতা ছিল—"রজনী রূপবতী। কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না ··সৌন্দর্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে, বোধহয় সে মূর্তি সকলে ভুলিবেও না। কেননা, সে স্থির, গম্ভীর কান্তির একটা অদ্ভুত আকর্ষণী শক্তি আছে।···যাহাকে পঞ্চবাণ বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই। নাই কি?" শেষের এই জিজ্ঞাসাটির মধ্যেই শচীন্দ্রের অবচেতন মনের মানসিকতা ধরা পড়ে গেছে। অথবা "দুশ্ছেদ্য কণ্টক কাননমধ্যে যত্ন পালনীয় উদ্যানপুষ্পের যত্নের ন্যায় এই রজনীর পুষ্প-বিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে···যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি, তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।" এই উদ্ধৃতিটিরও শেষ বাক্যটিতে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আকর্ষণ আর প্রচ্ছন্ন নেই এবং সে আকর্ষণ যে রজনীর রূপ-সৌন্দর্যের জন্যই, প্রথম উদ্ধৃতিতেই তা স্পষ্ট। এই স্পষ্টতা সৃষ্টির জন্যই কি সন্ন্যাসীর দৈব সাহায্যের প্রয়োজন ঘটেছিল? সেজন্যই কি শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারেই তার প্রতি অতিরিক্ত সহানুভূতি ও দরদ দেখিয়েছে? সমগ্র কাহিনীতে শচীন্দ্রের এই ধরনের আচরণ আর কোথাও

প্রকাশ পেয়েছে বলে মনে হয় না। তাই নিতান্ত দায় পড়ে যে শচীন্দ্র লবঙ্গলতার কথায় সুবোধ বালকের মত রজনীকে বিবাহ করতে চেয়েছে, এমন মনে করার কারণ নেই। রজনীর চরিত্র, মানসিকতা সম্পর্কে শচীন্দ্র এতদূর বিশ্বাসী হয়ে উঠলো কেন? দীর্ঘদিন পরে অমরনাথের সঙ্গে রজনী গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেও কোন প্রশ্ন তার মনে জাগেনি। তাই তো মনে হয়, এই অবচেতন মনের ক্রিয়াকে বাইরে স্পষ্ট করবার জন্য সচেতন মনকে আচ্ছন্ন রাখতে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবের প্রয়োজন ছিল। আগেই বলেছি, সন্ন্যাসী রূপক মাত্র। তাই দেখি, সন্ন্যাসীর মন্ত্রপ্রয়োগের ফলেই শচীন্দ্রের সচেতন মনের বিরূপতাকে দূর করে অবচেতন মনের দুর্বলতা শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা ও স্বীকৃতি পেয়েছে। এর জন্য শচীন্দ্র-চিত্তে তীব্র দ্বন্দ্ব ও প্রতিক্রিয়া তো দেখা দেবেই। সেজন্যই সে বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। কিন্তু অপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে শচীন্দ্রের লৌকিক দুর্বলতাকে প্রত্যক্ষ ক'রে তুলে বঙ্কিমচন্দ্র শুধু প্রেমের মহিমাকেই ক্ষুণ্ণ করেননি, উপন্যাসের প্রধান ত্রুটি হিসেবেও একে চিহ্নিত করে রেখেছেন।

আবার রজনীকে প্রাপ্তির সম্ভাবনায় শচীন্দ্র ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছে। এসব কার্যকলাপের পশ্চাতে রয়েছে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাব। সন্ন্যাসী এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করে লবঙ্গলতাকে বুঝিয়েছেন। সন্ন্যাসী বুঝিয়েছেন যে, তাঁর তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপের জন্যই শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত হয়েছে। শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর আকর্ষণ যেমন মানবিক বা লৌকিক কারণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আকর্ষণের অন্তরালে অলৌকিকতা সক্রিয়। এই অলৌকিকতার আরও পরিচয় পাওয়া যায় পরবর্তীকালে রজনীর অন্ধত্ব ঘুচিয়ে দৃষ্টিদান করার ব্যাপারে সন্ন্যাসীর ক্রিয়াকলাপে।

আমরা আগেই বলেছি, অলৌকিকতা বা সন্ন্যাসীর ক্রিয়াকলাপের প্রতি বঙ্কিমচন্দ্রের সবিশেষ দুর্বলতা ও বিশ্বাস ছিল—তার প্রমাণ তাঁর অনেক উপন্যাসে নিহিত। এখানে পাই, লবঙ্গলতা বিশ্বাস করে সন্ন্যাসীর মন্ত্র-প্রয়োগে কামার বউয়ের পিতলের টুক্‌রো সোনায় পরিণত হয়েছিল। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"…শচীন্দ্রের মনোভাব পরিবর্তনের যাহা মূল কারণ, তাহা অতিপ্রাকৃতের রাজ্য হইতে আসিয়াছে, বাস্তব-জগতের বিশ্লেষণ-প্রণালী তাহার উপর প্রযোজ্য নহে। উপন্যাসের দিক হইতে ইহাকে গ্রন্থের একটি অপরিহার্য ত্রুটি বলিয়াই ধরিতে হইবে। বঙ্কিম রোমান্টিক যুগের লেখক,…সুতরাং তিনি রোমান্সের সমস্ত convention অসঙ্কুচিতভাবে উপন্যাসে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন।…"

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত বলেছেন—"সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির সাহায্যে শচীন্দ্রনাথ জানিতে পারিয়াছে যে, রজনী তাহার প্রতি আসক্ত এবং তাঁহার ততোধিক অলৌকিক শক্তিতে শচীন্দ্রনাথ রজনীতে আসক্ত হইয়াছে। গ্রন্থের এই অংশ সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট। সন্ন্যাসী যে শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা একেবারে অনৈসর্গিক।…সন্ন্যাসী আসিয়া গল্পটি নিয়ন্ত্রিত করিয়াছেন।…"

শ্রীপ্রফুল্লকুমার দাশগুপ্ত বলেন—"…কাব্যে অনৈসর্গিক বা অতি-প্রাকৃতের সংযোজনামাত্রই দূষণীয় নহে। ম্যাক্‌বেথের ডাইনীত্রয় ঐ নাটকের অন্যতম শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। কিন্তু যে স্থলে অতিপ্রাকৃত সহজভাবে চরিত্রস্ফুরিত ব্যাঘাত ঘটায়, সেস্থলে অতিপ্রাকৃতের পরিবেশন নিঃসন্দেহে দূষণীয়।…রজনীকে সে রাত্রে স্বপ্নে দেখিতে না পাইলে, তাহাকে বিবাহ করার জন্য উদ্‌গ্রীব হওয়া দূরের কথা, কোন অবস্থাতেই তিনি (শচীন্দ্র) এ বিবাহে সম্মত হইতেন না। অর্থাৎ এস্থলে প্রাকৃত হইতে অতিপ্রাকৃতকে অধিকতর প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।…ইহার ফলে শচীন্দ্রের চরিত্র সহজভাবে বিকাশলাভ করিতে পারে নাই। অতি-প্রাকৃতের পরিবেশনে ইহাকে উপন্যাসের ত্রুটি বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে।…"

এইসব মত পর্যালোচনা করে আমরাও বলতে পারি, বাঙালী-জীবনে যতই লৌকিকতা ও অলৌকিকতা পাশাপাশি বিরাজ করুক, বাঙালী বিশ্বাসে তা' যতই দৃঢ়ভিত্তিক হোক, 'রজনী' উপন্যাসে শচীন্দ্রের কাহিনীতে সন্ন্যাসীর মন্ত্রপ্রভাব ও অলৌকিকতা বিশ্বাসযোগ্য ও স্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি। যেমন হয়নি, শেষাংশে দৃষ্টিশক্তি লাভ সম্পর্কেও। অন্যান্য উপন্যাসে সন্ন্যাসীর প্রভাব আছে সত্য, কিন্তু 'রজনী' উপন্যাসে সন্ন্যাসীর আচরণ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের মত নিপুণ ও গঠন-কৌশল সম্পর্কে সচেতন শিল্পীর এ ধরনের ত্রুটি সহজেই আমাদের বিভ্রান্ত করে।

বারো

বর্ণনা-রীতি ঃ ভাষা-সংলাপ ও হাস্যরস

রজনী উপন্যাসে ভাষাগত ত্রুটি আমারা লক্ষ্য করি উপন্যাসের বর্ণনায়। আমরা জানি, রজনী উপন্যাসে বঙ্কিমচন্দ্র নিজে নাট্যকারের মত অন্তরালে থেকে পাত্র-পাত্রীদের জবানীতে কাহিনী বর্ণনা করেছেন। ফলে, অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মত উচ্চ শিক্ষিত চরিত্র যে ভাষা এবং ভঙ্গীতে কাহিনী বিবৃত করেছেন, রজনী বা লবঙ্গলতার মত অশিক্ষিত বা অর্ধ শিক্ষিত চরিত্রের ভাষা এবং বর্ণনা ভঙ্গীর মধ্যে পার্থক্য সহজে নজরে পড়ে না। এমনকি, এদের সংলাপের মধ্যে যে বাগ্‌বৈদগ্ধ্যের পরিচয় পাওয়া যায়, তা থেকে শিক্ষাগত বা জীবনগত পার্থক্য উপলব্ধি করা সহজ নয়।

বঙ্কিমচন্দ্র এ ত্রুটি চাপা দিতে পারেননি। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—"প্রত্যেক বক্তার প্রকৃতির সহিত তাহার ভাষার সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করিতে হইয়াছে।…এই চেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয় নাই; বিভিন্ন বক্তার চরিত্রানুযায়ী ভাষাগত প্রভেদ বঙ্কিম রক্ষা করিতে পারেন নাই। নায়িকা রজনী সম্বন্ধেই এই বিষয়ে একটা গুরুতর অসামঞ্জস্যের পরিচয় পাওয়া যায়। অন্যান্য চরিত্রের সাক্ষ্য হইতে অন্ধ রজনীর যে কোমল, ব্রীড়া-সঙ্কুচিত, প্রকাশবিমুখ, সমবেদনাপূর্ণ ও স্বার্থ-বিসর্জন-তৎপর প্রকৃতিটি ফুটিয়া উঠে, তাহার নিজের পরিহাসপূর্ণ, মৃদুবিদ্রূপমণ্ডিত ও বিশ্লেষণ-কুশল উক্তিগুলি ঠিক তাহার সমর্থন করে না। তারপর তাহার মুখে যে সমস্ত গভীর চিন্তাশীলতাপূর্ণ দার্শনিকোচিত উক্তি দেওয়া হইয়াছে, তাহা তাহার প্রকৃতির পক্ষে ঠিক শোভন হয় নাই, তাহা অমরনাথ বা শচীন্দ্রের মুখে অধিকতর সঙ্গত হইত। আবার তাহার কথাবার্তায় যেরূপ গভীর সংসারাভিজ্ঞতার নিদর্শন পাওয়া যায়, তাহাও তাহার মত সমাজ-সংস্রবরহিত, সরল অন্ধ যুবতীর পক্ষে অনধিগম্য বলিয়াই মনে হয়।"

ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্তের মন্তব্য এই প্রসঙ্গে প্রণিধানযোগ্য—"উপন্যাস বর্ণিত চরিত্রেরা কখন কাহিনী বলিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং একে অপরের আখ্যায়িকা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিল কিনা!…যদি তাহারা উপাখ্যান শেষ হইয়া গেলে পরস্পরের মধ্যে পরামর্শ করিয়া বর্ণনা আরম্ভ করে, তাহা হইলে উপন্যাসের সজীবতা চলিয়া যায়। ইতিহাস ও উপন্যাসের মধ্যে পার্থক্য লুপ্ত হইয়া যায়।…রজনী বলিতেছে—"এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না, আর একজন বলিবে।" শচীন্দ্রনাথ তাহার বর্ণনা আরম্ভ করিয়াছে এইভাবে—'এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে, রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে।' অমরনাথ বলিয়াছে—'এই ইতিহাসে ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে।' এইরূপে নানা উক্তি ও ইঙ্গিত হইতে ইহা স্পষ্ট প্রমাণিত হইয়াছে যে, উপন্যাস লিখিত হইয়াছে উপন্যাস-বর্ণিত ঘটনা ঘটিবার পর এবং প্রত্যেক বক্তাই অপরের কথা মোটামুটিভাবে জানে। এই দিক দিয়া বিচার করিলে উপন্যাসের এই রীতিকে সার্থক বলা যায় না। কারণ ইহাতে সমস্ত বর্ণনা অস্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়।"

ঔপন্যাসিক নিজে কাহিনী বর্ণনা করলে এই অসুবিধা দেখা দিত না। কেননা, তিনি উপন্যাসের চরিত্রগুলির নিয়ন্ত্রণকর্তা। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তিনি অবহিত। কিন্তু উপন্যাসের পাত্র-পাত্রীর পক্ষে ভবিষ্যৎ পরিণতি সম্পর্কে সম্যক্ জ্ঞাত হওয়ার পর কাহিনীর বর্ণনা অস্বাভাবিক। যেমন, রজনী তার জীবন-

কাহিনী শুরু করেছে গভীর ক্ষোভ ও বেদনার মধ্যে। তার এই প্রেমের সফল পরিণতি সম্পর্কে সে যে জ্ঞাত ছিল, এ পরিচয় তার বর্ণনায় পাওয়া যায় না। তাই হীরালালের সঙ্গে তার গৃহত্যাগ ও গঙ্গার নির্জন তীরে একাকী বিসর্জন নাটকোচিত কৌতূহলকে ক্ষুণ্ণ করেছে। যদিও পরবর্তী ঘটনাবলী সম্পর্কে রজনী কোন ইঙ্গিত দেয়নি। বর্তমানের ঘটনার প্রতি একাগ্রতা কাহিনীতে যতই আবেগ সঞ্চার করুক, তাকে স্বাভাবিক ক'রে তুলতে পারেনি। কারণ, রজনীর কাহিনী-বর্ণনা দু'একটি ঘটনার ভবিষ্যৎ কাহিনী থেকে আহৃত। যেমন, রজনীর উক্তি—"আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই, পশ্চাৎ শুনিয়াছি।" ডঃ শ্রীকুমারবাবু মন্তব্য করেছেন—"এই পরবর্তী জ্ঞান লাভ যে কখন হইল, হীরালালের জীবনীর সহিত বিস্তৃত পরিচয় যে কিরূপে সম্ভব হইল, যদি গঙ্গাতীরে বিসর্জনই রজনীর জীবনের শেষ মুহূর্ত বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর দেওয়া যায় না।...সেইরূপ 'কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না, আর একজন বলিবে' এই উক্তি ভবিষ্যতের দিকে ইঙ্গিত করে বলিয়া রজনীর মুখে সুসঙ্গত হয় নাই। আবার রজনীর নিজ অন্ধত্ব সম্বন্ধে যে খেদোক্তি, আলোকের ধারণা পর্যন্ত করিতে তাহার অক্ষমতাও সম্পূর্ণভাবে বর্তমানেই সীমাবদ্ধ করিতে হইবে; নচেৎ তাহার ভবিষ্যৎ দৃষ্টিলাভের সহিত এ অংশের সমন্বয় করা কঠিন হইবে। যদিও অন্ধের আত্ম-বিশ্লেষণ, কলা-কৌশল ও কল্পনা-সমৃদ্ধির দিক্ হইতে প্রায় নির্ভুল হইয়াছে, তথাপি একটি ক্ষুদ্র চ্যুতি বঙ্কিমের সূক্ষ্ম দৃষ্টিকেও অতিক্রম করিয়া গিয়াছে। যথা হীরালাল সম্বন্ধে রজনীর উক্তি—"হীরালাল তৎকালে ভগ্ন-মনোরথ হইয়া ঘরের এদিক ওদিক দেখিতে লাগিল"—এ তথ্যের আবিষ্কার যে অন্ধের ক্ষমতাতীত, সে বিষয়ে চক্ষুষ্মান্ গ্রন্থকারের মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃতি ঘটিয়াছিল।"

অমরনাথ সম্পর্কেও এই ত্রুটি লক্ষণীয়। অমরনাথ তাঁর বর্ণনা আরম্ভ করেছেন, তাঁর অতীত জীবনের পদস্খলনের জন্য তাঁর মানসিক পরিবর্তন এবং জীবন সম্পর্কে একটা নিরাসক্ত ভাব। অমরনাথ-চরিত্রকে বোঝবার জন্য এটুকুর প্রয়োজন হয়ত ছিল, কিন্তু অমরনাথ যখন তাঁর বক্তব্য লিপিবদ্ধ করেছেন, তখন তা বর্তমানেই সীমাবদ্ধ। শ্রীকুমারবাবু বলেন—"রজনীকে পত্নীরূপে পাইবার সম্ভাবনায় তাহার মনে যে অভাবনীয় পুলক সঞ্চার হইয়াছে এবং ইহার পরেই যে অপ্রত্যাশিত নৈরাশ্য আসিয়া তাহার হৃদয়কে গাঢ়তর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়াছে, এই উভয় দৃশ্যই খুব বিশদ ও জীবন্তভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শচীন্দ্রের উক্তিমধ্যে কেবলমাত্র একস্থানে ভবিষ্যতের পূর্বজ্ঞান সূচিত

হইয়াছে—'যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না।' কিন্তু অন্য সর্বত্রই কেবল বর্তমানের ঘটনাস্রোতই বর্ণিত হইয়াছে; বিশেষতঃ রজনীর প্রতি তাহার প্রথম দয়া ও সহানুভূতি···ভবিষ্যৎ প্রেমের ছায়া পড়িয়া ইহার তীব্রতাকে হ্রাস করিয়া দেয় নাই। অসুস্থ অবস্থায় শচীন্দ্রের চিত্তবিকারের মধ্যে রজনীর প্রতি তাহার প্রেম স্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে।···উপন্যাসের ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রের মধ্যে আখ্যায়িকা বর্ণনের ভার বাঁটিয়া দেওয়ায় ··উপন্যাসের গতি পদে পদে প্রতিহত ও মন্থর হইয়া থাকে। একই ঘটনা বিভিন্ন লোকের চক্ষু দিয়া দৃষ্ট হয়।···বঙ্কিম এমনই সুকৌশলে বক্তাদিগের ক্রম নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন যে, গল্পের অগ্রগতি কোথাও নিশ্চল হয় নাই। যে যে অংশের প্রধান নায়ক, তাহারই মুখে সেই অংশ বিবৃত করার ভার অর্পিত হইয়াছে।···প্রত্যেক নূতন চরিত্রের আত্মবিশ্লেষণের জন্য দু'একটি পরিচ্ছেদ ঘটনাস্রোতে বাধাপ্রদান করিলেও মোটের উপর উপন্যাসের অগ্রগতি ব্যাহত হয় নাই। গঠন-কৌশলের দিক দিয়া রজনীতে বঙ্কিমের কৃতিত্ব সামান্য নহে।"

এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচীর মন্তব্য স্মরণীয়—"যেখানে ঔপন্যাসিকের নৈর্ব্যক্তিক বর্ণনা আমাদের হৃদয়ে বিন্দুমাত্র উত্তাপের সঞ্চার করিতে পারিত না, সেখানে ব্যক্তিগত ভাবাবেগ তাহার সকল আকুলতা লইয়া আমাদের অন্তরে আবেদন জানাইতে থাকে। প্রতি ঘটনার বর্ণনার মধ্যে যে একটা অনস্বীকার্য অন্তরঙ্গতার সুর থাকে, তাহা পাঠকের মনে অনুরূপ অনুভূতির কম্পন না জাগাইয়া পারে না।"

তাই এখানে দেখি, বঙ্কিমচন্দ্র ঔপন্যাসিকের ভূমিকা পরিত্যাগ করে তাঁর অখণ্ড অনুভূতি-সত্তাকে বিভিন্ন খণ্ডে বিচ্ছিন্ন করে এক একটি চরিত্রের মধ্যে আত্মগোপন করে সেই সেই চরিত্রের অনুভূতি ও আবেগকে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ বঙ্কিমের অনুভূতির এক খণ্ডাংশ অন্ধ পুষ্পনারী রজনীর অন্তরালে আত্মগোপন করে তাকে প্রকাশ করেছে। আবার অমরনাথের ছদ্মবেশে বঙ্কিম-অনুভূতির প্রকাশ। এইভাবে একটি সত্তার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে একদিকে উপন্যাসের উষ্ণ আবেগময়তা প্রকাশ পেয়েছে সত্য, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীর মধ্যে সেই ঔপন্যাসিক স্বয়ং নিজ সত্তার খণ্ডিত অংশের বৈচিত্র্য বা বৈপরীত্য ততখানি সৃষ্টি করতে পারেননি। সার্থক নাট্যকারের গুণ বঙ্কিমচন্দ্রের মধ্যে পাওয়া যায় না বলেই তাঁর ভাষা ও সংলাপে সে ধরনের বৈচিত্র্য বা চরিত্রগত বৈপরীত্য প্রকাশ পায়নি। তা ভিন্ন চরিত্রগত আবেগ ও অনুভূতির তীব্রতা তিনি যথাযথ সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। যেমন, রজনীর আবেগ রোমান্সসুলভ বাতাবরণ সৃষ্টি না ক'রেও জীবন্তভাবে প্রকাশ পেয়েছে। শচীন্দ্রের চিত্তে প্রেমানুভূতি ও সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তির কথা বিশ্বাস্য ভঙ্গীতে শচীন্দ্র বর্ণনা-

করেছে। এই আবেগ নিয়ে আপন চিত্তের বিকাশ বর্ণনা করা অনেক সহজ। ঔপন্যাসিককে এতখানি উচ্ছ্বাসপ্রবণ হলে চলে না। তাঁকে একটু নিরাসক্ত ভঙ্গীতে চরিত্রকে বর্ণনা করতে হয়। তাছাড়া, এই বিশিষ্ট রীতি গ্রহণের ফলে একদিকে যেমন আবেগাকুলতা প্রকাশ পেয়েছে সত্য, অন্যদিকে তেমনি অনেক অপ্রয়োজনীয় অংশ বাদ গেছে, যা আত্মকথন না হয়ে ঔপন্যাসিকের বর্ণনীয় বিষয় হলে পূর্ণতার প্রয়োজনে অপরিহার্য ছিল। বিশেষ বিশেষ চরিত্র বিশেষ বিশেষ ঘটনা বর্ণনা করায় অনেক বিস্তৃত ঘটনা সংক্ষেপে বলা গেছে।—"আধুনিক সিনেমা শিল্পের মত এই নির্বাচিত ঘটনা প্রতিফলনের ফলে কাহিনী বস্তুঘন ও নাটকীয় গুণসম্পন্ন হইয়া উঠিয়াছে। অথচ ভাবাবেগও আপনার স্থান করিয়া লইতে পারিয়াছে।" অবশ্য মাঝে মধ্যে চরিত্রগুলির দার্শনিক উক্তি, মন্তব্য হিসেবে যতই মূল্যবান হোক, মূল কাহিনী বর্ণনায় তা অতিরিক্ত বলেই মনে হয়। ঔপন্যাসিক নিজে তাঁর জীবন-দর্শন বলবার অধিকারী বলে সেই সুযোগ কাহিনীর পাত্র-পাত্রীরা ততখানি পেতে পারে কিনা, এ প্রশ্ন জাগবেই, যেমন অমরনাথ বা শচীন্দ্রের দার্শনিকতা।

রজনী উপন্যাসের আরো কয়েকটি অসঙ্গতি ও ত্রুটি সম্পর্কে উল্লেখ করা যেতে পারে। যেমন, রজনীর মত অশিক্ষিতা নারীর মুখে সমাসবহুল দীর্ঘ সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ অসঙ্গত। যথা, 'ললিত-লবঙ্গলতা-পরিশীলন-কোমল-মলয়-সমীরে'। জয়দেবের এই পংক্তিটি নির্ভুলভাবে রজনীর মুখে অসঙ্গত শোনায় বা যখন সে লবঙ্গ-রামসদয়ের প্রেম-জীবনের বর্ণনা করছে, তখনকার মন্তব্য রজনীর মত অন্ধ নারীর পক্ষে অস্বাভাবিক—"তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল, আরোগ্যে সুরুয়া।" এ ছাড়া কিছু ভাষাগত ও ব্যাকরণগত ত্রুটিও লক্ষ্য করা যায়।

রজনী উপন্যাসের বর্ণনা পাত্রপাত্রীদের জবানীতে হয়েছে ব'লে বর্ণনাভঙ্গীতে কোথাও খুব বেশী আড়ম্বর নেই। শুধু আবেগময় ভাবপ্রকাশে উচ্ছ্বাসপূর্ণ ভাষা বর্ণনাভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। সেজন্য বর্ণনাভঙ্গীতে অনেক ক্ষেত্রে কবিতার আবেগ বা ভঙ্গী অনুভব করা যায়। যেমন, রামসদয়ের দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী লবঙ্গলতা সম্পর্কে রজনীর মন্তব্য।—"...আদরের আদরিণী, গৌরবের গরবিনী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোলো আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল।" কিংবা লবঙ্গের বর্ণনা প্রসঙ্গে অমরনাথের মন্তব্য "...যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনির ছটা, বেণীর দোলানি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনী, কথার ছলনি, যুবতীর রূপের বিকাশ একপ্রকার

দোকানদারি।” কিংবা, রূপোন্মত্ত রজনীর উচ্ছ্বাসময় প্রকাশ, গঙ্গাতীরে অসহায়া অন্ধ যুবতীর চিত্তভাবনা, শচীন্দ্রের চিত্তবিকারের সময় যে উচ্ছ্বাস বা অমরনাথের সংসারের সমস্ত বন্ধন ছেড়ে যাওয়ায় যে উচ্ছ্বাস—এই বর্ণনাগুলির মধ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাশৈলীর নৈপুণ্য প্রকাশ পেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্র মূলতঃ জীবনের গভীরতর দিক দিয়ে উপন্যাস রচনা করলেও তাঁর উপন্যাসগুলির মধ্যে হাস্যরসের নির্মল শুভ্র সংযত প্রকাশ আমরা লক্ষ্য করি। বঙ্কিমচন্দ্রের পূর্বে বাঙলা সাহিত্যে হাস্যরস বলতে সাধারণতঃ বোঝাতো অশ্লীলতা বা ভাঁড়ামি। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর সৃষ্টির মাধ্যমে প্রমাণ করলেন যে, অশ্লীলতা বা ভাঁড়ামি না করেও হাস্যরস সৃষ্টি করা যায় এবং সে রস অন্যান্য রসের তুলনায় কোনো অংশে নিকৃষ্ট নয়। অর্থাৎ হাস্যরসকে বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম সাহিত্যের নিম্নাসন থেকে তুলে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠা দিলেন। তাঁর সমগ্র সাহিত্য সাধনায় ‘কমলাকান্তের দপ্তর’ সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বঙ্কিম-পূর্ববর্তী সাহিত্যে হাস্যরস সৃষ্টিতে যে রুচিহীনতার পরিচয় পাওয়া যায়, বঙ্কিমচন্দ্র তার দ্বারা কোনোভাবেই প্রভাবিত হননি। এমনকি তাঁর সাহিত্যগুরু ঈশ্বর গুপ্তেরও অশ্লীলতা দুষ্ট রচনা তাঁকে প্রভাবিত করতে পারেনি। তাই রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন—“উজ্জ্বল শুভ্র হাস্য সকল বিষয়কেই আলোকিত করিয়া তুলিতে পারে। তিনিই প্রথম দৃষ্টান্তের দ্বারা প্রমাণ করাইয়া দেন যে, এই হাস্যজ্যোতির সংস্পর্শে কোনো বিষয়ের গভীরতার হ্রাস হয় না, কেবল তার সৌন্দর্য ও রমণীয়তা বৃদ্ধি হয়।...যে বঙ্কিম বঙ্গসাহিত্যের গভীরতা হইতে অশ্রুর উৎস উন্মুক্ত করিয়াছেন, সেই বঙ্কিম-ই আনন্দের উদয়শিখর হইতে নবজাগ্রত বঙ্গসাহিত্যের উপর হাস্যের আলোক বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন।”

দুর্গেশনন্দিনীর গজপতি বিদ্যা-দিগ্‌গজ, বিষবৃক্ষের হীরা, রাজসিংহ উপন্যাসের তস্‌বিরওয়ালী বুড়ী প্রভৃতি চরিত্র এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। রজনী উপন্যাসেও হাস্যরসস্রষ্টা বঙ্কিমচন্দ্রের পরিচয় পাওয়া যায়।

হাস্যরসের যে চার শ্রেণী—Wit, Humour, Satire, Fun—এই চার শ্রেণীর উদাহরণই রজনী উপন্যাসে ছড়ানো। Wit-এর লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—“Wit হইতেছে বুদ্ধির তরবারি খেলা। নিঃসম্পর্কিত বস্তু বা চিন্তার মধ্যে বিদ্যুৎ ঝলকের ন্যায় অতর্কিত সাদৃশ্য আবিষ্কার। Wit-এ বুদ্ধির স্বচ্ছন্দ লীলা আমাদের চোখ ধাঁধাইয়া দেয় ও সপ্রশংস বিস্ময়ের উদ্রেক করে। কিন্তু ইহার কথা লোফালুফির ও অদ্ভুত-ব্যায়াম কৌশলের মধ্যে কোনো হৃদয়গত গভীর আলোড়নের স্পন্দন অনুভূতি হয় না।...Wit একটা মুহূর্ত-স্থায়ী

আতসবাজীর সহিত তুলনীয়—ইহাতে লেখকের জীবনের প্রতি একটা সমগ্র ব্যাপক দৃষ্টির কোনো পরিচয় মিলে না।”

রজনী উপন্যাসে এই ধরনের বাগ্‌বৈদগ্ধ্য বা Wit-এর পরিচয় পাওয়া যায়। বৃদ্ধ রামসদয়ের তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতার পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনায় রজনীর মন্তব্য এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে—“তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চুন, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাশিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।”

Humour-এর প্রকৃতি সম্পর্কে শ্রীকুমারবাবু বলেছেন,—“Humour-এ বুদ্ধির তীব্র দীপ্তির সহিত সহানুভূতির করুণ শীতল স্পর্শের একপ্রকার অপরূপ সম্মেলন—মুখের হাসি ও চোখের জল মিশিয়া একপ্রকার অপূর্ব ইন্দ্রধনুর বর্ণ বৈচিত্র্য সৃষ্টি।…Humour-এর গভীর সহানুভূতি বুদ্ধির তীক্ষ্ন চোখ ঝলসানো চাকচিক্যের উপর একটা স্নিগ্ধ শ্যাম আবরণ পরাইয়া দেয়। ইহার ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ, ইহার সমালোচনা হৃদয়ের গোপন-অশ্রু প্রবাহের শীকরসিক্ত হইয়া তাহাদের সমস্ত উগ্র ঝাঁঝ হারাইয়া ফেলে ও একপ্রকার স্নেহমণ্ডিত অনুযোগে রূপান্তরিত হয়।…Humour-এর গভীর আবেদনের একটা কারণ এই যে, ইহার পশ্চাতে একটা বিশিষ্ট মনোবৃত্তি, জীবন-সমালোচনার একটা মৌলিক গতানুগতিকতা-বর্জনকারী ভঙ্গীর পরিচয় মেলে। দীর্ঘ অভ্যাসের ফলে জীবনের যে সমস্ত বৈষম্য ও অসঙ্গতির সম্বন্ধে আমাদের মন অসাড় অচেতন হইয়া পড়িয়াছে…Humourist-এর হাসির খোঁচা এক ঝলক আলোকের মত সেই সমস্ত ভ্রান্তি ও অসঙ্গতিকে এক মুহূর্তে সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল করিয়া তোলে…Humourist তাঁহার হাসির সাহায্যে আমাদিগকে বুঝাইয়া দেন যে, যেখানে আমরা গম্ভীর সেখানে আমরা হাস্যাস্পদ, যাহা আমাদের নিকট উপহাস্য তাহা প্রকৃতপক্ষে সহানুভূতির অধিকারী।…এক হিসাবে Humourist দার্শনিকের নিকট আত্মীয় ও সহকর্মী।…হাস্যরসিক একটিমাত্র বক্রোক্তি, একটিমাত্র অনায়াসোচ্চারিত হাস্যতরল মন্তব্যের দ্বারা আমাদের মনের উপর হইতে বদ্ধমূল সংস্কারের ঘন যবনিকা অপসারিত করেন।”

রজনী উপন্যাসে এই ধরনের হাস্যরসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। যেমন রজনীর বর্ণনা—“আমি স্বয়ংবরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারী ব্যাপার। অতি উঁচু, অটল অচল… মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে। আমি মনুমেণ্ট-মহিষী।” কিংবা প্রতিবেশীর চার বছরের শিশু বামাচরণকে বর বলে

সম্বোধন করে রজনীর যে আলাপ—"একদিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে ও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।" তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস না, তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেককাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলে কি কলে গা?" বোধহয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয়, তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্তব্যাকর্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।" এই রসিকতার অন্তরালে যখন আমরা রজনী-চিত্তের বেদনা ও গোপন আকাঙ্ক্ষার কথা উপলব্ধি করি, তখন মুখের হাসি ও চোখের জল মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

Satire-এর লক্ষণ আলোচনা করতে গিয়ে ডঃ শ্রীঅজিতকুমার ঘোষ বলেছেন,—"যে হাসি আমাদের মুখকে প্রসন্ন না করিয়া বিষণ্ণ করিয়া তোলে, যাহা আমাদের মন আমোদে উজ্জ্বল না করিয়া আঘাতে দীর্ণ করিয়া ফেলে, তাহা ব্যঙ্গের হাসি। ব্যঙ্গকার বড় কঠোর, বড় নির্মম। তিনি মানুষের দোষ ও ব্যাধি নগ্ন করিয়া পৈশাচিক উল্লাসে মত্ত হইয়া উঠেন। তাঁহার হাসি একক···Humour এবং Wit-এর মধ্যেও উপহাস আছে; কিন্তু সেসব ক্ষেত্রে হাসির শীতল প্রলেপে উপহাসের তপ্ত জ্বালা জুড়াইয়া যায়। কিন্তু ব্যঙ্গের মধ্যে উপহাসের জ্বালা নিদারুণরূপে বিদ্যমান। সেই জ্বালা আমাদের মনের মধ্যে তীব্র প্রদাহের সৃষ্টি করিয়া আমাদের দরদ, সহানুভূতি সব শুষ্ক করিয়া ফেলে।"

রজনী উপন্যাসে অন্যান্য শ্রেণীর হাস্যরসের তুলনায় ব্যঙ্গরসই অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। হীরালালের বর্ণনায় ও আচরণে, শচীন্দ্রের আত্মকথনের কোনো কোনো ক্ষেত্রে, অমরনাথের কোনো কোনো মন্তব্যে, এমনকি, শেষ পর্বে লবঙ্গ-অমরনাথের সংলাপের মধ্যেও এই ব্যঙ্গরসের আস্বাদ আমরা পাই। যেমন, হীরালাল সম্পর্কে রজনীর মন্তব্য—"হীরালাল না বিবাহে, না মদে কোনোদিকেই দেশের উন্নতির একজ্যাম্পল্ সেট্

করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।" কিংবা "ছাপাখানার দেনা শুধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল।" কিংবা "অনেক পথচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে, তাহার কারণ কেহ কেহ অন্ধ যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না। বরং বলে, আ মলো। দেখতে পাস্নি, কানা নাকি? আমি ভাবিতাম, উভয়তঃ।" কিংবা অমরনাথের পরোপকার বৃত্তি সম্পর্কে বর্ণনায় ব্যঙ্গরসের পরিচয় পাওয়া যায়, দ্বিতীয় খণ্ড চতুর্থ পরিচ্ছেদে ;—"আর এক প্রকারে লোকের উপকারের ঢঙ উঠিয়াছে। তাহার এককথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয় 'বকাবকি লেখালেখি'। সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রেজলিউশন্, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন—আমি তাহাতে নহি।...এই রোগের আর একপ্রকার বিকার আছে—বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও, স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোয়ালে বাঁধা আছে, দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দাও, চরিয়া খাক্। আমার গোরু নাই, পরের গোয়ালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজী নই। আমি ততদূর আজও সুশিক্ষিত হই নাই।" অথবা শচীন্দ্রের বর্ণনার মধ্যে—"আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎ-কটাক্ষবর্ষিণী হইবে ; বংশ মর্যাদায় শাহ আলমের বা মল্লার রাও হুল্কারের প্র-পরাপ-সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে ; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময়ে পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময় হুঁকার কলিকা আছে কিনা বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কিনা, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে ; পিক্দানীতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি তাহার খবরদারি করিবে।...ঔষধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম করিয়া ডাকিতে হোসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্বদা সতর্ক থাকিবে। এমন কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি।"

Fun সম্পর্কে ডঃ অজিতকুমার ঘোষ বলেছেন—"যেখানে মানুষের স্বাভাবিক স্ফূর্তিপ্রবণতা বা আমোদপ্রিয়তা কোনো সূক্ষ্মতর কলাকৌশলের বা গভীর জীবনানুভূতির নিয়ন্ত্রণাধীন না হইয়া উদ্ভট অবস্থা ও অতিরঞ্জিত চরিত্র কল্পনার সহায়তায় আমাদের হাসির উপলক্ষ সৃষ্টি করে, সেখানে কৌতুক রসেরই প্রাধান্য।"

রজনী উপন্যাসে বৃদ্ধ রামসদয় ও তাঁর তরুণী ভার্যা লবঙ্গলতার দাম্পত্য জীবন

বর্ণনায় এই ধরনের কৌতুকরসের পরিচয় পাওয়া যায়। রজনী বর্ণিত প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে তার পরিচয় আছে।

অবশ্য আমরা আগেই বলেছি, রজনীর বর্ণনার মধ্যে যে সূক্ষ্ম রসোবোধ এবং বাগ্-বৈদগ্ধ্য প্রকাশ পেয়েছে, রজনীর মত অশিক্ষিতা নারীর পক্ষে এই ধরনের শব্দপ্রয়োগ অস্বাভাবিক বলেই মনে হয়। হাস্যরসের এই চার শ্রেণীর বিচিত্র রসসৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র যথেষ্ট সার্থকতা দেখিয়েছেন সত্য, কিন্তু রজনী-অমরনাথ বা শচীন্দ্র-লবঙ্গলতা ভাষা-ভঙ্গীতে এবং হাস্যরস সৃষ্টির বৈচিত্র্যে কোনো পার্থক্য আনতে পারেননি। হাস্যরসে বঙ্কিমচন্দ্র স্থূলতা বর্জন করেছেন। তার চেয়েও উল্লেযোগ্য রজনীর মত মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে কাহিনীর এই জটিলতার মধ্যেও বঙ্কিমচন্দ্রের এই হাস্যরস সৃষ্টি গুরুগম্ভীর কাহিনীর মধ্যে আলোকচ্ছটা বিকীর্ণ করে কাহিনীর একঘেয়েমি কাটিয়ে তাকে আকর্ষণীয় করে তুলেছে।)

উপসংহার

'রজনী' উপন্যাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা আমরা এখানেই শেষ করলাম। বঙ্কিম কবি-মানস এবং সেই পটভূমিকায় রজনী উপন্যাসের তাৎপর্য বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। তাছাড়া, মূল উপন্যাসের শেষে পরিচ্ছেদ ও খণ্ড পরিচিতি অংশে আমরা উপন্যাসের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করেছি। উনিশ শতকে যে সব প্রতিভাবান্ মনীষী বাঙলীর মানস-জীবনে গভীর-ভাবে প্রভাব বিস্তার করেছেন, বঙ্কিমচন্দ্রের নাম সে প্রসঙ্গে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিম-উপন্যাসের জনপ্রিয়তা আজও শুধু বাঙালী পাঠকের কাছে নয়, ভারতীয় পাঠকের কাছেও অক্ষুণ্ণ আছে। এই গ্রন্থ প্রকাশ ক'রে আমরা সেই ধ্রুপদী সাহিত্যিক কবি বঙ্কিমের প্রতি আমাদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করলাম।

বর্তমান আলোচনায় আমরা বিভিন্ন গ্রন্থকারের আলোচনা থেকে সাহায্য গ্রহণ করেছি। তাঁদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় পরম পূজনীয় ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, শ্রীপ্রমথনাথ বিশী, শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীশশাঙ্কশেখর বাগচী প্রভৃতির নাম। এঁরা সকলেই আমার শিক্ষাগুরু এবং শিক্ষক-স্থানীয়। অধ্যাপনা জীবনে এঁদের ঋণ সব সময় কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করি। গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি রচনায় আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছে আমার প্রাক্তন ছাত্র পরম কল্যাণীয় শ্রীমান্ ধ্রুবগোপাল মুখোপাধ্যায়, বি. এ.। তাকে জানাই আমার কল্যাণাশীর্বাদ।

বঙ্কিমচন্দ্র ও রজনী সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি, তা যদি বাঙলা সাহিত্যের

অনুরাগী পাঠক-পাঠিকাদের তৃপ্ত করে এবং ছাত্রছাত্রীদের উপকারে আসে নিজের শ্রম সার্থক জ্ঞান করবো। আলোচ্য গ্রন্থে যদি কোনো আলোচনা অসম্পূর্ণ থাকে, আমাকে জানালে পরবর্তী সংস্করণে তা পূর্ণতর করার বাসনা রইলো।

নিবেদন

বঙ্কিমচন্দ্রের

"রজনী"

(মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস)

অধ্যাপক শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

সম্পাদিত

Sri Bankimchandra Chatterjee's

Psych'ological Novel

"RAJANI"

Edited by Prof. Sukumar Banerjee

Price : Rupees Ten only.

শ্রীসুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গ্রন্থাবলী :

১।	তারাশঙ্কর তর্করত্নের	"কাদম্বরী" (২য় সং)।
২।	দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের	"মেবার পতন"।
৩।	" "	"চন্দ্রগুপ্ত" (২য় সং)।
৪।	" "	"সাজাহান"।
৫।	গিরিশচন্দ্র ঘোষের	"প্রফুল্ল"।
৬।	বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের	"রজনী"।
৭।	মধুসূদন দত্তের	"মেঘনাদবধ কাব্য" (যন্ত্রস্থ)

রজনী

[ষষ্ঠ সংস্করণ হইতে মুদ্রিত]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

বিজ্ঞাপন

রজনী প্রথমে বঙ্গদর্শনে প্রকাশিত হয়। এক্ষণে, পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে, এই গ্রন্থে এত পরিবর্ত্তন করা গিয়াছে যে, ইহাকে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ব্ববৎ আছে; অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে; কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে; অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।

এখন লর্ড লিটন-প্রণীত "Last Days of Pompeii" নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি 'কাণা ফুলওয়ালী' আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিক তত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য, তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্ম্মাণ করা গিয়াছে।

উপাখ্যানের অংশবিশেষ বা নায়ক-নায়িকাবিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে; উইল্‌কি কলিন্সকৃত 'Woman in White" নামক গ্রন্থপ্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার গুণ এই যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।

শ্রীবঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রজনী

প্রথম খণ্ড

রজনীর কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

তোমাদের সুখ-দুঃখে আমার সুখ-দুঃখ পরিমিত হইতে পারে না। তোমরা আর আমি ভিন্ন-প্রকৃতি। আমার সুখে তোমরা সুখী হইতে পারিবে না—আমার দুঃখ তোমরা বুঝিবে না—আমি একটি ক্ষুদ্র যূথিকার গন্ধে সুখী হইব, আর ষোলকলা শশী আমার লোচনাগ্রে সহস্র নক্ষত্রমণ্ডলমধ্যস্থ হইয়া বিকসিত হইলেও আমি সুখী হইব না। আমার উপাখ্যান কি তোমরা মন দিয়া শুনিবে? আমি জন্মান্ধ।

কি প্রকারে বুঝিবে? তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে তাই আলো। না জানি তোমাদের আলো কেমন।

তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই? তাহা নহে। সুখ-দুঃখ তোমার আমার প্রায় সমান। তুমি রূপ দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী। দেখ, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যূথিকা সকলের বৃন্তগুলি কত সূক্ষ্ম, আর আমার এই করস্থ সূচিকাগ্রভাগ আরও কত সূক্ষ্ম! আমি সূচিকাগ্রে এই ক্ষুদ্র পুষ্পবৃন্ত সকল বিদ্ধ করিয়া মালা গাঁথি—আশৈশব মালাই গাঁথিয়াছি—কেহ কখন আমার গাঁথা মালা পরিয়া বলে নাই যে, কাণায় মালা গাঁথিয়াছে।

আমি মালাই গাঁথিতাম। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে আমার পিতার একখানি পুষ্পোদ্যান জমা ছিল—তাহাই তাঁহার উপজীবিকা ছিল। ফাল্গুন মাস হইতে যত দিন ফুল ফুটিত, তত দিন পর্য্যন্ত পিতা প্রত্যহ তথা হইতে পুষ্পচয়ন করিয়া আনিয়া দিতেন, আমি মালা গাঁথিয়া দিতাম। পিতা তাহা লইয়া মহানগরীর পথে পথে বিক্রয় করিতেন। মাতা গৃহকর্ম্ম করিতেন। অবকাশমতে পিতা-মাতা উভয়েই আমার মালা গাঁথার সহায়তা করিতেন।

ফুলের স্পর্শ বড় সুন্দর – পরিতে বুঝি বড় সুন্দর হইবে—ঘ্রাণে পরম সুন্দর বটে। কিন্তু ফুল গাঁথিয়া দিন চলে না। অন্নের বৃক্ষে ফুল নাই, সুতরাং পিতা নিতান্ত দরিদ্র ছিলেন। মৃজাপুরে একখানি সামান্য খাপরেলের ঘরে বাস করিতেন। তাহারই এক প্রান্তে ফুল বিছাইয়া, ফুল স্তূপাকৃতি করিয়া ফুল ছড়াইয়া আমি ফুল গাঁথিতাম। পিতা বাহির হইয়া গেলে গান গাহিতাম।

"আমার এত সাধের প্রভাতে সই,
ফুটলো নাকো কলি—"

ও হরি—এখনও আমার বলা হয় নাই, আমি পুরুষ কি মেয়ে? তবে, এতক্ষণে যিনি না বুঝিয়াছেন, তাঁহাকে না বলাই ভাল; আমি এখন বলিব না।

পুরুষ হই, মেয়েই হই, অন্ধের বিবাহের বড় গোল। কাণা বলিয়া আমার বিবাহ হইল না। সেটা দুর্ভাগ্য কি সৌভাগ্য, যে চোখের মাথা না খাইয়াছে, সেই বুঝিবে। অনেক অপাঙ্গরঙ্গরঙ্গিণী আমার চিরকৌমার্য্যের কথা শুনিয়া বলিয়া গিয়াছে, "আহা, আমিও যদি কাণা হইতাম।"

বিবাহ না হউক—তাতে আমার দুঃখ ছিল না। আমি স্বয়ংবরা হইয়াছিলাম। একদিন পিতার কাছে কলিকাতার বর্ণনা শুনিতেছিলাম। শুনিলাম, মনুমেণ্ট বড় ভারি ব্যাপার, অতি উঁচু, অটল, অচল, ঝড়ে ভাঙ্গে না, গলায় চেন – একা একাই বাবু। মনে মনে মনুমেণ্টকে বিবাহ করিলাম। আমার স্বামীর চেয়ে বড় কে? অমি মনুমেণ্টমহিষী।

কেবল একটা বিবাহ নহে। যখন মনুমেণ্টকে বিবাহ করি, তখন আমার বয়স পনর বৎসর। সতের বৎসর বয়সে, বলিতে লজ্জা করে, সধবা অবস্থাতেই—আর একটা বিবাহ ঘটিয়া গেল। আমাদের বাড়ীর কাছে কালীচরণ বসু নামে এক জন কায়স্থ ছিল। চীনাবাজারে তাহার একখানি খেলনার দোকান ছিল। সে কায়স্থ—আমরাও কায়স্থ – সেই জন্য একটু আত্মীয়তা হইয়াছিল। কালী বসুর একটি চারি বৎসরের শিশুপুত্র ছিল। তাহার নাম বামাচরণ। বামাচরণ সর্ব্বদা আমাদের বাড়ী আসিত। এক দিন একটা বর বাজনা বাজাইয়া মন্দগামী ঝড়ের মত আমাদিগের বাড়ীর সম্মুখ দিয়া যায়। দেখিয়া বামাচরণ জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে ও?"

আমি বলিলাম, "ও বর।" বামাচরণ তখন কান্না আরম্ভ করিল—"আমি বল হব।"

তাহাকে কিছুতেই থামাইতে না পারিয়া বলিলাম, "কাঁদিস্ না, তুই আমার বর।" এই বলিয়া একটা সন্দেশ তাহার হাতে দিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেমন, তুই আমার বর হবি ?" শিশু সন্দেশ হাতে পাইয়া রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "হব।"

সন্দেশ সমাপ্ত হইলে, বালক ক্ষণেক কাল পরে বলিল, "হাঁ গা, বলেকি কলে গা ?" বোধ হয় তাহার ধ্রুব বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে, বরে বুঝি কেবল সন্দেশই খায়। যদি তা হয় তবে সে আর একটা আরম্ভ করিতে প্রস্তুত। ভাব বুঝিয়া আমি বলিলাম, "বরে ফুলগুলি গুছিয়ে দেয়।" বামাচরণ স্বামীর কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিয়া লইয়া, ফুলগুলি আমার হাতে গুছাইয়া তুলিয়া দিতে লাগিল। সেই অবধি আমি তাহাকে বর বলি, সে আমাকে ফুল গুছাইয়া দেয়।

আমার এই দুই বিবাহ—এখন এ কালের জটিলাকুটিলাদিগকে আমার জিজ্ঞাস্য—আমি সতী বলাইতে পারি কি ?

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

বড় বাড়ীতে ফুল যোগান বড় দায়। সে কালের মালিনী মাসী রাজবাড়ীতে ফুল যোগাইয়া মশানে গিয়াছিল। ফুলের মধু খেলে বিদ্যাসুন্দর, কিল খেলে হীরা মালিনী —কেন না, সে বড় বাড়ীতে ফুল যোগাইত। সুন্দরের সেই রামরাজ্য হইল—কিন্তু মালিনীর কিল আর ফিরিল না।

বাবা ত "বেলফুল" হাঁকিয়া রসিকমহলে ফুল বেচিতেন, মা দুই একটা অরসিক-মহলে ফুল নিত্য যোগাইতেন। তাহার মধ্যে রামসদয় মিত্রের বাড়ীই প্রধান। রামসদয় মিত্রের সাড়ে চারিটা ঘোড়া ছিল—(নাতিদের একটা পণি, আর আদত চারিটা) সাড়ে চারিটা ঘোড়া আর দেড়খানা গৃহিণী। এক জন আদত—এক জন চিররুগ্না এবং প্রাচীনা, তাঁহার নাম ভুবনেশ্বরী—কিন্তু তাঁর গলার সাঁই সাঁই শব্দ শুনিয়া রামমণি ভিন্ন অন্য নাম আমার মনে আসিত না।

আর যিনি পুরা একখানি গৃহিণী, তাঁহার নাম লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা লোকে বলিত, কিন্তু তাঁহার পিতা নাম রাখিয়াছিলেন—ললিতলবঙ্গলতা এবং রামসদয় বাবু

আদর করিয়া বলিতেন, "ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে।" রামসদয় বাবু প্রাচীন, বয়ঃক্রম ৬৩ বৎসর। ললিতলবঙ্গলতা নবীনা, বয়স ১৯ বৎসর। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী, আদরের আদরিণী, গৌরবের গৌরবিণী, মানের মানিনী, নয়নের মণি, ষোল আনা গৃহিণী। তিনি রামসদয়ের সিন্দুকের চাবি, বিছানার চাদর, পানের চূণ, গেলাসের জল। তিনি রামসদয়ের জ্বরে কুইনাইন, কাসিতে ইপিকা, বাতে ফ্লানেল এবং আরোগ্যে সুরুয়া।

নয়ন নাই—ললিতলবঙ্গলতাকে কখন দেখিতে পাইলাম না—কিন্তু শুনিয়াছি তিনি রূপসী। রূপ যাউক, গুণ শুনিয়াছি, লবঙ্গ বাস্তবিক গুণবতী। গৃহকার্য্যে নিপুণা, দানে মুক্তহস্তা, হৃদয়ে সরলা, কেবল বাক্যে বিষময়ী। লবঙ্গলতার অশেষ গুণের মধ্যে একটি এই যে, তিনি বাস্তবিক পিতামহের তুল্য সেই স্বামীকে ভালবাসিতেন—কোন নবীনা নবীন স্বামীকে সেরূপ ভালবাসেন কি না সন্দেহ। ভালবাসিতেন বলিয়া, তাঁহাকে নবীন সাজাইতেন।—সে সজ্জার রস কাহাকে বলি? আপন হস্তে নিত্য শুভ্রকেশে কলপ মাখাইয়া কেশগুলি রঞ্জিত করিতেন। যদি রামসদয় লজ্জার অনুরোধে কোন দিন মলমলের ধুতি পরিত, স্বহস্তে তাহা ত্যাগ করাইয়া কোকিলপেড়ে, ফিতে পেড়ে, কল্কা পেড়ে পরাইয়া দিতেন—মলমলের ধুতিখানি তৎক্ষণাৎ বিধবা দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিতেন। রামসদয় প্রাচীন বয়সে আতরের শিশি দেখিলে ভয়ে পলাইত—লবঙ্গলতা, তাহার নিদ্রাবস্থায় সর্ব্বাঙ্গে আতর মাখাইয়া দিতেন। রামসদয়ের চসমাগুলি লবঙ্গ প্রায় চুরি করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিত, সোণাটুকু লইয়া যাহার কন্যার বিবাহের সম্ভাবনা, তাহাকে দিত। রামসদয়ের নাক ডাকিলে, লবঙ্গ ছয়গাছা মল বাহির করিয়া পরিয়া ঘরময় ঝম্‌ঝম্ করিয়া রামসদয়ের নিদ্রা ভাঙ্গিয়া দিত।

লবঙ্গলতা আমাদের ফুল কিনিত—চার আনার ফুল লইয়া দুই টাকা মূল্য দিত। তাহার কারণ, আমি কাণা। মালা পাইলে লবঙ্গ গালি দিত, বলিত, "এমন কদর্য্য মালা আমাকে দিস কেন?" কিন্তু মূল্য দিবার সময় ডবল পয়সার সঙ্গে ভুল করিয়া টাকা দিত। ফিরাইয়া দিতে গেলে বলিত,—'ও আমার টাকা নয়,'—দুইবার বলিতে গেলে গালি দিয়া তাড়াইয়া দিত। তাহার দানের কথা মুখে আনিলে মারিতে আসিত। বাস্তবিক রামসদয় বাবুর ঘর না থাকিলে আমাদিগের দিনপাত হইত না। তবে যাহা রয় সয়,—তাই বলিয়া মাতা লবঙ্গের কাছে অধিক লইতেন না। দিনপাত হইলেই আমরা সন্তুষ্ট থাকিতাম। লবঙ্গলতা আমাদিগের নিকট রাশি রাশি ফুল কিনিয়া রামসদয়কে সাজাইত—সাজাইয়া বলিত, "দেখ রতিপতি।" রামসদয়

বলিত, "দেখ, সাক্ষাৎ—অঙ্গনানন্দন"। সেই প্রাচীনে নবীনে মনের মিল ছিল, দর্পণের মত দুই জনে দুই জনের মন দেখিতে পাইত। তাহাদের প্রেমের পদ্ধতিটা এইরূপ—

রামসদয় বলিত, ললিতলবঙ্গলতাপরিশী—?

লবঙ্গ। আজ্ঞে, ঠাকুরদাদা মহাশয়, দাসী হাজির!

রাম। আমি যদি মরি?

লবঙ্গ। "আমি তোমার বিষয় খাইব।" লবঙ্গ মনে মনে বলিত, "আমি বিষ খাইব।" রামসদয় তাহা মনে মনে জানিত।

লবঙ্গ এত টাকা দিত, তবে বড় বাড়ীতে ফুল যোগান দুঃখ কেন? শুন।

এক দিন মা'র জ্বর। অন্তঃপুরে বাবা যাইতে পারিবেন না—তবে আমি বৈ আর কে লবঙ্গলতাকে ফুল দিতে যাইবে? আমি লবঙ্গের জন্য ফুল লইয়া চলিলাম। অন্ধ হই, যা-ই হই—কলিকাতার রাস্তা সকল আমার নখদর্পণে ছিল। বেত্রহস্তে সর্ব্বত্র যাইতে পারিতাম, কখন গাড়ী-ঘোড়ার সম্মুখে পড়ি নাই। অনেক বার পথচারীর ঘাড়ে পড়িয়াছি বটে—তাহার কারণ, কেহ কেহ অন্ধ-যুবতী দেখিয়া সাড়া দেয় না, বরং বলে, "আ মলো দেখতে পাস্‌নি? কাণা না কি?" আমি ভাবিতাম "উভয়তঃ!"

ফুল লইয়া লবঙ্গের কাছে গেলাম। দেখিয়া লবঙ্গ বলিলেন, "কি লো কাণী—আবার ফুল লইয়া মরতে এসেছিস্ কেন?" কাণী বলিলে আমার হাড় জ্বলিয়া যাইত—আমি কি কদর্য্য উত্তর দিতে যাইতেছিলাম; এমন সময়ে সেখানে হঠাৎ কাহার পদধ্বনি শুনিলাম—কে আসিল। যে আসিল—সে বলিল, "এ কে ছোট মা?"

ছোট মা! তবে রামসদয়ের পুত্র। রামসদয়ের কোন্ পুত্র? বড় পুত্রের কণ্ঠ এক দিন শুনিয়াছিলাম, সে এমন অমৃত নহে—এমন করিয়া কর্ণবিবর ভরিয়া সুখ ঢালিয়া দেয় নাই। বুঝিলাম, এ ছোট বাবু।

ছোট মা বলিলেন,—এবার বড় মৃদুকণ্ঠে বলিলেন,—"ও কাণা ফুলওয়ালী।"

"ফুলওয়ালী? আমি বলি বা কোন ভদ্রলোকের মেয়ে।"

লবঙ্গ বলিলেন, "কেন গা, ফুলওয়ালী হইলে কি ভদ্রলোকের মেয়ে হয় না?"

ছোট বাবু অপ্রতিভ হইলেন। বলিলেন, "হবে না কেন? এটি ত ভদ্রলোকের মেয়ের মত বোধ হইতেছে। তা ওটি কাণা হ'লো কিসে?"

লবঙ্গ। ও জন্মান্ধ।

ছোট বাবু। দেখি ?

ছোট বাবুর বড় বিদ্যার গৌরব ছিল। তিনি অন্যান্য বিদ্যাও যেরূপ যত্নের সহিত শিক্ষা করিয়াছিলেন, অর্থের প্রত্যাশী না হইয়া চিকিৎসা-শাস্ত্রেও সেইরূপ যত্ন করিয়াছিলেন। লোকে রাষ্ট্র করিত যে, শচীন্দ্রবাবু (ছোট বাবু) কেবল দরিদ্রগণের বিনামূল্যে চিকিৎসা করিবার জন্য চিকিৎসা শিখিতেছিলেন। "দেখি" বলিয়া আমাকে বলিলেন, "একবার দাঁড়াও ত গা।"

আমি জড়সড় হইয়া দাঁড়াইলাম।

ছোট বাবু বলিলেন, "আমার দিকে চাও।" চাব কি ছাই!

"আমার দিকে চোখ ফিরাও।"

কাণা চোখে শব্দভেদী বাণ মারিলাম। ছোট বাবুর মনের মত হইল না, তিনি আমার দাড়ি ধরিয়া মুখ ফিরাইলেন।

ডাক্তারির কপালে আগুন জ্বেলে দি। সে চিবুকস্পর্শে আমি মরিলাম!

সে স্পর্শ পুষ্পময়। সেই স্পর্শে যূথী, জাতি, মল্লিকা, শেফালিকা, কামিনী, গোলাপ, সেউতি—সে ফুলের ঘ্রাণ পাইলাম—বোধ হইল, আমার আশে পাশে ফুল, আমার মাথায় ফুল, আমার পায়ে ফুল—আমার পরনে ফুল, আমার বুকের ভিতর ফুলের রাশি। আ মরি মরি! কোন বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল! বলিয়াছি ত, কাণার সুখ-দুঃখ তোমরা বুঝিবে না; আ মরি মরি—সে নবনীত-সুকুমার পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ! বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ, যার চোখ আছে সে বুঝিবে কি প্রকারে? আমার সুখ দুঃখ আমাতেই থাকুক, যখন সেই স্পর্শ মনে পড়িত, তখন কত বীণাধ্বনিবৎ কর্ণে শুনিতাম তাহা তুমি বিলোলকটাক্ষ-কুশলিনি কি বুঝিবে?

ছোট বাবু বলিলেন, "না, এ কাণা সারিবার নয়।"

আমার ত সেই জন্য ঘুম হইতেছিল না।

লবঙ্গ বলিল, "তা না সারুক, টাকা খরচ করিলে কাণার কি বিয়ে হয় না?"

ছোট বাবু। কেন, এর কি বিবাহ হয় নাই?

লবঙ্গ। না। টাকা খরচ করিলে হয়?

ছোট বাবু। আপনি কি উহার বিবাহের জন্য টাকা দিবেন?

লবঙ্গ রাগিল। বলিল, "এমন ছেলেও দেখি নাই। আমার কি টাকা রাখিবার জায়গা নাই? বিয়ে কি হয়, তাই জিজ্ঞাসা করিতেছি। মেয়েমানুষ সকল কথা ত জানে না। বিবাহ কি হয়?"

ছোট বাবু ছোট মাকে চিনিতেন। হাসিয়া বলিলেন, "তা মা, তুমি টাকা রেখো, আমি সম্বন্ধ করিব।"

মনে মনে ললিতলবঙ্গলতার মুণ্ডপাত করিতে করিতে আমি সেই স্থান হইতে পলাইলাম।

তাই বলিতেছিলাম, বড়মানুষের বাড়ী ফুল যোগান বড় দায়।

বহুমূর্ত্তিময়ি বসুন্ধরে! তুমি দেখিতে কেমন? তুমি যে অসংখ্য অচিন্তনীয় শক্তিধর, অনন্ত বৈচিত্র্য-বিশিষ্ট জড়পদার্থসকল হৃদয়ে ধারণ কর, সে সব দেখিতে কেমন? যাকে যাকে লোকে সুন্দর বলে, সে সব দেখিতে কেমন? তোমার হৃদয়ে যে অসংখ্য বহুপ্রকৃতি-বিশিষ্ট জন্তুগণ বিচরণ কবে, তারা সব দেখিতে কেমন? বল মা, তোমার হৃদয়ের সারভূত পুরুষজাতি দেখিতে কেমন? দেখাও মা, তাহার মধ্যে যাহার করস্পর্শে এত সুখ, সে দেখিতে কেমন? দেখা মা, দেখিতে কেমন দেখায়? দেখা কি? দেখা কেমন? দেখিলে কিরূপ সুখ হয়? এক মুহূর্ত্তের জন্য এই সুখময় স্পর্শ দেখিতে পাই না? দেখা মা! বাহিরের চক্ষু নিমীলিত থাকে—থাকুক মা! আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবাব অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি। সবাই দেখে–আমি দেখিব না কেন? বুঝি কীট পতঙ্গ অবধি দেখে, আমি কি অপরাধে দেখিতে পাই না? শুধু দেখা—কাবও ক্ষতি নাই, কারও কষ্ট নাই, কারও পাপ নাই, সবাই অবহেলে দেখে—কি দোষে আমি কখন দেখিব না?

না, না। অদৃষ্টে নাই। হৃদয়মধ্যে খুঁজিলাম, শুধু শব্দ, স্পর্শ, গন্ধ। আর কিছু পাইলাম না।

আমার অন্তর বিদীর্ণ করিয়া ধ্বনি উঠিতে লাগিল, কে দেখাবি দেখা গো—আমার রূপ দেখা! বুঝিল না! কেহই অন্ধের দুঃখ বুঝিল না।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেই অবধি আমি প্রায় প্রত্যহ রামসদয় মিত্রের বাড়ী ফুল বেচিতে যাইতাম। কিন্তু কেন, তাহা জানি না। যাহার নয়ন নাই, তাহার এ যত্ন কেন? সে দেখিতে পাইবে না, কেবল কথার শব্দ শুনিবার ভরসা মাত্র। কেন শচীন্দ্রবাবু আমার কাছে

আসিয়া কথা কহিবেন ? তিনি থাকেন সদরে—আমি যাই অন্তঃপুরে। যদি তাঁহার স্ত্রী থাকিত তবেও বা কখন আসিতেন। কিন্তু বৎসরেক পূর্ব্বে তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যু হইয়াছিল—আর বিবাহ করেন নাই, অতএব সে ভরসাও নাই। কদাচিৎ কোন প্রয়োজনে মাতাদিগের নিকট আসিতেন। আমি যে সময় ফুল লইয়া যাইব, তিনিও ঠিক সেই সময়ে আসিবেন, তাহারই বা সম্ভাবনা কি ? অতএব যে এক শব্দ শুনিবার মাত্র আশা, তাহাও যদি সফল হইত না, তথাপি অন্ধ প্রত্যহ ফুল লইয়া যাইত। কোন্ দুরাশায়, তাহা জানি না। নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিবার সময় প্রত্যহ ভাবিতাম, আমি কেন আসি ? প্রত্যহ মনে করিতাম, আর আসিব না। প্রত্যহই সে কল্পনা বৃথা হইত। প্রত্যহই আবার যাইতাম, যেন কে চুল ধরিয়া লইয়া যাইত। আবার নিরাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতাম, আবার প্রতিজ্ঞা করিতাম, যাইব না—আবার যাইতাম, এইরূপে দিন কাটিতে লাগিল।

মনে মনে আলোচনা করিতাম, কেন যাই ? শুনিয়াছি—স্ত্রীজাতি পুরুষের রূপে মুগ্ধ হইয়া ভালবাসে। আমি কাণা, কাহার রূপ দেখিয়াছি ? তবে কেন যাই ? কথা শুনিব বলিয়া ? কখন কেহ শুনিয়াছে যে, কোন রমণী শুধু কথা শুনিয়াই উন্মাদিনী হইয়াছে ? আমি কি তাই হইয়াছি ? তাও কি সম্ভব ? যদি তাই হয়, তবে বাদ্য শুনিবার জন্য বাদকের বাড়ী যাই না কেন ? সেতার, সারেঙ্গী, এসরাজ, বেহালার অপেক্ষা কি শচীন্দ্র সুকণ্ঠ ? সে কথা মিথ্যা।

তবে কি সেই স্পর্শ ? আমি যে কুসুমরাশি রাত্রি-দিবা লইয়া আছি, কখন পাতিয়া শুইতেছি, কখন বুকে চাপাইতেছি—ইহার অপেক্ষা তাহার স্পর্শ কোমল ? তা ত নয়। তবে কি ? এ কাণাকে কে বুঝাইবে, তবে কি ?

তোমরা বুঝ না, বুঝাইবে কি ? তোমাদের চক্ষু আছে, রূপ চেন, রূপই বুঝ। আমি জানি, রূপ দ্রষ্টার মানসিক বিকারমাত্র—শব্দও মানসিক বিকার। রূপ রূপবানে নাই। রূপ দর্শকের মনে—নহিলে এক জনকে সকলে সমান রূপবান্ দেখে না কেন ? এক জনে সকলেই আসক্ত হয় না কেন ? সেইরূপ শব্দও তোমার। রূপ দর্শকের একটি মনের সুখ মাত্র, শব্দও শ্রোতার একটি মনের সুখ মাত্র। স্পর্শও স্পর্শকের মনের সুখ মাত্র। যদি আমার রূপসুখের পথ বন্ধ থাকে, তবে শব্দ স্পর্শ, গন্ধ কেন রূপসুখের ন্যায় মনোমধ্যে সর্ব্বময় না হইবে ?

শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িলে কেন না সে উৎপাদিনী হইবে ? শুষ্ক কাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইলে কেন না সে জ্বলিবে ? রূপ হউক, শব্দে হউক, স্পর্শ হউক, শূন্য রমণী-হৃদয়ে সুপুরুষ-সংস্পর্শ হইলে কেন না প্রেম জন্মিবে ? দেখ, অন্ধকারেও ফুল ফুটে,

মেঘে ঢাকিলেও চাঁদ গগনে বিহার করে, জনশূন্য অরণ্যেও কোকিল ডাকে, যে সাগরগর্ভে মনুষ্য কখনও যাইবে না, সেখানেও রত্ন প্রভাসিত হয়, অন্ধের হৃদয়েও প্রেম জন্মে, আমার নয়ন বিরুদ্ধ বলিয়া হৃদয় কেন প্রস্ফুটিত হইবে না?

হইবে না কেন, কিন্তু সে কেবল আমার যন্ত্রণার জন্য। বোবার কবিত্ব কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, বধিরের সঙ্গীতানুরাগ যদি হয়, কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য, আপনার গীত আপনি শুনিতে পায় না। আমার হৃদয়ে প্রণয়সঞ্চার তেমনি যন্ত্রণার জন্য! পরের রূপ দেখিব কি—আমি আপনার রূপ কখন আপনি দেখিলাম না। রূপ! রূপ! আমার কি রূপ! এই ভূমণ্ডলে রজনী নামে ক্ষুদ্র বিন্দু কেমন দেখায়? আমাকে দেখিলে কখন কি কাহার আবার ফিরিয়া দেখিতে ইচ্ছা হয় নাই? এমন নিশাচর ক্ষুদ্র কেহ কি জগতে নাই যে, আমাকে সুন্দর দেখে? নয়ন না থাকিলে নারী সুন্দর হয় না—আমার নয়ন নাই—কিন্তু তবে কারিগরে পাতর, ক্ষোদিয়া চক্ষুশূন্য মূর্ত্তি গড়ে কেন? আমি কি কেবল সেইরূপ পাষাণী-মাত্র? তবে বিধাতা এ পাষাণমধ্যে এ সুখদুঃখ-সমাকুল প্রণয়-লালসা-পরবশ হৃদয় কেন পূরিল? পাষাণের দুঃখ পাইয়াছি, পাষাণের সুখ পাইলাম না, কেন? এ সংসারে এ তারতম্য কেন? অনন্ত দুষ্কৃতকারীও চক্ষে দেখে, আমি জন্ম-পূর্ব্বেই কোন্ দোষ করিয়াছিলাম যে, আমি চক্ষে দেখিতে পাইব না? এ সংসারে বিধাতা নাই—বিধান নাই, পাপ-পুণ্যের দণ্ডপুরস্কার নাই—আমি মরিব।

আমার এই জীবনে বহু বৎসর গিয়াছে—বহু বৎসর আসিতেও পারে। বৎসরে বৎসরে বহু দিবস—দিবসে দিবসে বহু দণ্ড দণ্ডে দণ্ডে বহু মুহূর্ত্ত—তাহার মধ্যে এক মুহূর্ত্ত জন্য, এক পলক জন্য আমার চক্ষু কি ফুটিবে না? এক মুহূর্ত্ত জন্য চক্ষু মেলিতে পারিলে দেখিয়া লই, এই শব্দস্পর্শময় বিশ্বসংসার কি—আমি কি—শচীন্দ্র কি?

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

আমি প্রত্যহই ফুল লইয়া যাইতাম, ছোট বাবুর কথার শব্দশ্রবণ প্রায় ঘটিত না। কিন্তু কদাচিৎ দুই এক দিন ঘটিত। সে আহ্লাদের কথা বলিতে পারি না। আমার বোধ হইত, বর্ষার জলভরা মেঘ যখন ডাকিয়া বর্ষে, তখন মেঘের বুঝি সেইরূপ

আহ্লাদ হয়, আমারও সেইরূপ ডাকিতে ইচ্ছা করিত। আমি প্রত্যহ মনে করিতাম, আমি ছোট বাবুকে কতগুলি বাছা ফুলের তোড়া বাঁধিয়া দিয়া আসিব—কিন্তু তাহা এক দিনও পরিলাম না। একে লজ্জা করিত—আবার মনে ভাবিতাম, ফুল দিলে তিনি দাম দিতে চাহিবেন, কি বলিয়া না লইব?—মনের দুঃখে ঘরে আসিয়া ফুল লইয়া ছোট বাবুকে গড়িতাম। কি গড়িতাম, তাহা জানি না—কখন দেখি নাই।

এ দিকে আমার যাতায়াতে একটি অচিন্তনীয় ফল ফলিতেছিল—আমি তাহার কিছুই জানিতাম না; পিতা-মাতার কথোপকথনে তাহা প্রথম জানিতে পারিলাম। একদিন সন্ধ্যার পর আমি মালা গাঁথিতে গাঁথিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। কি একটা শব্দে নিদ্রা ভাঙ্গিল। জাগরিত হইলে কর্ণে পিতা-মাতার কথোপকথনের শব্দ প্রবেশ করিল। বোধ হয়, প্রদীপ নিবিয়া গিয়া থাকিবে, কেন না, পিতা-মাতা আমার নিদ্রাভঙ্গ জানিতে পারিলেন, এমত বোধ হইল না। আমিও আমার নাম শুনিয়া কোন সাড়াশব্দ করিলাম না। শুনিলাম, মা বলিতেছেন, "তবে এক প্রকার স্থিরই হইয়াছে?"

পিতা উত্তর করিলেন, "স্থির বৈ কি? অমন বড় মানুষ লোকে কথা দিলে কি আর নড়চড় আছে? আর আমার মেয়ের দোষের মধ্যে অন্ধ, নইলে অমন মেয়ে লোকে তপস্যা করিয়া পায় না।"

মা। তা পরে এত করবে কেন?

পিতা। তুমি বুঝতে পার না যে, ওরা আমাদের মত টাকার কাঙ্গালী নয়—হাজার দুই হাজার টাকা ওরা টাকার মধ্যে ধরে না। যে দিন রজনীর সাক্ষাতে রামসদয় বাবুর স্ত্রী বিবাহের কথা প্রথম পাড়িলেন, সেই দিন হইতে রজনী তাঁহার কাছে প্রত্যহ যাতায়াত আরম্ভ করিল। তিনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, টাকায় কি কাণার বিয়ে হয়? ইহাতে অবশ্য মেয়ের মনে আশা-ভরসা হইতে পারে যে, বুঝি ইনি দয়াবতী হইয়া টাকা খরচ করিয়া আমার বিবাহ দিবেন। সে দিন হইতে রজনী নিত্য যায় আসে। সেই দিন হইতে নিত্য যাতায়াত দেখিয়া লবঙ্গ বুঝিলেন যে, মেয়েটি বিবাহের জন্য বড় কাতর হয়েছে—না হবে কেন, বয়স ত:হয়েছে! তাতে আবার ছোট বাবু টাকা দিয়া হরনাথ বসুকে রাজি করিয়াছেন। গোপালও রাজি হইয়াছেন।

হরনাথ বসু রামসদয় বাবুর বাড়ীর সরকার, গোপাল তাহার পুত্র। গোপালের কথা কিছু কিছু জানিতাম। গোপালের বয়স ত্রিশ বৎসর, একটি বিবাহ আছে, কিন্তু

সন্তানাদি হয় নাই। গৃহধর্ম্মার্থে তাঁহার গৃহিণী আছে—সন্তানার্থ অন্ধ পত্নীতে তাঁহার আপত্তি নাই। বিশেষ লবঙ্গ তাহাকে টাকা দিবে। পিতামাতার কথায় বুঝিলাম, গোপালের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ স্থির হইয়াছে—টাকার লোভে কুড়ি বৎসরের মেয়েও বিবাহ করিতে সে প্রস্তুত। টাকায় জাতি কিনিবে। পিতামাতা মনে করিলেন এ জন্মের মত অন্ধ কন্যা উদ্ধারপ্রাপ্ত হইল। তাঁহারা আহ্লাদ করিতে লাগিলেন। আমার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

তার পরদিন স্থির করিলাম, আর আমি লবঙ্গের কাছে যাইব না—মনে মনে তাহাকে শতবার পোড়ারমুখী বলিয়া গালি দিলাম। লজ্জায় মরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতে লাগিল। রাগে লবঙ্গকে মারিতে ইচ্ছা করিতে লাগিল। দুঃখে কান্না আসিতে লাগিল। আমি লবঙ্গের কি করিয়াছি যে, সে আমার উপর এত অত্যাচার করিতে উদ্যত? ভাবিলাম, যদি বড়মানুষ বলিয়া অত্যাচার করিয়াই সুখী হয়, তবে জন্মান্ধ দুঃখিনী ভিন্ন আর কি অত্যাচার করিবার পাত্র পাইল না? মনে করিলাম, না, আর এক দিন যাইব, তাহাকে এমনই করিয়া তিরস্কার করিয়া আসিব – তার পর আর ফুল বেচিব না – আর তাহার টাকা লইব না—মা যদি তাহাকে ফুল দিয়া মূল্য লইয়া আসেন, তবে তাহার টাকায় অন্ন ভোজন করিব না—না খাইয়া মরিতে হয়, সে-ও ভাল। ভাবিলাম, বলিব, বড়মানুষ হইলেই কি পরপীড়ন করিতে হয়? বলিব, আমি অন্ধ, অন্ধ বলিয়া কি দয়া হয় না? বলিব, পৃথিবীতে যাহার কোন সুখ নাই, তাহাকে নিরপরাধে কষ্ট দিয়া তোমার কি সুখ? যত ভাবি এই এই বলিব, তত আপনার চক্ষের জলে আপনি ভাসি। মনে এই ভয় হইতে লাগিল, পাছে বলিবার সময় কথাগুলি ভুলিয়া যাই।

যথাসময়ে আবার রামসদয় বাবুর বাড়ী চলিলাম। ফুল লইব না মনে করিয়াছিলাম—কিন্তু শুধু হাতে যাইতে লজ্জা করিতে লাগিল—কি বলিয়া গিয়া বসিব? পূর্ব্ব মত কিছু ফুল লইলাম। কিন্তু আজি মাকে লুকাইয়া গেলাম।

ফুল দিলাম—তিরস্কার করিব বলিয়া লবঙ্গের কাছে বসিলাম। কি বলিয়া প্রসঙ্গ উত্থাপন করিব? হরি! হরি! কি বলিয়া আরম্ভ করিব? গোড়ার কথা কোন্‌টা? যখন চারিদিকে আগুন জ্বলিতেছে আগে কোন দিক্ নিবাইব? কিছুই বলা হইল না। কথা পাড়িতেই পারিলাম না। কান্না আসিতে লাগিল।

ভাগ্যক্রমে লবঙ্গ আপনি প্রসঙ্গ তুলিল, "কাণি—তোর বিয়ে হবে!"

আমি জ্বলিয়া উঠিলাম; বলিলাম, "ছাই হবে।"

লবঙ্গ বলিল, "কেন ছোট বাবু বিবাহ দেওয়াইবেন—হবে না কেন?"

আরও জ্বলিলাম, বলিলাম, "কেন আমি তোমাদের কাছে কি দোষ করেছি?"

লবঙ্গও রাগিল। বলিল, "আঃ! মলো! তোর কি বিয়ের মন নাই না কি?"

আমি মাথা নাড়িয়া বলিলাম, "না।"

লবঙ্গ আরও রাগিল, বলিল, 'পাপিষ্ঠা কোথাকার! বিয়ে কর্‌বি না কেন?"

আমি বলিলাম, "খুসি।"

লবঙ্গের মনে বোধ হয় সন্দেহ হইল—আমি ভ্রষ্টা—নহিলে বিবাহে অসম্মত কেন? সে বড় রাগ করিয়া বলিল, "আঃ মলো! বেরো বলিতেছি—নহিলে খেঙরা মারিয়া বিদায় করিব।"

আমি উঠিলাম—আমার দুই অন্ধ চক্ষে জল পড়িতেছিল। তাহা লবঙ্গকে দেখাইলাম না—ফিরিলাম। গৃহে যাইতেছিলাম, সিঁড়িতে আসিয়া একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলাম, কৈ, তিরস্কারের কথা কিছুই বলা হয় নাই। অকস্মাৎ কাহার পদশব্দ শুনিলাম। অন্ধের শ্রবণশক্তি অনৈসর্গিক প্রখরতা প্রাপ্ত হয়—আমি দুই এক বার সে পদশব্দ শুনিয়াই চিনিয়াছিলাম, কাহার পদবিক্ষেপের শব্দ। আমি সিঁড়িতে বসিলাম। ছোট বাবু আমার নিকটে আসিলেন, আমাকে দেখিয়া দাঁড়াইলেন। বোধ হয়, আমার চক্ষের জল দেখিতে পাইয়াছেন, জিজ্ঞাসা করিলেন, "কে রজনি!"

সকল ভুলিয়া গেলাম! রাগ ভুলিলাম, অপমান ভুলিলাম, দুঃখ ভুলিলাম, কাণে বাজিতে লাগিল, "কে রজনি!" আমি উত্তর করিলাম না। মনে করিলাম, আর দুই একবার জিজ্ঞাসা করুন, আমি শুনিয়া কান জুড়াই।

ছোট বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন "রজনি, কাঁদিতেছ কেন?"

আমার অন্তর আনন্দে ভরিতে লাগিল। চক্ষের জল আরও উছলিতে লাগিল। আমি কথা কহিলাম না, আরও জিজ্ঞাসা করুন। মনে করিলাম, আমি কি ভাগ্যবতী! বিধাতা আমায় কাণা করিয়াছেন, কালা করেন নাই।

তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন কাঁদিতেছ? কেহ কিছু বলিয়াছে?"

আমি সেবার উত্তর করিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে সুখ যদি জন্মে একবার ঘটিতেছে—তবে ত্যাগ করি কেন? আমি বলিলাম, "ছোট মা তিরস্কার করিয়াছেন।"

ছোট বাবু হাসিলেন। বলিলেন, "ছোট মা'র কথা ধরিও না, তাঁর মুখ ঐ রকম—কিন্তু মনে রাগ করেন না। তুমি আমার সঙ্গে এস, এখনই তিনি আবার ভাল কথা বলিবেন।"

তাঁহার সঙ্গে কেন না যাইব? তিনি ডাকিলে কি আর রাগ থাকে? আমি উঠিলাম। তাঁহার সঙ্গে চলিলাম। তিনি সিঁড়িতে উঠিতে লাগিলেন, আমিও পশ্চাৎ পশ্চাৎ উঠিতেছিলাম। তিনি বলিলেন, "তুমি দেখতে পাও না, সিঁড়িতে উঠ কিরূপে? না পার, আমি হাত ধরিয়া লইয়া যাইতেছি।"

আমার গা কাঁপিয়া উঠিল। সর্ব্বশরীরে রোমাঞ্চ হইল। তিনি আমার হাত ধরিলেন। হউন না—লোকে নিন্দা করে করুক, আমার নারীজন্ম সার্থক হউক, আমি পরের সাহায্য ব্যতীত কলিকাতার গলি গলি বেড়াইতে পারি, কিন্তু ছোট বাবুকে নিষেধ করিলাম না। ছোট বাবু— বলিব কি? কি বলিয়া বলিব— উপযুক্ত কথা পাই না—ছোট বাবু হাত ধরিলেন।

যেন একটি প্রভাত-প্রফুল্ল-পদ্ম, দলগুলি দ্বারা আমার প্রকোষ্ঠ বেড়িয়া ধরিল—যেন গোলাপের মালা গাঁথিয়া কে আমার হাতে বেড়িয়া দিল। আমার আর কিছু মনে নাই। বুঝি সেই সময় ইচ্ছা হইয়াছিল— এখন মরি না কেন? বুঝি তখন, গলিয়া জল হইয়া যাইতে ইচ্ছা করিয়াছিল—বুঝি ইচ্ছা করিয়াছিল, শচীন্দ্র আর আমি দুইটি ফুল হইয়া এইরূপ সংস্পৃষ্ট হইয়া কোন বন্যবৃক্ষে গিয়া একটি বোঁটায় ঝুলিয়া থাকি। আর কি মনে হইয়াছিল, তাহা মনে নাই। যখন সিঁড়ির উপর উঠিয়া ছোট বাবু হাত ছাড়িয়া দিলেন,— তখন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিলাম— এ সংসার আবার মনে পড়িল—সেই সঙ্গে মনে পড়িল— "কি করিলে প্রাণেশ্বর! না বুঝিয়া কি করিলে! তুমি আমার পাণি গ্রহণ করিয়াছ। এখন তুমি আমায় গ্রহণ কর না কর—তুমি আমার স্বামী, আমি তোমার পত্নী। ইহজন্মে অন্ধ ফুলওয়ালীর আর কেহ স্বামী হইবে না।"

সেই সময় কি পোড়া লোকের চোখ পড়িল? বুঝি তাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

ছোট বাবু ছোট মা'র কাছে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "রজনীকে কি বলিয়াছ গা! সে কাঁদিতেছে।" ছোট মা আমার চক্ষে জল দেখিয়া অপ্রতিভ হইলেন—আমাকে ভাল কথা বলিয়া কাছে বসাইলেন—বয়োজ্যেষ্ঠ সপত্নীপুত্রের কাছে সকল কথা ভাঙ্গিয়া বলিতে পারিলেন না। ছোট বাবু ছোট মাকে প্রসন্ন দেখিয়া নিজ প্রয়োজনে বড় মা'র কাছে চলিয়া গেলেন। আমিও বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম।

এ দিকে গোপাল বাবুর সঙ্গে আমার বিবাহের উদ্যোগ হইতে লাগিল। দিন স্থির হইল। আমি কি করিব? ফুল গাঁথা বন্ধ করিয়া দিবারাত্রি কিসে এ বিবাহ বন্ধ করি—সেই চিন্তা করিতে লাগিলাম। বিবাহে মাতার আনন্দ, পিতার উৎসাহ, লবঙ্গলতার যত্ন, ছোট বাবু ঘটক! এই কথাটি সর্ব্বাপেক্ষা কষ্টদায়ক—ছোট বাবু ঘটক! আমি একা, অন্ধ, কি প্রকারে ইহার প্রতিবন্ধকতা করিব? কোন উপায় দেখিতে পাইলাম না। মালা গাঁথা বন্ধ হইল। মাতা-পিতা মনে করিলেন বিবাহ-আনন্দে আমি বিহ্বল হইয়া মালা গাঁথা ত্যাগ করিয়াছি।

ঈশ্বর আমাকে এক সহায় আনিয়া দিলেন। বলিয়াছি, গোপাল বসুর বিবাহ ছিল—তাঁহার পত্নীর নাম চাঁপা—বাপ রেখেছিল, চম্পকলতা। চাঁপাই কেবল এ বিবাহে অসম্মত। চাঁপা একটু শক্ত মেয়ে। যাহাতে ঘরে সপত্নী না হয়, তাহার চেষ্টার কিছু ত্রুটি করিল না।

হীরালাল নামে চাঁপার এক ভাই ছিল—চাঁপার অপেক্ষা দেড় বৎসরের ছোট। হীরালাল মদ খায়—তাহাও অল্প মাত্রায় নহে। শুনিয়াছি, গাঁজাও টানে। তাহার পিতা তাহাকে লেখাপড়া শিখান নাই—কোন প্রকারে সে হস্তাক্ষরটি প্রস্তুত করিয়াছিল মাত্র, তথাপি রামসদয় বাবু তাহাকে কোথা কেরাণীগিরি করিয়া দিয়াছিলেন। মাতলামির দোষে সে চাকরীটি গেল। হরনাথ বসু, তাহার দমে ভুলিয়া লাভের আশায় তাহাকে দোকান করিয়া দিলেন। দোকানে লাভ দূরে থাক, দেনা পড়িল—দোকান উঠিয়া গেল। তারপর কোন গ্রামে বার টাকা বেতনে হীরালাল মাষ্টার হইয়া গেল। সে গ্রামে মদ পাওয়া যায় না বলিয়া হীরালাল পলাইয়া আসিল। তারপর সে এক খানা খবরের কাগজ করিল। দিন কতক তাহাতে খুব লাভ হইল, বড় পসার জাঁকিল, কিন্তু অশ্লীলতা দোষে পুলিশ টানাটানি আরম্ভ করিল। ভয়ে হীরালাল কাগজ ফেলিয়া রূপোষ হইল। কিছু দিন পরে হীরালাল আবার হঠাৎ ভাসিয়া উঠিয়া ছোট বাবুর মোসাহেবী করিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু ছোট বাবুর কাছে মদের চাল নাই দেখিয়া আপনা-আপনি সরিল। অনন্যোপায় হইয়া নাটক লিখিতে আরম্ভ করিল। নাটক একখানিও বিক্রয় হইল না। তবে ছাপাখানার দেনা শুধিতে হয় না বলিয়া সে যাত্রা রক্ষা পাইল। এক্ষণে এ ভবসংসারে আর কূল-কিনারা না দেখিয়া হীরালাল চাঁপা-দিদির আঁচল ধরিয়া বসিয়া রহিল।

চাঁপা হীরালালকে স্বকার্য্যোদ্ধার জন্য নিয়োজিত করিল। হীরালাল ভগিনীর

কাছে সবিশেষ শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "টাকার কথা সত্য ত? যেই, কাণীকে বিবাহ করিবে, সেই টাকা পাইবে?"

চাঁপা সেই বিষয়ে সন্দেহ ভঞ্জন করিল। হীরালালের টাকা বড় দরকার। সে তখনই আমার পিতৃভবনে আসিয়া দর্শন দিল। পিতা তখন বাড়ী ছিলেন; আমি তখন সেখানে ছিলাম না। আমি নিকটস্থ অন্য ঘরে ছিলাম—অপরিচিত পুরুষে পিতার সঙ্গে কথা কহিতেছে, কণ্ঠস্বরে জানিতে পারিয়া কাণ পাতিয়া কথাবার্ত্তা শুনিতে লাগিলাম, হীরালালের কি কর্কশ কদর্য্য স্বর!

হীরালাল বলিতেছে, "সতীনের উপর কেন মেয়ে দিবে?"

পিতা দুঃখিতভাবে বলিলেন, "কি করি। না দিলে ত বিয়ে হয় না—এত কাল ত হলো না।"

হীরালাল। কেন, কেন, তোমার মেয়ের বিবাহের ভাবনা কি?

পিতা হাসিলেন, বলিলেন, "আমি গরীব ফুল বেচিয়া খাই আমার মেয়ে কে বিবাহ করিবে? তাতে আমার কাণা মেয়ে তাতে আবার বয়সও ঢের হয়েছে।"

হীরা। কেন, পাত্রের অভাব কি? আমায় বলিলে আমি বিয়ে করি। এখন বয়স্থা মেয়ে ত লোকে চায়। আমি যখন স্বশ্চভিশ্চুশাৎ পত্রিকার এডিটার ছিলাম, তখন আমি মেয়ে বড় করিয়া বিবাহ দিবার জন্য কত আর্টিকেল লিখেছি -পড়িয়া আকাশের মেঘ ডেকে উঠেছিল। বাল্যবিবাহ! ছি! ছি! মেয়ে ত বড় করিয়াই বিবাহ দিবে। এসো! আমাকে দেশের উন্নতির একজাম্পল সেট্ করিতে দাও—আমিই এ মেয়ে বিবাহ করিব।

আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি। পিতা ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন। এত বড় পণ্ডিত জামাই হাতছাড়া হয় ভাবিয়া শেষে একটু দুঃখিত হইলেন। শেষে বলিলেন, "এখন কথা ধার্য্য হইয়া গিয়াছে, এখন আর নড়চড় হয় না, বিশেষ এ বিবাহের কর্ত্তা শচীন্দ্র বাবু। তাঁহারাই বিবাহ দিতেছেন। তাঁহারা যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তাঁহারাই গোপাল বাবুর সঙ্গে সম্বন্ধ করিয়াছেন।"

হীরা। তাহাদের মতলব তুমি কি বুঝিবে? বড়মানুষের চরিত্রের অন্ত পাওয়া ভার। তাহাদের বড় বিশ্বাস করিও না।

এই বলিয়া হীরালাল চুপি চুপি কি বলিল, তাহা শুনিতে পাইলাম না! পিতা বলিলেন, "সে কি? না—আমার কাণা মেয়ে।"

হীরালাল তৎকালে ভগ্নমনোরথ হইয়া ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল।

চারিদিক দেখিয়া বলিল, "তোমার ঘরে মদ নাই, বটে হে ?" পিতা বিস্মিত হইলেন ; বলিলেন, "মদ ! কি জন্য রাখিব ?"

হীরালাল মদ নাই জানিয়া বিজ্ঞের ন্যায় বলিল, "সাবধান করিয়া দিবার জন্য বল্‌ছিলাম। এখন ভদ্রলোকের সঙ্গে কুটম্বিতা করিতে চলিলে ওগুলো যেন না থাকে।"

কথাটা পিতার বড় ভাল লাগিল না। তিনি চুপ করিয়া রহিলেন। হীরালাল না বিবাহে, না মদে, কোন দিকেই দেশের উন্নতির একজাম্পল্ সেট্ করিতে না পারিয়া ক্ষুণ্নমনে বিদায় হইল।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিবাহের দিন অতি নিকট হইল—আর এক দিনমাত্র বিলম্ব আছে। উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। চারিদিক হইতে উচ্ছ্বসিত বারিরাশি গর্জ্জিয়া আসিতেছে— নিশ্চিত ডুবিব।

তখন লজ্জায় জলাঞ্জলি দিয়া, মাতার পায়ে আছড়াইয়া কাঁদিতে লাগিলাম— যোড়হাত করিয়া বলিলাম, "আমার বিবাহ দিও না—আমি আইবুড়ো থাকিব।"

মা বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কেন ? কেন ?" তাহার উত্তর দিতে পারিলাম না। কেবল যোড়হাত করিতে লাগিলাম—কেবল কাঁদিতে লাগিলাম। মাতা বিরক্ত হইলেন, রাগিয়া উঠিলেন, গালি দিলেন। শেষে পিতাকে বলিয়া দিলেন। পিতাও গালি দিয়া মারিতে আসিলেন। আর কিছু বলিতে পারিলাম না।

উপায় নাই। নিষ্কৃতি নাই। ডুবিলাম।

সেই দিন বৈকালে কেবল গৃহে আমি একা ছিলাম—পিতা বিবাহের খরচ সংগ্রহে গিয়াছেন,—মাতা দ্রব্য সামগ্রী কিনিতে গিয়াছিলেন। এ সব যে সময় হয়, সে সময়ে আমি দ্বার দিয়া থাকিতাম না হয় বামাচরণ আমার কাছে বসিয়া থাকিত। বামাচরণ এই দিন বসিয়াছিল। এক জন কে দ্বার ঠেলিয়া গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল। চেনা পায়ের শব্দ নহে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে গা।"

উত্তর, "তোমার যম।"

কথা কোপযুক্ত বটে, কিন্তু স্বর স্ত্রীলোকের। ভয় পাইলাম না। হাসিয়া বলিলাম—"আমার কি যম আছে ? তবে এত দিন কোথায় ছিলে ?"

স্ত্রীলোকটির রাগ-শান্তি হইল না। "এখন জান্‌বি। বড় বিয়ের সাধ! পোড়ারমুখী! আবাগী!" ইত্যাদি গালির ছড়া আরম্ভ হইল। গালি সমাপ্তে সেই মধুরভাষিণী বলিলেন, "হাঁ দেখ, কাণি, যদি আমার স্বামীর সঙ্গে তোর বিয়ে হয়, তবে যে দিন তুই ঘর করিতে যাইবি, সেই দিন তোকে বিষ খাওয়াইয়া মারিব।"

বুঝিলাম, চাঁপা খোদ। আদর করিয়া বসিতে বলিলাম। বলিলাম, "শুন তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

এত গালির উত্তরে সাদর-সম্ভাষণ দেখিয়া চাঁপা একটু শীতল হইয়া বসিল।

আমি বলিলাম, "শুন, এ বিবাহে তুমি যেমন বিরক্ত, আমিও তেমনি। আমার এ বিবাহ যাহাতে না হয়, আমি তাহাই করিতে রাজি আছি। কিসে বিবাহ বন্ধ হয়, তাহার উপায় বলিতে পার?"

চাঁপা বিস্মিত হইল। বলিল, "তা তোমার বাপ-মাকে বল না কেন?"

আমি বলিলাম, "হাজার বার বলিয়াছি। কিছু হয় নাই।"

চাঁপা। বাবুদের বাড়ীতে গিয়া তাঁহাদের হাতে-পায়ে ধর না কেন?

আমি। তাতেও কিছু হয় নাই।

চাঁপা একটু ভাবিয়া বলিল, "তবে এক কাজ করিবি?"

আমি। কি?

চাঁপা। তুই দিন লুকাইয়া থাকিবি?

আমি। কোথায় লুকাইব? আমার স্থান কোথায় আছে?

চাঁপা আবার একটু ভাবিল। বলিল, "আমার বাপের বাড়ী গিয়া থাকিবি?"

ভাবিলাম, মন্দ কি? আর ত উদ্ধারের কোন উপায় দেখি না। বলিলাম, "আমি কাণা নূতন স্থানে আমাকে কে পথ চিনাইয়া লইয়া যাইবে? তাহারাই বা স্থান দিবে কেন?"

চাঁপা আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্ত্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল; সে বলিল, "তোর তা ভাবিতে হইবে না। সে সব বন্দোবস্ত আমি করিব! আমি সঙ্গে লোক দিব, আমি তাদের বলিয়া পাঠাইব। তুই যাস ত বল্?"

মজ্জনোন্মুখের সমীপবর্ত্তী কাষ্ঠফলকবৎ এই প্রবৃত্তি আমার চক্ষে একমাত্র রক্ষার উপায় বলিয়া বোধ হইল। আমি সম্মত হইলাম।

চাঁপা বলিল, "আচ্ছা, তবে তুই ঠিক থাকিস্। রাত্রে সবাই ঘুমাইলে আমি আসিয়া দ্বারে টোকা মারিব, বাহির হইয়া আসিস্।"

আমি সম্মত হইলাম।

রাত্রি দ্বিতীয় প্রহরে দ্বারে ঠক্‌ঠক্ করিয়া অল্প শব্দ হইল। আমি জাগ্রত ছিলাম। দ্বিতীয় বস্ত্রমাত্র লইয়া আমি দ্বারোদ্ঘাটনপূর্ব্বক বাহির হইলাম। বুঝিলাম, চাঁপা দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সঙ্গে চলিলাম। একবার ভাবিলাম না, একবার বুঝিলাম না যে, কি দুষ্কর্ম্ম করিতেছি! পিতা-মাতার জন্য মন কাতর হইল বটে, কিন্তু তখন মনে মনে বিশ্বাস ছিল যে, অল্প দিনের জন্য যাইতেছি। বিবাহের কথা নিবৃত্তি পাইলেই আবার আসিব।

আমি চাঁপার গৃহে—আমার শ্বশুরবাড়ী?—উপস্থিত হইলে চাঁপা আমায় সত্বই লোক সঙ্গে দিয়া বিদায় করিল—পাছে তাহার স্বামী জানিতে পারে, এই ভয়ে বড় তাড়াতাড়ি করিল—যে লোক সঙ্গে দিল, তাহার সঙ্গে যাওয়ার পক্ষে আমার বিশেষ আপত্তি—কিন্তু চাঁপা এমনি তাড়াতাড়ি করিল যে, আমার আপত্তি ভাসিয়া গেল। মনে কর, কাহাকে আমার সঙ্গে দিল?

হীরালালকে।

হীরালালের মন্দ চরিত্রের কথা তখন আমি কিছুই জানিতাম না। সে জন্য আপত্তি করি নাই। সে যুবা পুরুষ আমি যুবতী—তাহার সঙ্গে কি প্রকারে একা যাইব? এই আপত্তি। কিন্তু তখন আমার কথা কে শুনে? আমি অন্ধ, পথ অপরিচিত, রাত্রে আসিয়াছি—সুতরাং পথে যে সকল শব্দঘটিত চিহ্ন চিনিয়া রাখিয়া আসিয়া থাকি, সে সকল কিছু শুনিতে পাই নাই—অতএব বিনাহারে বিনা সহায়ে বাড়ী ফিরিয়া যাইতে পারিলাম না—বাড়ী ফিরিয়া গেলেও সেই পাপ-বিবাহ! অগত্যা হীরালালের সঙ্গে যাইতে হইল। তখন মনে হইল—আর কেহ অন্ধের সহায় থাক না থাক—মাথার উপর দেবতা আছেন, তাঁহারা কখনও লবঙ্গলতার ন্যায় পীড়িতকে পীড়ন করিবেন না; তাঁহাদের দয়া আছে, শক্তি আছে, অবশ্য দয়া করিয়া আমাকে রক্ষা করিবেন—নহিলে দয়া কার জন্য?

তখন জানিতাম না যে, ঐশিক নিয়ম বিচিত্র – মনুষ্যের বুদ্ধির অতীত—আমরা যাহাকে দয়া বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা দয়া নহে। আমরা যাহাকে পীড়ন বলি, ঈশ্বরের অনন্ত জ্ঞানের কাছে তাহা পীড়ন নহে। তখন জানিতাম না যে, এই সংসারের অনন্ত চক্র দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য, যে চক্র নিয়মিত পথে অনতিক্ষুণ্ণ রেখায় অহরহঃ চলিতেছে, তাহার দারুণ বেগের পথে যে পড়িবে—অন্ধ হউক, খঞ্জ হউক, আর্ত্ত হউক, সেই পিষিয়া মরিবে। আমি অন্ধ নিঃসহায় বলিয়া, অনন্ত সংসারচক্রপথ ছাড়িয়া চলিব কেন?

হীরালালের সঙ্গে প্রশস্ত রাজপথে বাহির হইলাম—তাহার পদশব্দ অনুসরণ করিয়া চলিলাম—কোথাকার ঘড়ীতে একটা বাজিল। পথে কেহ নাই—কোথাও শব্দ নাই, দুই একখানা গাড়ীর শব্দ—দুই এক জন সুরাপহৃতবুদ্ধি কামিনীর অসম্বদ্ধ গীতিশব্দ। আমি হীরালালকে সহসা জিজ্ঞাসা করিলাম—"হীরালাল বাবু আপনার গায়ে জোর কেমন?"

হীরালাল একটু বিস্মিত হইল—বলিল, "কেন?"

আমি বলিলাম, "জিজ্ঞাসা করি।"

হীরালাল বলিল, "তা মন্দ নয়।"

আমি। তোমার হাতে কিসের লাঠি?

হীরা। তালের।

আমি। ভাঙ্গিতে পার?

হীরা। সাধ্য কি?

আমি। আমার হাতে দাও দেখি।

হীরালাল আমার হাতে লাঠি দিল। আমি তাহা ভাঙ্গিয়া দ্বিখণ্ড করিলাম। হীরালাল আমার বল দেখিয়া বিস্মিত হইল। আমি আধখানা তাহাকে দিয়া আধখানা আপনি রাখিলাম। তাহার লাঠি ভাঙ্গিয়া দিলাম দেখিয়া হীরালাল রাগ করিল। আমি বলিলাম—"আমি এখন নিশ্চিন্ত হইলাম—রাগ করিও না। তুমি আমার বল দেখিলে,—আমার হাতে এই আধখানা লাঠি দেখিলে—তোমার ইচ্ছা থাকিলেও তুমি আমার উপর কোন অত্যাচার করিতে সাহস করিবে না।"

হীরালাল চুপ করিয়া রহিল।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

হীরালাল জগন্নাথের ঘাটে গিয়া নৌকা করিল। রাত্রিকালে দক্ষিণা বাতাসে পাল দিল। সে বলিল, তাহাদের পিত্রালয় হুগলী। আমি তাহা জিজ্ঞাসা করিতে ভুলিয়া গিয়াছিলাম।

পথে হীরালাল বলিল, "গোপালের সঙ্গে তোমার বিবাহ ত হইবে না—আমায় বিবাহ কর।"

আমি বলিলাম, "না।"

হীরালাল বিচার আরম্ভ করিল। তাহার যত্ন যে,—বিচারের দ্বারা প্রতিপন্ন করে যে, তাহার ন্যায় সৎপাত্র পৃথিবীতে দুর্ল্লভ, আমার ন্যায় কুপাত্রীও পৃথিবীতে দুর্ল্লভ। আমি উভয়ই স্বীকার করিলাম—তথাপি বলিলাম যে, "না, তোমাকে বিবাহ করিব না।"

তখন হীরালাল বড় ক্রুদ্ধ হইল। বলিল, "কাণাকে কে বিবাহ করিতে চাহে?" এই বলিয়া নীরব হইল। উভয়ে নীরব রহিলাম - এইরূপে রাত্রি কাটিতে লাগিল।

তাহার পর শেষ-রাত্রে হীরালাল অকস্মাৎ মাঝিদিগকে বলিল, "এইখানে ভিড়ো।" মাঝিরা নৌকা লাগাইল—নৌকাতলে ভূমিস্পর্শের শব্দ শুনিলাম। হীরালাল আমাকে বলিল, "নাম—আসিয়াছি।" সে আমার হাত ধরিয়া নামাইল। আমি কূলে দাঁড়াইলাম।

তাহার পর শব্দ শুনিলাম, যেন হীরালাল আবার নৌকায় উঠিল। মাঝিদিগকে বলিল, "দে, নৌকা খুলিয়া দে, নৌকা খুলিয়া দে।" আমি বলিলাম, "সে কি? আমাকে নামাইয়া দিয়া নৌকা খুলিয়া দাও কেন?"

হীরালাল বলিল, "আপনার পথ আপনি দেখ!" মাঝিরা নৌকা খুলিতে লাগিল, দাঁড়ের শব্দ শুনিলাম। আমি তখন কাতর হইয়া বলিলাম, "তোমার পায়ে পড়ি, আমি অন্ধ—যদি একান্তই আমাকে ফেলিয়া যাইবে, তবে কাহারও বাড়ী পর্য্যন্ত আমাকে রাখিয়া দিয়া যাও। আমি ত এখানে কখনও আসি নাই—এখানকার পথ চিনিব কি প্রকারে?"

হীরালাল বলিল, "আমাকে বিবাহ করিতে সম্মত আছ?"

আমার কান্না আসিল। ক্ষণেক রোদন করিলাম, রাগে হীরালালকে বলিলাম, "তুমি যাও। তোমার কাছে কোন উপকার পাইতে নাই—রাত্রি প্রভাত হইলে তোমার অপেক্ষা দয়ালু শত শত লোকের সাক্ষাৎ পাইব। তাহারা অন্ধের প্রতি তোমার অপেক্ষা দয়া করিবে।"

হীরা। দেখা পেলে ত? এ যে চড়া; চারিদিকে জল। আমাকে বিবাহ করিবে?

হীরালালের নৌকা তখন কিছু বাহিরে গিয়াছিল, শ্রবণশক্তি আমার জীবনাবলম্বন—শ্রবণই আমার চক্ষের কাজ করে! কেহ কথা কহিলে—কত দূরে কোন্ দিকে কথা কহিতেছে, তাহা অনুভব করিতে পারি। হীরালাল কোন্ দিকে কত দূর থাকিয়া কথা কহিল, তাহা মনে মনে অনুভব করিয়া জলে নামিয়া সেই দিকে ছুটিলাম—ইচ্ছা, নৌকা ধরিব। গলাজল অবধি নামিলাম। নৌকা পাইলাম না।

নৌকা আরও বেশী জলে! নৌকা ধরিতে গেলে ডুবিয়া মরিব। তালের লাঠি তখনও হাতে ছিল। আবার ঠিক করিয়া শব্দানুভব করিয়া বুঝিলাম, হীরালাল এই দিকে এত দূর হইতে কথা কহিতেছে। পিছু হটিয়া কোমরজলে উঠিয়া, শব্দের স্থানানুভব করিয়া সবলে সেই তালের লাঠি নিক্ষেপ করিলাম।

চীৎকার করিয়া হীরালাল নৌকার উপর পড়িয়া গেল। —"খুন হইয়াছে, খু—ন হইয়াছে!" বলিয়া মাঝিরা নৌকা খুলিয়া দিল। বাস্তবিক সেই পাপিষ্ঠ খুন হয় নাই। তখনই তার মধুর কণ্ঠ শুনিতে পাইলাম—নৌকা বাহিয়া চলিল। সে উচ্চৈঃস্বরে আমাকে গালি দিতে দিতে চলিল—অতি কদর্য্য অশ্রাব্য ভাষায় পবিত্র গঙ্গা কলুষিত করিতে করিতে চলিল। আমি স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম যে, সে শাসাইতে লাগিল যে, আবার খবরের কাগজ করিয়া আমার নামে আর্টিকেল লিখিবে।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

সেই জনহীনা রাত্রিতে, আমি অন্ধ যুবতী একা সেই দ্বীপে দাঁড়াইয়া গঙ্গার কলকল জলকল্লোল শুনিতে লাগিলাম।

হায়, মানুষের জীবন! কি অসার তুই! কেন আসিস্—কেন থাকিস্—কেন যাস্? এ দুঃখময় জীবন কেন? ভাবিলে জ্ঞান থাকে না। শচীন্দ্র বাবু একদিন তাঁহার মাতাকে বুঝাইতেছিলেন, সকলই নিয়মাধীন। মানুষের এই জীবন কি কেবল সেই নিয়মের ফল? যে নিয়মে ফুল ফুটে, মেঘ ছুটে, চাঁদ উঠে—যে নিয়মে জলবুদ্‌বুদ্ ভাসে, হাসে, মিলায়; যে নিয়মে ধূলা উড়ে, তৃণ পড়ে, পাতা খসে, সেই নিয়মেই কি এই সুখদুঃখময় মনুষ্যজীবন আবদ্ধ, সম্পূর্ণ, বিলীন হয়? যে নিয়মের অধীন হইয়া নদীগর্ভস্থ কুম্ভীর শীকারের সন্ধান করিতেছে—যে নিয়মের অধীন হইয়া এই চরে ক্ষুদ্র কীট সকল অন্য কীটের সন্ধান করিয়া বেড়াইতেছে, সেই নিয়মের অধীন হইয়া আমি শচীন্দ্রের জন্য প্রাণত্যাগ করিতে বসিয়াছি? ধিক্ প্রাণত্যাগে! ধিক্ প্রণয়ে! ধিক্ মনুষ্য জীবনে! কেন এই গঙ্গাজলে ইহা পরিত্যাগ করি না।

জীবন অসার—সুখ নাই বলিয়া, অসার, তাহা নহে। শিমূল-গাছে শিমূল-ফুলই ফুটিবে; তাহা বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। দুঃখময় জীবনে দুঃখ আছে বলিয়া তাহাকে অসার বলিব না। কিন্তু অসার বলি এই জন্যে যে, দুঃখই দুঃখের

পরিণাম—তাহার পর আর কিছুই নাই। আমার মর্ম্মের দুঃখ আমি একা ভোগ করিলাম, আর কেহ জানিল না—আর কেহ বুঝিল না—দুঃখ প্রকাশের ভাষা নাই বলিয়া তাহা বলিতে পারিলাম না; শ্রোতা নাই বলিয়া তাহা শুনাইতে পারিলাম না; সহৃদয় বোদ্ধা নাই বলিয়া তাহা বুঝাইতে পারিলাম না। একটি শিমুল-বৃক্ষ হইতে সহস্র শিমুল-বৃক্ষ হইতে পারিবে, কিন্তু তোমাদের দুঃখে আর কয় জনের দুঃখ হইবে? পরের অন্তঃকরণের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে, এমন কয় জন পর পৃথিবীতে জন্মিয়াছে? পৃথিবীতে কে এমন জন্মিয়াছে যে, এ ক্ষুদ্র হৃদয়ে, প্রতি কথায়, প্রতি শব্দে, প্রতি বর্ণে, কত সুখ-দুঃখের তরঙ্গ উঠে, তাহা বুঝিতে পারে? সুখ-দুঃখ? হাঁ, সুখও আছে। যখন চৈত্রমাসে ফুলের বোঝার সঙ্গে সঙ্গে মৌমাছি ছুটিয়া আমাদের গৃহমধ্যে প্রবেশ করিত, তখন সে শব্দের সঙ্গে আমার কত সুখ উছলিত, কে বুঝিত? যখন গীত-ব্যবসায়িনীর অট্টালিকা হইতে বাদ্যনিক্কণ সান্ধ্য-সমীরণে কর্ণে আসিত, তখন আমার সুখ কে বুঝিয়াছে? যখন বামাচরণের আধ আধ কথা ফুটিয়াছিল, জল বলিতে "ত" বলিত, কাপড় বলিতে "খাব" বলিত, রজনী বলিতে "জুঙ্গি" বলিত, তখন আমার মনে কত সুখ উছলিত, তাহা কে বুঝিয়াছিল? আমার দুঃখই বা কে বুঝিবে? অন্ধের রূপোন্মাদ কে বুঝিবে? না দেখায় যে দুঃখ, তাহা কে বুঝিবে? বুঝিলেও বুঝিতে পারে, কিন্তু দুঃখ যে কখন প্রকাশ করিতে পারিলাম না, এ দুঃখ কে বুঝিবে? পৃথিবীতে যে দুঃখের ভাষা নাই, এ দুঃখ কে বুঝিবে? ছোট মুখে বড় কথা তোমরা ভালবাস না, ছোট ভাষায় বড় দুঃখ কি প্রকাশ করা যায়? এমনই দুঃখ যে, আমার যে কি দুঃখ, তাহাতে হৃদয় ধ্বংস হইলেও সকলটা আপনি মনে ভাবিয়া আনিতে পারি না।

মনুষ্য-ভাষাতে তেমন কথা নাই, মনুষ্যের তেমন চিন্তাশক্তি নাই। দুঃখ ভোগ করি—কিন্তু দুঃখটা বুঝিয়া উঠিতে পারি না। আমার কি দুঃখ? কি তাহা জানি না, কিন্তু হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছে। সর্ব্বদা দেখিতে পাইবে, যেন তোমার দেহ শীর্ণ হইতেছে, বল অপহৃত হইতেছে, কিন্তু তোমার শারীরিক রোগ কি, তাহা জানিতে পারিতেছ না। তেমনি অনেক সময় দেখিবে যে, দুঃখে তোমার বক্ষঃ বিদীর্ণ হইতেছে, প্রাণ বাহির করিয়া দিয়া শূন্যমার্গে পাঠাইতে ইচ্ছা করিতেছে—কিন্তু কি দুঃখ, তাহা আপনি বুঝিতে পারিতেছ না। আপনি বুঝিতে পারিতেছ না—পরে বুঝিবে কি? ইহা কি সামান্য দুঃখ? সাধ করিয়া বলি, জীবন অসার!

যে জীবন এমন দুঃখময়, তাহার রক্ষার জন্য এত ভয় পাইতেছিলাম কেন?

আমি কেন ইহা ত্যাগ করি না ? এই ত কলনাদিনী গঙ্গার তরঙ্গ মধ্যে দাঁড়াইয়া আছি—আর দুই পা অগ্রসর হইলেই মরিতে পারি ? না মরি কেন ? এ জীবন রাখিয়া কি হইবে ? মরিব !

আমি কেন জন্মিলাম ? কেন অন্ধ হইলাম ? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন ? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন ? ভালবাসিলাম, তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন ? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল ? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন ? কেন বানের মুখে কুটার মত, সংসারস্রোতে অজ্ঞাতপথে ভাসিয়া চলিলাম ? এ সংসারে অনেক দুঃখী আছে, আমি সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখী কেন ? এ সকল কাহার খেলা ? দেবতার ? জীবের এত কষ্টে দেবতার কি সুখ ? কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্টি করিয়া কি সুখ ? মূর্ত্তিমতী নির্দ্দয়তাকে কেন দেবতা বলিব ? কেন নিষ্ঠুরতার পূজা করিব ? মানুষের এত ভয়ানক দুঃখ কখন দেবকৃত নহে - তাহা হইলে দেবতা রাক্ষসের অপেক্ষা সহস্রগুণে নিকৃষ্ট ! তবে কি আমার কর্ম্মফল ? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ ?

দুই এক পা অগ্রসর হইতে লাগিলাম—মরিব ! গঙ্গার তরঙ্গরব কাণে বাজিতে লাগিল—বুঝি মরা হইল না—আমি মিষ্টশব্দ বড় ভালবাসি। না, মরিব ! চিবুক ডুবিল ! অধর ডুবিল ! আর একটুমাত্র। নাসিকা ডুবিল । চক্ষু ডুবিল ! আমি ডুবিলাম !

ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না। কিন্তু এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে।

আমি সেই প্রভাতবায়ু তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।

দ্বিতীয় খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।

আমার নিবাস অথবা পিত্রালয় শান্তিপুর—আমার বর্ত্তমান বাসস্থানের কিছুমাত্র স্থিরতা নাই। আমি সৎ-কায়স্থ-কুলোদ্ভূত, কিন্তু আমার পিতৃকুলে একটি গুরুতর কলঙ্ক ঘটিয়াছিল। আমার খুল্লতাত-পত্নী কুলত্যাগিনী হইয়াছিলেন। আমার পিতার ভূসম্পত্তি যাহা ছিল—তদ্দ্বারা অন্য উপায় অবলম্বন না করিয়াও সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করা যায়। লোকে তাঁহাকে ধনী বলিয়া গণনা করিত। তিনি আমার শিক্ষার্থ অনেক ধনব্যয় করিয়াছিলেন। আমিও কিঞ্চিৎ লেখাপড়া শিখিয়াছিলাম—কিন্তু সে কথায় কাজ নাই। সর্পের মণি থাকে, আমারও বিদ্যা ছিল।

আমার বিবাহযোগ্য বয়স উপস্থিত হইলে, আমার অনেক সম্বন্ধ আসিল—কিন্তু কোন সম্বন্ধই পিতার মনোমত হইল না; তাঁহার ইচ্ছা, কন্যা পরমাসুন্দরী হইবে, কন্যার পিতা পরম ধনী হইবে এবং কৌলিন্যের নিয়ম সকল বজায় থাকিবে। কিন্তু এরূপ কোন সম্বন্ধ উপস্থিত হইল না। আসল কথা, আমাদিগের কুলকলঙ্ক শুনিয়া কোন বড় লোক আমাকে কন্যাদান করিতে ইচ্ছুক হয়েন নাই। এইরূপ সম্বন্ধ করিতে করিতে আমার পিতার পরলোকপ্রাপ্তি হইল।

পরিশেষে পিতার স্বর্গারোহণের পর আমার এক পিসী এক সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন। গঙ্গাপার, কালিকাপুর নামে এক গ্রাম ছিল। এই ইতিহাসে, ভবানীনগর নামে অন্য গ্রামের নাম উত্থাপিত হইবে, এই কালিকাপুর সেই ভবানীনগরের নিকটস্থ গ্রাম। আমার পিসীর শ্বশুরালয় সেই কালিকাপুরে। সেইখানে লবঙ্গ নামে, কোন ভদ্রলোকের কন্যার সঙ্গে পিসী আমার সম্বন্ধ উপস্থিত করিলেন।

সম্বন্ধের পূর্ব্বে আমি লবঙ্গকে সর্ব্বদাই দেখিতে পাইতাম। আমার পিসীর

বাড়ীতে আমি মধ্যে মধ্যে যাইতাম। লবঙ্গকে পিসীর বাড়ীতেও দেখিতাম—তাহার পিত্রালয়েও দেখিতাম। মধ্যে মধ্যে লবঙ্গকে শিশুবোধ হইতে কয়ে করাত, খয়ে খরা শিখাইতাম। যখন তাহার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ হইল, তখন হইতে সে আমার কাছে আসিত না; কিন্তু সেই সময়ে আমিও তাহারে দেখিবার জন্য অধিকতর উৎসুক হইয়া উঠিলাম। তখন লবঙ্গের বিবাহের বয়ঃক্রম উত্তীর্ণ হইয়াছিল—লবঙ্গকলিকা ফোট-ফোট হইয়াছিল, চক্ষের চাহনী চঞ্চল অথচ ভীত হইয়া আসিয়াছিল—উচ্চহাস্য মৃদু এবং ব্রীড়াযুক্ত হইয়া উঠিয়াছিল—দ্রুত গতি মন্থর হইয়া আসিতেছিল। আমি মনে করিতাম, এমন সৌন্দর্য্য কখন দেখি নাই—এ সৌন্দর্য্য যুবতীর অদৃষ্টে কখন ঘটে না! বস্তুতঃ, অতীত-শৈশব অথচ অপ্রাপ্ত-যৌবনার সৌন্দর্য্য এবং অস্ফুটবাক্ শিশুর সৌন্দর্য্য ইহাই মনোহর; যৌবনের সৌন্দর্য্য তাদৃশ নহে। যৌবনে বসন-ভূষণের ঘটা, হাসি-চাহনির ঘটা—বেণীর দোলানি, বাহুর বলনি, গ্রীবার হেলনী, কথার ছলনি—যুবতীর রূপের বিকাশ এক প্রকার দোকানদারি। আর আমরা যে চক্ষে সে সৌন্দর্য্য দেখি, তাহাও বিকৃতি। যে সৌন্দর্য্যের উপভোগে ইন্দ্রিয়ের সহিত সম্বন্ধযুক্ত চিত্তভাবের সংস্পর্শমাত্র নাই, সেই সৌন্দর্য্যই সৌন্দর্য্য।

এই সময়ে আমাদের কুলকলঙ্ক কন্যাকর্ত্তার কর্ণে প্রবেশ করিল। সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া গেল। আমায় হৃদয়পতত্রী সবে এই লবঙ্গলতায় বসিতেছিল—এমত সময় ভবানীনগরের রামসদয় মিত্র আসিয়া লবঙ্গলতা ছিঁড়িয়া লইয়া গেল। তাহার সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হইল, লবঙ্গলাভে নিরাশ হইয়া আমি বড় ক্ষুণ্ণ হইলাম।

ইহার কয় বৎসর পরে এমন একটি ঘটনা ঘটিল যে, তাহা আমি বলিতে পারিতেছি না। পশ্চাৎ বলিব কি না, তাহাও স্থির করিতে পারিতেছি না। সেই অবধি আমি গৃহত্যাগ করিলাম। সেই পর্য্যন্ত নানা দেশ ভ্রমণ করিয়াই বেড়াই, কোথাও স্থায়ী হইতে পারি না।

কোথাও স্থায়ী হই নাই, কিন্তু মনে করিলেই স্থায়ী হইতে পারিতাম, মনে করিলে কুলীন ব্রাহ্মণের অপেক্ষা অধিক বিবাহ করিতে পারিতাম। আমার সব ছিল ধন, সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্ট দোষে এক দিনের দুর্ব্বুদ্ধি-দোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম। আমি মনে করিলে আমার সেই জন্মভূমিতে রম্যগৃহ রম্যসজ্জায় সাজাইয়া, রঙ্গের পবনে সুখের নিশান উড়াইয়া দিয়া হাসির বাণে দুঃখ-রাক্ষসকে বধ করিতে পারিতাম।

কিন্তু—এখন তাই ভাবি, কেন করিলাম না। সুখ-দুঃখের বিধান পরের হাতে, কিন্তু মন ত আমার। তরঙ্গে নৌকা ডুবিল বলিয়া, কেন ডুবিয়া রহিলাম—সাঁতার দিয়া ত কূল পাওয়া যায়। আর দুখ—দুঃখ কি? মনের অবস্থা, সে ত নিজের আয়ত্ত। সুখ-দুঃখ পরের হাত, না আমার নিজের হাত? পর কেবল বহির্জ্জগতের কর্ত্তা—অন্তর্জ্জগতে আমি একা কর্ত্তা। আমার রাজ্য লইয়া আমি সুখী হইতে পারিব না কেন? জড়-জগৎ, জগৎ, অন্তর্জ্জগৎ কি জগৎ নয়? আপনার মন লইয়া কি থাকা যায় না? তোমার বাহ্য জগতে যে কয়টি সামগ্রী আছে, আমার অন্তরে কি তাই নাই? আমার অন্তরে যাহা আছে, তাহা তোমার বাহ্যজগৎ দেখাইবে সাধ্য কি? যে কুসুম এ মৃত্তিকায় ফুটে, যে বায়ু এ আকাশে বয়, যে চাঁদ এ গগনে ওঠে, যে সাগর এই অন্ধকারে আপনি মাতে, তোমার বাহ্য জগতে তেমন কোথায়?

তবে কেন এই নিশীথকালে, সুষুপ্তা সুন্দরীর সৌন্দর্য্যপ্রভা—দূর হউক! এক দিন নিশীথকালে—এই অসীম পৃথিবী সহসা আমার চক্ষে শুষ্কবদরীর মত ক্ষুদ্র হইয়া গেল—আমি লুকাইবার স্থান পাইলাম না। দেশে দেশে ফিরিলাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

কালের শীতল প্রলেপে সেই হৃদয়ক্ষত ক্রমে পুরিয়া উঠিতে লাগিল।

কাশীধামে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে কোন সচ্চরিত্র অতি প্রাচীন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আমার আলাপ হইল। ইনি বহুকাল হইতে কাশীবাস করিয়া আছেন।

একদা তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনকালে পুলিশের অত্যাচারের কথা প্রসঙ্গক্রমে উত্থাপিত হইল। অনেকে পুলিশের অত্যাচারঘটিত অনেকগুলি গল্প বলিলেন—দুই একটা বা সত্য, দুই একটা বক্তাদিগের কপোলকল্পিত। গোবিন্দকান্ত বাবু একটি গল্প বলিলেন, তাহার সার মর্ম্ম এই :—

"হরেকৃষ্ণ দাস নামে আমাদের গ্রামে এক ঘর দরিদ্র কায়স্থ ছিল। তাহার একটি কন্যা ভিন্ন অন্য সন্তান ছিল না। তাহার গৃহিণীর মৃত্যু হইয়াছিল এবং সে নিজেও রুগ্ন। এজন্য সে কন্যাটি আপন শ্যালীপতিকে প্রতিপালন করিতে দিয়াছিল। তাহার কন্যাটির কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। লোভবশতঃ তাহা সে শ্যালীপতিকে দেয় নাই। কিন্তু যখন মৃত্যু উপস্থিত দেখিল, তখন সেই অলঙ্কারগুলি সে আমাকে

ডাকিয়া আমার কাছে রাখিল বলিল যে, ‘আমার কন্যার জ্ঞান হইলে তাহাকে দিবেন, এখন দিলে রাজচন্দ্র ইহা আত্মসাৎ করিবে।’ আমি স্বীকৃত হইলাম। পরে হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হইলে সে লাওয়ারেশ মরিয়াছে বলিয়া নন্দি-ভৃঙ্গি-সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা আসিয়া উপস্থিত হইলেন। হরেকৃষ্ণের ঘটি-বাটি, পাথর-টুকনি, লাওয়ারেশ মাল বলিয়া হস্তগত করিলেন। কেহ কেহ বলিল যে, হরেকৃষ্ণ লাওয়ারেশ নহে, কলিকাতায় তাহার কন্যা আছে, দারোগা মহাশয় তাহাকে কটু বলিয়া আজ্ঞা করিলেন, ‘ওয়ারেশ থাকে, হুজুরে হাজির হইবে!’ তখন আমার দুই একজন শত্রু সুযোগ মনে করিয়া বলিয়াছিল যে, গোবিন্দ দত্তের কাছে ইহার স্বর্ণালঙ্কার আছে। আমাকে তলব হইল। আমি তখন দেবাদিদেবের কাছে আসিয়া যুক্তকরে দাঁড়াইলাম, কিছু গালি খাইলাম। আসামীর শ্রেণীতে চালান হইবার গতিক দেখিলাম। বলিব কি ঘুষাঘুষির উদ্যোগ দেখিয়া অলঙ্কারগুলি সকল দারোগা মহাশয়ের পাদপদ্মে ঢালিয়া দিলাম, তাহার উপর পঞ্চাশ টাকা নগদ দিয়া নিষ্কৃতি পাইলাম।

বলা বাহুল্য যে, দারোগা মহাশয় অলঙ্কারগুলি আপন কন্যার ব্যবহার্থ নিজালয়ে প্রেরণ করিলেন। সাহেবের কাছে তিনি রিপোর্ট করিলেন যে, ‘হরেকৃষ্ণ দাসের এক লোটা আর এক দেরকো ভিন্ন অন্য কোন সম্পত্তি নাই এবং সে লাওয়ারেশ ফৌত করিয়াছে, তাহার কেহ নাই।’

হরেকৃষ্ণ দাসের নাম শুনিয়াছিলাম। আমি গোবিন্দ বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে “ঐ হরেকৃষ্ণ দাসের এক ভাইয়ের নাম মনোহর দাস না?”

গোবিন্দকান্ত বাবু বলিলেন, “হাঁ, আপনি কি প্রকারে জানিলেন?”

আমি বিশেষ কিছু বলিলাম না। জিজ্ঞাসা করিলাম, “হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতির নাম কি?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “রাজচন্দ্র দাস।”

আমি। তাহার বাড়ী কোথায়?

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “কলিকাতায়, কিন্তু কোন্ স্থানে, তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “সে কন্যাটির নাম কি জানেন?”

গোবিন্দ বাবু বলিলেন, “হরেকৃষ্ণ তাহার নাম রজনী রাখিয়াছিলেন।”

ইহার অল্পদিন পরেই আমি কাশী পরিত্যাগ করিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

প্রথমে আমাকে বুঝিতে হইতেছে, আমি কি খুঁজি। চিত্ত আমার দুঃখময়, এ সংসার আমার পক্ষে অন্ধকার। আজি আমার মৃত্যু হইলে, আমি কাল চাহি না। যদি দুঃখনিবারণ করিতে না পারিলাম, তবে পুরুষত্ব কি? কিন্তু ব্যাধির শান্তি করিতে গেলে আগে ব্যাধির নির্ণয় চাহি, দুঃখ-নিবারণের আগে আমার দুঃখ কি, তাহা নিরূপণের আবশ্যক।

দুঃখ কি? অভাব। সকল দুঃখই অভাব। রোগ দুঃখ, কারণ, রোগ স্বাস্থ্যের অভাব। অভাব মাত্রই দুঃখ নহে, তাহা জানি। রোগের অভাব দুঃখ নহে। অভাববিশেষই দুঃখ।

আমার কিসের অভাব? আমি চাই কি? মনুষ্যই বা কি চায়? ধন? আমার যথেষ্ট আছে।

যশ? পৃথিবীতে এমন কেহ নাই—যাহার যশ নাই। যে পাকা জুয়াচোর, তাহারও বুদ্ধি সম্বন্ধে যশ আছে। আমি একজন কশাইয়েরও যশ শুনিয়াছি— মাংস সম্বন্ধে সে কাহাকেও প্রবঞ্চনা করিত না। সে কখনও মেষ মাংস বলিয়া কাহাকেও কুক্কুরমাংস দেয় নাই। যশ সকলেরই আছে। আবার কাহারও যশ সম্পূর্ণ নহে। বেকনের ঘুষখোর অপবাদ—সক্রেতিস্ অপযশ হেতু বধদণ্ডার্হ হইয়াছিলেন। যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী, অর্জ্জুন বভ্রুবাহন কর্তৃক পরাভূত। কাইসয়কে যে বিথীনিয়ার রাণী বলিত, সে কথা অদ্যাপি প্রচলিত ;—সেক্সপীয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছিলেন। যশ চাহি না।

যশ সাধারণ লোকের মুখে। সাধারণ লোক কোন বিষয়ের বিচারক নহে—কেন না, সাধারণ লোক মূর্খ এবং স্থূলবুদ্ধি। মূর্খ ও স্থূলবুদ্ধির কাছে যশস্বী হইয়া আমার কি সুখ হইবে? আমি যশ চাহি না।

মান? সংসারে এমন লোক কে আছে যে, সে মানিলে সুখী হই? যে দুই চারি জন আছে, তাহাদিগের কাছে আমার মান আছে। অন্যের কাছে মান অপমান মাত্র। রাজদরবারে মান—সে কেবল দাসত্বের প্রাধান্য-চিহ্ন বলিয়া আমি অগ্রাহ্য করি। আমি মান চাহি না। মান চাহি কেবল আপনার কাছে।

রূপ? কতটুকু চাই? কিছু চাই। লোকে দেখিয়া না নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে। আমাকে দেখিয়া কেহ নিষ্ঠীবন ত্যাগ করে না। রূপ যাহা আছে, তাহাই আমার যথেষ্ট।

স্বাস্থ্য? আমার স্বাস্থ্য অদ্যাপি অনন্ত।

বল? লইয়া কি করিব? প্রহার করিতে বল আবশ্যক। আমি কাহাকেও প্রহার করিতে চাহি না।

বুদ্ধি? এ সংসারে কেহ কখন বুদ্ধির অভাব আছে মনে করে নাই—আমিও করি না। সকলেই আপনাকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান বলিয়া জানে, আমিও জানি।

বিদ্যা? ইহার অভাব স্বীকার করি, কিন্তু কেহ কখন বিদ্যার অভাবে আপনাকে অসুখী মনে করে নাই। আমিও করি না।

ধর্ম্ম? লোকে বলে ধর্ম্মের অভাব পরকালের দুঃখের কারণ, ইহকালের নহে। লোকের চরিত্রে দেখিতে পাই, অভাবই দুঃখ। জানি আমি সে মিথ্যা, কিন্তু জানিয়াও ধর্ম্মকামনা করি না। আমার সে দুঃখ নহে।

প্রণয়? স্নেহ? ভালবাসা? আমি জানি, ইহার অভাবই সুখ, ভালবাসাই দুঃখ। সাক্ষী লবঙ্গলতা।

তবে আমার দুঃখ কিসের? আমার অভাব কিসের? আমার কিসের কামনা যে তাহা লাভে সফল হইয়া দুঃখ নিবারণ করিব? আমার কাম্যবস্তু কি?

বুঝিয়াছি। আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ। আমি বুঝিয়াছি যে, সকলই অসার, তাই আমার কেবল দুঃখ সার।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

কিছু কাম্য কি খুঁজিয়া পাই নাই? এই অনন্ত সংসার অসংখ্য রত্নরাজিময়, ইহাতে আমার প্রার্থনীয় কি কিছুই নাই? যে সংসারে এক একটি দুরবেক্ষণীয় ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ অনন্ত কৌশলের স্থান, অনন্ত জ্ঞানের ভাণ্ডার, যে জগতে পথিস্থ বালুকার এক এক কণা অনন্ত-রত্নপ্রভব নগাধিরাজের ভগ্নাংশ, সে জগতে কি আমার কাম্যবস্তু কিছুই নাই? দেখ, আমি কোন্ ছার! টিণ্ডল, হক্সলী, ডার্বিন এবং লায়ল এক আসনে বসিয়া যাবজ্জীবন ঐ ক্ষুদ্র নীহারবিন্দুর, ঐ বালুকাকণার বা ঐ শিয়ালকাটা ফুলটির গুণ বর্ণনা করিয়া উঠিতে পারেন না—তবু আমার কাম্যবস্তু নাই? আমি কি?

দেখ, এই পৃথিবীতে কত কোটি মনুষ্য আছে, তাহা কেহ গণিয়া সংখ্যা করে নাই। বহু কোটি মনুষ্য সন্দেহ নাই। উহার একটি মনুষ্য অসংখ্য গুণের আধার।

সকলেই ভক্তি, প্রীতি, দয়া, ধর্ম্মাদির আধার—সকলেই পূজ্য, সকলেই অনুসরণীয়। আমার কাম্য কি কেহ নাই? আমি কি?

আমার এক বাঞ্ছনীয় পদার্থ ছিল—আজিও আছে। কিন্তু সে বাসনা পূর্ণ হইবার নহে। পূর্ণ হইবার নহে বলিয়া তাহা হৃদয় হইতে অনেক দিন হইল উন্মূলিত করিয়াছি। আর পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহি না। অন্য কোন বাঞ্ছনীয় কি সংসারে নাই?

তাই খুঁজি। কি করিব?

কয় বৎসর হইতে আমি আপনা আপনি এই প্রশ্ন করিতেছিলাম, উত্তর দিতে পারিতেছিলাম না। যে দুই এক জন বন্ধুবান্ধব আছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতেন, "তোমার আপনার কাজ না থাকে, পরের কাজ কর। লোকের যথাসাধ্য উপকার কর।"

সে ত প্রাচীন কথা। লোকের উপকার কিসে হয়! রামের মা'র ছেলের জ্বর হইয়াছে, নাড়ী টিপিয়া একটি কুইনাইন দাও। রঘো পাগলের গাত্রবস্ত্র নাই, কম্বল কিনিয়া দাও। সন্তার মা বিধবা, মাসিক দাও। সুন্দর নাপিতের ছেলে ইস্কুলে পড়িতে পায় না—তাহার বেতনের আনুকূল্য কর। এই কি পরের উপকার?

মানিলাম, এই পরের উপকার। কিন্তু এ সকলে কতক্ষণ যায়? কতটুকু সময় কাটে? কতটুকু পরিশ্রম হয়? মানসিক শক্তি-সকল কতখানি উত্তেজিত হয়? আমি এমত বলি না যে, এই সকল কার্য্য আমার যথাসাধ্য আমি করিয়া থাকি; কিন্তু যতটুকু করি, তাহাতে আমার বোধ হয় না যে, ইহাতে আমার অভাব পূরণ হইবে। আমার যোগ্য কাজ আমি খুঁজি; যাহাতে আমার মন মজিবে, তাই খুঁজি।

আর একপ্রকারে লোকের উপকারের ঢং উঠিয়াছে। তাহার এক কথায় নাম দিতে হইলে বলিতে হয়, "বকাবকি লেখালেখি।" সোসাইটি, ক্লাব, এসোসিয়েশন, সভা, সমাজ, বক্তৃতা, রিজলিউশন, আবেদন, নিবেদন, সমবেদন—আমি তাহাতে নহি। আমি একদা কোন বন্ধুকে একটি মহাসভায় ঐরূপ একখানি আবেদন পড়িতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "কি পড়িতেছ?" তিনি বলিলেন, "এমন কিছু না, কেবল কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে।" এ সকল আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাই—কেবল "কাণা ফকির ভিক মাঙ্গে রে বাবা।"

এই রোগের আর একপ্রকার বিকার আছে। বিধবার বিবাহ দাও, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ কর, অল্প বয়সে বিবাহ বন্ধ কর, জাতি উঠাইয়া দাও,

স্ত্রীলোকগণ এক্ষণে গোরুর মত গোয়ালে বাঁধা থাকে—দড়ি খুলিয়া তাহাদিগকে ছাড়িয়া দেও, চরিয়া খাক। আমার গোরু নাই। পরের গোয়ালের সঙ্গেও আমার বিশেষ সম্বন্ধ নাই। জাতি উঠাইতে আমি বড় রাজি নহি, আমি ততদূর আজও সুশিক্ষিত হই নাই। আমি এখনও আমার ঝাড়ুদারের সঙ্গে একত্রে বসিয়া খাইতে অনিচ্ছুক। তাহার কন্যা বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক এবং যে গালি, শিরোমণি মহাশয় দিলে নিঃশব্দে সহিব, ঝাড়ুদারের কাছে তাহা সহিতে অনিচ্ছুক। সুতরাং আমার জাতি থাকুক। বিধবা বিবাহ করে করুক, ছেলেপুলেরা আইবুড় থাকে থাকুক, কুলীন ব্রাহ্মণ এক পত্নীর যন্ত্রণায় সুখী হয় হউক, আমার আপত্তি নাই; কিন্তু তাহার পোষকতায় লোকের কি হিত হইবে, তাহা আমার বুদ্ধির অতীত।

সুতরাং এ বঙ্গসমাজে আমার কোন কার্য্য নাই। এখানে আমি কেহ নহি—আমি কোথাও নহি। আমি—আমি, এই পর্য্যন্ত, আর কিছু নহি। আমার সেই দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নাই—লবঙ্গলতার হস্তলিপি ভুলিয়া যাইতেছি।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

আমার এইরূপ মনের অবস্থা, আমি এমত সময়ে-কাশীধামে গোবিন্দ দত্তের কাছে রজনীর নাম শুনিলাম। মনে হইল, ঈশ্বর আমাকে বুঝি একটি গুরুতর কার্য্যের ভার দিলেন। এ সংসারে আমি একটি কার্য্য পাইলাম। রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়। আমার ত কোন কাজ নাই—এই কাজ কেন করি না? ইহা কি আমার যোগ্য কাজ নহে?

এখানে শচীন্দ্রের বংশাবলীর পরিচয় কিছু দিতে হইল। শচীন্দ্রনাথের পিতার নাম রামসদয় মিত্র, পিতামহের নাম বাঞ্ছারাম মিত্র; প্রপিতামহের নাম কেবলরাম মিত্র। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস কলিকাতায় নহে।—তাহার পিতা প্রথমে কলিকাতায় বাস করেন। তাহাদিগের পূর্ব্বপুরুষের বাস ভবানীনগর গ্রামে। তাহার প্রপিতামহ দরিদ্র নিঃস্ব ব্যক্তি ছিলেন। পিতামহ বুদ্ধিবলে ধনসঞ্চয় করিয়া তাঁহাদিগের ভোগ্য ভূসম্পত্তি সকল ক্রয় করিয়াছিলেন।

বাঞ্ছারামের এক পরম বন্ধু ছিলেন মনোহর দাস। বাঞ্ছারাম মনোহর দাসের সাহায্যেই এই বিভবের অধিপতি হইয়াছিলেন। মনোহর প্রাণপাত করিয়া তাঁহার কার্য্য করিতেন, নিজে কখনও ধনসঞ্চয় করিতেন না; বাঞ্ছারাম তাঁহার

এই সকল গুণে অত্যন্ত বাধ্য ছিলেন। মনোহরকে সহোদরের স্থায় ভালবাসিতেন এবং মনোহর বয়োজ্যেষ্ঠ বলিয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় তাঁহাকে মান্য করিতেন। তাঁহার পিতার সঙ্গে পিতামহের তাদৃশ সম্প্রীতি ছিল না। বোধ হয়, উভয় পক্ষেরই কিছু কিছু দোষ ছিল।

একদা রামসদয়ের সঙ্গে মনোহর দাসের ঘোরতর বিবাদ উপস্থিত হইল। মনোহর দাস বাঞ্ছারামকে বলিলেন যে, রামসদয় তাঁহাকে কোন বিষয়ে সহনাতীত অপমান করিয়াছেন। অপমানের কথা বাঞ্ছারামকে বলিয়া, মনোহর তাঁহার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে ভবানীনগর হইতে উঠিয়া গেলেন। বাঞ্ছারাম মনোহরকে অনেক অনুনয়-বিনয় করিলেন; মনোহর কিছুই শুনিলেন না। উঠিয়া কোন্ দেশে গিয়া বাস করিলেন, তাহাও কাহাকে জানাইলেন না।

বাঞ্ছারাম রামসদয়ের প্রতি যত স্নেহ করুন বা না করুন, মনোহরকে ততোধিক স্নেহ করিতেন। সুতরাং রামসদয়ের উপর তাঁহার ক্রোধ অপরিসীম হইল। বাঞ্ছারাম অত্যন্ত কটূক্তি করিয়া গালি দিলেন, রামসদয়ও সকল কথা নীরবে সহ্য করিলেন না।

পিতা-পুত্রের বিবাদের ফল এই দাঁড়াইল যে, বাঞ্ছারাম পুত্রকে গৃহবহিষ্কৃত করিয়া দিলেন। পুত্রও গৃহত্যাগ করিয়া শপথ করিলেন, আর কখনও পিতৃভবনে মুখ দেখাইব না। বাঞ্ছারাম রাগ করিয়া এক উইল করিলেন। উইলে লিখিত হইল যে, বাঞ্ছারাম মিত্রের সম্পত্তিতে তস্য পুত্র রামসদয় মিত্র কখন অধিকারী হইবে না। বাঞ্ছারাম মিত্রের অবর্ত্তমানে মনোহর দাস, মনোহর দাসের অভাবে মনোহরের উত্তরাধিকারিগণ অধিকারী হইবেন। তদভাবে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদি যথাক্রমে, কিন্তু রামসদয় নহে।

রামসদয় গৃহত্যাগ করিয়া প্রথমা স্ত্রীকে লইয়া কলিকাতায় আসিলেন। ঐ স্ত্রীর কিছু পিতৃদত্ত অর্থ ছিল। তদবলম্বনে এবং এক জন সজ্জন বণিক্ সাহেবের আনুকূল্যে তিনি বাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইলেন। লক্ষ্মী সুপ্রসন্না হইলেন; সংসার প্রতিপালনের জন্য তাঁহাকে কোন কষ্ট পাইতে হইল না।

যদি কষ্ট পাইতে হইত, তাহা হইলে বোধ হয়, বাঞ্ছারাম সদয় হইতেন। পুত্রের সুখের অবস্থা শুনিয়া বৃদ্ধের যে স্নেহাবশেষ ছিল, তাহাও নিবিয়া গেল। পুত্র অভিমানপ্রযুক্ত পিতা না ডাকিলে আর যাইব না, ইহা স্থির করিয়া আর পিতার কোন সংবাদ লইলেন না। অভক্তি এবং তাচ্ছিল্যবশতঃ পুত্র এরূপ করিতেছে বিবেচনা করিয়া বাঞ্ছারাম তাহাকেও আর ডাকিলেন না।

সুতরাং কাহারও রাগ পড়িল না। উইলও অপরিবর্ত্তিত রহিল। এমতকালে হঠাৎ বাঞ্ছারামের স্বর্গপ্রাপ্তি হইল।

রামসদয় শোকাকুল হইলেন; তাঁহার পিতার মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎলাভ করিয়া যথাকর্ত্তব্য করেন নাই, এই দুঃখে অনেক দিন ধরিয়া রোদন করিলেন। তিনি আর ভবানীনগরে গেলেন না, কলিকাতাতেই পিতৃকৃত্য সম্পন্ন করিলেন। কেন না, এক্ষণে ঐ বাটী মনোহর দাসের হইল।

এ দিকে মনোহর দাসের কোন সংবাদ নাই। পশ্চাতে জানিতে পারা গেল যে, বাঞ্ছারামের জীবিত অবস্থাতেও মনোহরের কেহ কোন সংবাদ পায় নাই। মনোহর দাস ভবানীনগর হইতে যে গিয়াছিল, সেই গিয়াছিল, কোথায় গেল বাঞ্ছারাম তাহার অনেক সন্ধান করিলেন; কিছুতেই কোন সংবাদ পাইলেন না। তখন তিনি উইলের এক ক্রোড়-পত্র সৃজন করিলেন। তাহাতে বিষ্ণুরাম সরকার নামক একজন কলিকাতানিবাসী আত্মীয় কুটুম্বকে উইলের একজিকিউটর নিযুক্ত করিলেন। তাহাতে কথা রহিল যে, তিনি সযত্নে মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিবেন। পশ্চাৎ ফলানুসারে সম্পত্তি যাহার প্রাপ্য, তাহাকে দিবেন।

বিষ্ণুরাম বাবু অতি বিচক্ষণ, নিরপেক্ষ এবং কর্ম্মঠ ব্যক্তি। তিনি বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পরেই মনোহর দাসের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন, অনেক পরিশ্রম ও অর্থ-ব্যয় করিয়া, যাহা বাঞ্ছারাম কর্ত্তৃক অনুসন্ধান হয় নাই, তাহার নিগূঢ় কথা পরিজ্ঞাত হইলেন। স্থূল বৃত্তান্ত অনুসন্ধানে এই জানা গেল যে, মনোহর ভবানীনগর হইতে পলাইয়া কিছুকাল সপরিবারে ঢাকা অঞ্চলে গিয়া বাস করেন। পরে সেখানে জীবিকানির্ব্বাহের জন্য কষ্ট হওয়াতে কলিকাতায় নৌকাযোগে আসিতে ছিলেন। পথিমধ্যে বাত্যায় পতিত হইয়া সপরিবারে জলমগ্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার আর উত্তরাধিকারী ছিল, এমন সন্ধান পাইলেন না।

বিষ্ণুরাম বাবু এ সকল কথার অকাট্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া রামসদয়কে দেখাইলেন। তখন বাঞ্ছারামের ভূসম্পত্তি শচীন্দ্রদিগের দুই ভ্রাতার হইল এবং বিষ্ণুরাম বাবুও তাহা তাঁহাদের হস্তে সমর্পণ করিলেন।

এক্ষণে এই রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর। রজনী হয় ত নিতান্ত দরিদ্রাবস্থাপন্না। সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালায় আসার পর একদা কোন গ্রাম্য কুটুম্বের বাড়ী নিমন্ত্রণে গিয়াছিলাম। প্রাতঃকালে গ্রাম পর্যটনে গিয়াছিলাম। এক স্থানে অতি মনোহর নিভৃত জঙ্গল; দয়েল সপ্তস্বর মিলাইয়া আশ্চর্য্য ঐকতানবাদ্য বাজাইতেছে, চারিদিকে বৃক্ষরাজি ঘনবিন্যস্ত কোমলশ্যামপল্লবদলে আচ্ছন্ন; পাতায় পাতায় ঠেসাঠেসি, মিশামিশি, শ্যামরূপের রাশি রাশি, কোথাও কলিকা, কোথাও স্ফুটিত পুষ্প, কোথাও অপক্ব, কোথাও সুপক্ব ফল। সেই বনমধ্যে আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলাম; বনাভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম, একজন বিকটমূর্ত্তি পুরুষ এক যুবতীকে বলপূর্ব্বক আক্রমণ করিতেছে।

দেখিবামাত্র বুঝিলাম, পুরুষ অতি নীচজাতীয়, পাষণ্ড—বোধ হয়, ডোম কি সিউলি—কোমরে দা'। গঠন অত্যন্ত বলবানের মত।

ধীরে ধীরে তাহার পশ্চাদ্ভাগে গেলাম। গিয়া তাহার কঙ্কাল হইতে দা'খানি টানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিলাম। দুষ্ট তখন যুবতীকে ছাড়িয়া দিল—আমার সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইল। আমাকে গালি দিল। তাহার দৃষ্টি দেখিয়া আমার শঙ্কা হইল।

বুঝিলাম, এস্থলে বিলম্ব অকর্ত্তব্য। একেবারে তাহার গলদেশে হস্তার্পণ করিলাম। ছাড়াইয়া সেও আমাকে ধরিল। আমিও তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিলাম। তাহার বল অধিক; কিন্তু আমি ভীত হই নাই বা অস্থির হই নাই। অবকাশ পাইয়া আমি যুবতীকে বলিলাম যে, তুই এ সময় পলা—আমি ইহার উপযুক্ত দণ্ড দিতেছি।

যুবতী বলিল, "কোথায় পলাইব? আমি যে অন্ধ! এখানকার পথ চিনি না।"

অন্ধ! আমার বল বাড়িল। আমি রজনী নামে একটি অন্ধকন্যাকে খুঁজিতেছিলাম।

দেখিলাম সেই বলবান পুরুষ আমাকে প্রহার করিতে পারিতেছে না বটে, কিন্তু আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া যাইতেছে। তাহার অভিপ্রায় বুঝিলাম, যে দিকে আমি দা ফেলিয়াছিলাম, সেই দিকে আমাকে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। আমি তখন দুষ্টকে ছাড়িয়া দিয়া আগে গিয়া দা কুড়াইয়া লইলাম। সে এক বৃক্ষের ডাল ভাঙ্গিয়া লইয়া তাহা ফিরাইয়া আমার হস্তে প্রহার করিল, আমার হস্ত হইতে দা পড়িয়া গেল; সে দা তুলিয়া লইয়া আমাকে তিন চারিস্থানে আঘাত করিয়া পলাইয়া গেল।

আমি গুরুতর পীড়া প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। বহুকষ্টে আমি কুটুম্বের গৃহাভিমুখে চলিলাম। অন্ধ যুবতী আমার পদশব্দানুসরণ করিয়া আমার সঙ্গে সঙ্গে আসিতে লাগিল; কিছুদূর গিয়া আর আমি চলিতে পারিলাম না। পথিকলোকে আমাকে ধরিয়া আমার কুটুম্বের বাড়ীতে রাখিয়া আসিল।

সেই স্থানে আমি কিছুকাল শয্যাগত রহিলাম—অন্য আশ্রয়াভাবেও বটে, এবং আমার দশা কি হয়, তাহা না জানিয়া কোথাও যাইতে পারে না, সে জন্যও বটে, অন্ধযুবতীও সেইখানে রহিল।

বহুদিনে বহুকষ্টে আমি আরোগ্যলাভ করিলাম।

মেয়েটি অন্ধ দেখিয়া অবধিই আমার সন্দেহ হইয়াছিল। যে দিন প্রথম সে আমার রুগ্নশয্যাপার্শ্বে আসিল, সেই দিনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার নাম কি গা?"

"রজনী।"

আমি চমকিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রাজচন্দ্র দাসের কন্যা?"

রজনীও বিস্মিত হইল। বলিল, "আপনি বাবাকে কি চেনেন?"

আমি স্পষ্টতঃ কোন উত্তর দিলাম না।

আমি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ করিলে রজনীকে কলিকাতায় লইয়া গেলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কলিকাতায় গমনকালে আমি একা রজনীকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলাম না। কুটুম্বগৃহ হইতে তিনকড়ি নামে একজন প্রাচীনা পরিচারিকা সমভিব্যাহারে লইয়া গেলাম। এ সতর্কতা রজনীর মন প্রসন্ন করিবার জন্য। গমনকালে রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, তোমাদের বাড়ী কলিকাতায়—কিন্তু তুমি এখানে আসিলে কি প্রকারে?"

রজনী বলিল, "আমাকে কি সকল কথা বলিতে হইবে?"

আমি বলিলাম, "তোমার যদি ইচ্ছা না হয়, তবে বলিও না।"

বস্তুত এই অন্ধ স্ত্রীলোকের বুদ্ধি, বিবেচনায় এবং সরলতায় আমি বিশেষ প্রীত হইয়াছিলাম। তাহাকে কোনপ্রকার ক্লেশ দিবার ইচ্ছা ছিল না। রজনী বলিল, "যদি অনুমতি করিলেন, তবে কতক কথা গোপন রাখিব। গোপাল বাবু বলিয়া

আমার একজন প্রতিবেশী আছেন, তাঁহার স্ত্রী চাঁপা, চাঁপার সঙ্গে আমার হঠাৎ পরিচয় হইয়াছিল। তাহার বাপের বাড়ী হুগলী। সে আমাকে বলিল, 'আমার বাপের বাড়ী যাইবে?' আমি রাজি হইলাম। সে আমাকে একদিন সঙ্গে করিয়া গোপাল বাবুর বাড়ীতে লইয়া আসিল। কিন্তু তার বাপের বাড়ী আমাকে পাঠাইবার সময় আপনি আমার সঙ্গে আসিল না। তাহার ভাই হীরালালকে আমার সঙ্গে দিল, হীরালালও নৌকা করিয়া আমায় হুগলী লইয়া চলিল।"

আমি এইখানে বুঝিতে পারিলাম যে, রজনী হীরালাল সম্বন্ধে কথা গোপন করিতেছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি তাহার সঙ্গে গেলে?"

রজনী বলিল, "ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাইতে হইল, কেন যাইতে হইল, তাহা বলিতে পারিব না। পথিমধ্যে হীরালাল আমার উপর অত্যাচার করিতে লাগিল। আমি তাহার বাধ্য নয় দেখিয়া সে আমাকে নিরাশ করিবার জন্য গঙ্গার এক চরে নামাইয়া দিয়া নৌকা লইয়া চলিয়া গেল।"

রজনী চুপ করিল। আমি হীরালালকে ছদ্মবেশী রাক্ষস মনে করিয়া মনে মনে তাহার রূপ ধ্যান করিতে লাগিলাম। তার পর রজনী বলিতে লাগিল, "সে চলিয়া গেলে আমি ডুবিয়া মরিব বলিয়া জলে ডুবিলাম।"

আমি বলিলাম, "কেন? তুমি কি হীরালালকে এত ভালবাসিতে?"

রজনী ভ্রূকুটি করিল। বলিল, "তিলার্দ্ধ না। পৃথিবীতে কাহারও উপর এত বিরক্ত নহি।"

"তবে ডুবিয়া মরিতে গেলে কেন?"

"আমার যে দুঃখ. তাহা আপনাকে বলিতে পারি না।"

"আচ্ছা, বলিয়া যাও।"

"আমি জলে ডুবিয়া ভাসিয়া উঠিলাম। একখানা গহনার নৌকা যাইতেছিল। সেই নৌকার লোক আমাকে ভাসিতে দেখিয়া উঠাইল। যে গ্রামে আপনার সহিত সাক্ষাৎ, সেইখানে একজন আরোহী নামিল। সে নামিবার সময়, আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কোথায় নামিবে? আমি বলিলাম, 'আমাকে যেখানে নামাইয়া দিবে, আমি সেইখানে নামিব।' তখন সে জিজ্ঞাসা করিল, 'তোমার বাড়ী কোথায়?' আমি বলিলাম, 'কলিকাতায়।' সে বলিল, 'আমি কালি আবার কলিকাতা যাইব। তুমি আজ আমার সঙ্গে আইস। আজি আমার বাড়ী থাকিবে। কালি তোমাকে কলিকাতায় রাখিয়া আসিব।' আমি আনন্দিত

হইয়া তাহার সঙ্গে উঠিলাম। সে আমাকে সঙ্গে লইয়া চলিল। তার পর আপনি সব জানেন।"

আমি বলিলাম, "যাহার হাত হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়াছিলাম, সেকি সেই?"

"সে সেই।"

আমি রজনীকে কলিকাতায় আনিয়া তাহার কথিত স্থানে অন্বেষণ করিয়া রাজচন্দ্র দাসের বাড়ী পাইলাম। সেইখানে রজনীকে লইয়া গেলাম।

রাজচন্দ্র কন্যা পাইয়া বিশেষ আনন্দ প্রকাশ করিল, তাহার স্ত্রী অনেক রোদন করিল। উহারা আমার কাছে রজনীর বৃত্তান্ত সবিশেষ শুনিয়া বিশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল।

পরে রাজচন্দ্রকে আমি নিভৃতে লইয়া গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার কন্যা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল কেন? জান?"

রাজচন্দ্র বলিল, "না। আমি তাহা সর্ব্বদাই ভাবি, কিন্তু কিছুই ঠিকানা করিতে পারি নাই।"

আমি বলিলাম, "রজনী জলে ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিল কি দুঃখে জান?"

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "রজনীর এমন কি দুঃখ, কিছুই ত ভাবিয়া পাই নাই। সে অন্ধ, একটি বড় দুঃখ বটে, কিন্তু তার জন্য এত দিনের পর ডুবিয়া মরিতে যাইবে কেন? তবে এত বড় মেয়ে, আজও তাহার বিবাহ হয় নাই। কিন্তু তাহার জন্যও নয়; তাহার ত সম্বন্ধ করিয়া বিবাহ দিতেছিলুম। বিবাহের আগের রাত্রেই পলাইয়াছিল।"

আমি নূতন কথা পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে পলাইয়াছিল?"

রাজ। হাঁ।

আমি। তোমাদিগকে না বলিয়া?

রাজ। কাহাকেও না বলিয়া।

আমি। কাহার সহিত সম্বন্ধ করিয়াছিলে?

রাজ। গোপাল বাবুর সঙ্গে।

আমি। কে গোপাল বাবু? চাঁপার স্বামী?

রাজ। আপনি সবই ত জানেন। সেই বটে।

আমি একটু আলো দেখিলাম, তবে চাঁপা সপত্নীযন্ত্রণাভয়ে রজনীকে প্রবঞ্চনা

করিয়া ভ্রাতৃসঙ্গে হুগলী পাঠাইয়াছিল। বোধ হয়, তাহারই পরামর্শে হীরালাল উহার বিনাশে উদ্যোগ পাইয়াছিল।

সে কথা কিছু না বলিয়া রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "আমি সবই জানি। আমি আরও যাহা জানি, তোমায় বলিতেছি। তুমি কিছু লুকাইও না।"

রাজ। কি—আজ্ঞা করুন।

আমি। রজনী তোমার কন্যা নহে।

রাজচন্দ্র বিস্মিত হইল। বলিল, "সে কি, আমার মেয়ে নয় ত কাহার?"

"হরেকৃষ্ণ দাসের।"

রাজচন্দ্র কিছুক্ষণ নীরব রহিল। শেষে বলিল, "আপনি কে, তাহা জানি না। কিন্তু আপনার পায়ে পড়ি, এ কথা রজনীকে বলিবেন না।"

আমি। এখন বলিব না, কিন্তু বলিতে হইবে। আমি যাহা জিজ্ঞাসা করি, তাহার সত্য উত্তর দাও। যখন হরেকৃষ্ণ মরিয়া যায়, তখন রজনীর কিছু অলঙ্কার ছিল?

রাজচন্দ্র ভীত হইল। বলিল, "আমি ত তাহার অলঙ্কারের কথা কিছু জানি না। অলঙ্কার কিছুই পাই নাই।"

আমি। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তুমি তাহার ত্যক্ত সম্পত্তির সন্ধানে সে দেশে আর গিয়াছিলে?

রাজ। হাঁ গিয়াছিলাম। গিয়া শুনিলাম, হরেকৃষ্ণের যাহা কিছু ছিল, তাহা পুলিসে লইয়া গিয়াছে।

আমি। তাহাতে তুমি কি করিলে?

রাজ। আর কি করিব? আমি পুলিসকে বড় ভয় করি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমায় বড় ভুগিয়াছিলাম। আমি পুলিসের নাম শুনিয়া আর কিছু বলিলাম না।

আমি। রজনীর বালাচুরি মোকদ্দমা কিরূপ?

রাজ। রজনীর অন্নপ্রাশনের সময় তাহার বালা চুরি গিয়াছিল। চোর ধরা পড়িয়াছিল। বর্দ্ধমানে তাহার মোকদ্দমা হইয়াছিল। এই কলিকাতা হইতে বর্দ্ধমানে আমাকে সাক্ষ্য দিতে যাইতে হইয়াছিল। বড় ভুগিয়াছিলাম।

আমি পথ দেখিতে পাইলাম।

———

তৃতীয় খণ্ড

শচীন্দ্র বক্তা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।

আমি রজনীর বিবাহের সকল উদ্যোগ করিয়াছিলাম—বিবাহের দিন প্রাতে শুনিলাম যে, রজনী পলাইয়াছে, তাহাকে আর পাওয়া যায় না। তাহার অনেক অনুসন্ধান করিলাম, পাইলাম না। কেহ বলিল, সে ভ্রষ্টা। আমি বিশ্বাস করিলাম না। আমি তাহাকে অনেকবার দেখিয়াছিলাম, শপথ করিতে পারি, সে কখন ভ্রষ্টা হইতে পারে না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সে কুমারী, কৌমার্য্যাবস্থাতেই কাহারও প্রণয়াসক্ত হইয়া বিবাহাশঙ্কায় গৃহত্যাগ করিয়াছে। কিন্তু ইহাতেও দুইটি আপত্তি ; – প্রথম, যে অন্ধ, সে কি প্রকারে সাহস করিয়া আশ্রয় ত্যাগ করিয়া যাইবে? দ্বিতীয়তঃ, যে অন্ধ, সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম, কদাচ না। কেহ হাসিও না, আমার মত গণ্ডমূর্খ অনেক আছে। আমরা খান দুই তিন বহি পড়িয়া মনে করি জগতে চেতনাচেতনের গূঢ়াদপি গূঢ়তত্ত্ব সকলই নখদর্পণ করিয়া ফেলিয়াছি ; যাহা আমাদের বুদ্ধিতে ধরে না, তাহা বিশ্বাস করি না। ঈশ্বর মানি না, কেন না, আমাদের ক্ষুদ্র বিচারশক্তিতে সে বৃহতত্ত্বের মীমাংসা করিয়া উঠিতে পারি না। অন্ধের রূপোন্মাদ কি প্রকারে বুঝিব? সন্ধান করিতে করিতে জানিলাম যে, যে রাত্রি হইতে রজনী অদৃশ্য হইয়াছে, সেই রাত্রি হইতে হীরালালও অদৃশ্য হইয়াছে। সকলে বলিতে লাগিল, হীরালালের সঙ্গে সে কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে। অগত্যা আমি এই সিদ্ধান্ত করিলাম যে, হীরালাল রজনীকে ফাঁকি দিয়া লইয়া গিয়াছে। রজনী পরমা সুন্দরী, কাণা হউক, এমন লোক নাই যে, তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না। হীরালাল তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে বঞ্চনা করিয়া লইয়া গিয়াছে, অন্ধকে বঞ্চনা করা বড় সুসাধ্য।

কিছু দিন পরে হীরালাল দেখা দিল। আমি তাহাকে বলিলাম, "তুমি রজনীর সংবাদ জান?"

সে বলিল, "না।"

কি করিব! নালিশ-ফরিয়াদ হইতে পারে না। আমার জ্যেষ্ঠকে বলিলাম। জ্যেষ্ঠ বলিলেন, "রাস্কালকে মার।" কিন্তু মারিয়া কি হইবে? আমি সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিতে আরম্ভ করিলাম। যে রজনীর সন্ধান দিবে, তাহাকে অর্থ পুরস্কার দিব ঘোষণা করিলাম। কিছু ফল ফলিল না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

রজনী জন্মান্ধ, কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না। চক্ষে দেখিতে কোন দোষ নাই। চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমর কৃষ্ণতারাবিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু—কিন্তু কটাক্ষ নাই। চাক্ষুষ স্নায়ুর দোষে অন্ধ। স্নায়ুর নিশ্চেষ্টতাবশতঃ রেটিনাস্থিত প্রতিবিম্ব মস্তিষ্কে গৃহীত হয় না। রজনী সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদপ্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গভীর; গতি অঙ্গভঙ্গী সকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্ব্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থিরপ্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া, কোন ভাস্কর্য্যপটু শিল্পকরের যত্ননির্ম্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্ত্তি বলিয়া বোধ হইত।

রজনীকে প্রথম দেখিয়াই আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই সৌন্দর্য্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে। রজনী রূপবতী, কিন্তু তাহার রূপ দেখিয়া কেহ কখনও পাগল হইবে না। তাহার চক্ষের সে মোহিনী গতি নাই। সৌন্দর্য্য দেখিয়া লোকে প্রশংসা করিবে, বোধ হয়, সে মূর্ত্তি সহজে ভুলিবেও না। কেন না, সে স্থির গম্ভীর কান্তির একটি অদ্ভুত আকর্ষণী-শক্তি আছে। কিন্তু সেই আকর্ষণ অন্যবিধ; ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। যাহাকে "পঞ্চবাণ" বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ নাই। নাই কি?

সে যাহাই হউক—আমি মধ্যে মধ্যে চিন্তা করিতাম—রজনীর দশা কি হইবে? সে ইতর লোকের কন্যা, কিন্তু তাহাকে দেখিয়াই বোধ হয় যে, সে ইতরপ্রকৃতি-বিশিষ্ট নহে। ইতর লোক ভিন্ন তাহার অন্যত্র বিবাহের সম্ভাবনা নাই। ইতর লোকের সঙ্গেও এতকালে বিবাহ ঘটে নাই। দরিদ্রের ভার্য্যা গৃহকর্ম্মের জন্য।

যে ভার্য্যার অন্ধতানিবন্ধন গৃহকর্ম্মের সাহায্য হইবে না - তাহাকে কোন্ দরিদ্র বিবাহ করিবে ? কিন্তু ইতর লোক ভিন্ন এই ইতরবৃত্তি-পরায়ণ কায়স্থের কন্যাকে কে বিবাহ করিবে ? তাহাতে আবার এ অন্ধ। এরূপ স্বামীর সহবাসে রজনীর দুঃখ ভিন্ন সুখের সম্ভাবনা নাই। দুশ্ছেদ্য কণ্টককাননমধ্যে যত্নপালনীয় উদ্যান-পুষ্পের জন্মের ন্যায় এই রজনীর পুষ্পবিক্রেতার গৃহে জন্ম ঘটিয়াছে। কণ্টকাবৃত হইয়াই ইহাকে মরিতে হইবে। তবে আমি গোপালের সঙ্গে ইহার বিবাহ দিবার জন্য এত ব্যস্ত কেন ? ঠিক জানি না। তবে ছোটমার দৌরাত্ম্য বড় ; তাঁহার উত্তেজনাতে ইহার বিবাহ দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম। আর বলিতে কি, যাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিতে না পারি তাহার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করে।

এই কথা শুনিয়া অনেক সুন্দরী মধুর হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, তোমার মনে মনে রজনীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা আছে কি ? না, সে ইচ্ছা নাই। রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ, রজনী পুষ্পবিক্রেতার কন্যা এবং রজনী অশিক্ষিতা। রজনীকে আমি বিবাহ করিতে পারি না, ইচ্ছাও নাই। আমার বিবাহে অনিচ্ছাও নাই। তবে মনোমত কন্যা পাই না। আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে, অথচ বিদ্যুৎ-কটাক্ষবর্ষিণী হইবে ; বংশমর্য্যাদায় শাহ আলমের বা মহল্লাররাও হুল্কারের প্র-পরাপ-সং পৌত্রী হইবে, বিদ্যায় লীলাবতী বা শাপভ্রষ্টা সরস্বতী হইবে এবং পতিভক্তিতে সাবিত্রী হইবে ; চরিত্রে লক্ষ্মী, রন্ধনে দ্রৌপদী, আদরে সত্যভামা এবং গৃহকর্ম্মে গদার মা। আমি পান খাইবার সময় পানের লবঙ্গ খুলিয়া দিবে, তামাকু খাইবার সময়ে হুঁকায় কলিকা আছে কি না, বলিয়া দিবে, আহারের সময়ে মাছের কাঁটা বাছিয়া দিবে এবং স্নানের পর গা মুছিয়াছি কি না, তদারক করিবে। আমি চা খাইবার সময়ে দোয়াতের ভিতরে চামচে পুরিয়া চার অনুসন্ধান না করি এবং কালির অনুসন্ধানে চার পাত্রমধ্যে কলম না দিই, তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিবে ; পিক্দানীতে টাকা রাখিয়া বাক্সের ভিতর ছেপ না ফেলি তাহার খবরদারী করিবে। বন্ধুকে পত্র লিখিয়া আপনার নামে শিরোনামা দিলে, সংশোধন করাইয়া লইবে, পয়সা দিতে টাকা দিতেছি কি না, খবর লইবে ; নোটের পিঠে দোকানের চিঠি কাটিতেছি কি না দেখিবে, এবং তামাসা করিবার সময়ে বিয়ানের নামের পরিবর্ত্তে ভক্তিমতী প্রতিবাসিনীর নাম করিলে ভুল সংশোধন করিয়া লইবে। ঔষুধ খাইতে ফুলেল তৈল না খাই, চাকরাণীর নাম ডাকিতে হৌসের সাহেবের মেমের নাম না ধরি, এ সকল বিষয়ে সর্ব্বদা সতর্ক থাকিবে। এমন কন্যা পাই, তবে বিবাহ করি। আপনারা যে ইনি ওঁকে টিপিয়া হাসিতেছেন আপনাদের মধ্যে যদি

কেহ অবিবাহিতা এবং এই সকল গুণে গুণবতী থাকেন, তবে বলুন, আমি পুরোহিত ডাকি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

শেষে রাজচন্দ্র দাসের কাছে শুনিতে পাইলাম যে, রজনীকে পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু রাজচন্দ্র দাস এ বিষয়ে আমাদিগের সঙ্গে বড় চমৎকার ব্যবহার করিতে লাগিল। রজনীকে কোথায় পাওয়া গেল, কি প্রকারে পাওয়া গেল, তাহা কিছুই বলিল না। আমরা অনেক জিজ্ঞাসা করিলাম, কিছুতেই কোন কথা বাহির করিতে পারিলাম না। সে কেনই বা গৃহত্যাগ করিয়া গিয়াছিল, তাহাও জিজ্ঞাসাবাদ করিলাম,—তাহাও বলিল না। তাহার স্ত্রীও ঐরূপ - ছোট মা স্থচির ন্যায় লোকের মনের ভিতর প্রবেশ করেন, কিন্তু তাহার কাছ হইতে কোন কথাই বাহির করিতে পারিলেন না। রজনী স্বয়ং আর আমাদের বাড়ীতে আসিত না। কেন আসিত না, তাহাও কিছু জানিতে পারিলাম না। শেষে রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রীও আমাদিগের বাড়ী আসা পরিত্যাগ করিল। ছোট মা কিছু দুঃখিত হইয়া তাহাদিগের অনুসন্ধানে লোক পাঠাইলেন। লোক ফিরিয়া আসিয়া বলিল যে, উহারা সপরিবারে অন্যত্র উঠিয়া গিয়াছে, সাবেক বাড়ীতে আর নাই। কোথায় গিয়াছে, তাহার কোন ঠিকানা করিতে পারিলাম না। ইহার এক মাস পরে একজন ভদ্রলোক আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন। তিনি আসিয়াই আপনি আত্মপরিচয় দিলেন। "আমার নিবাস কলিকাতায় নহে। আমার নাম অমরনাথ ঘোষ, আমার নিবাস শান্তিপুর।"

তখন আমি তাঁহার সঙ্গে কথোপকথনে নিযুক্ত হইলাম। কি জন্য তিনি আসিয়াছিলেন, আমি তাঁহাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিতে পারিলাম না। তিনিও প্রথমে কিছু বলিলেন না। সুতরাং সামাজিক ও রাজকীয় বিষয়ঘটিত নানা কথাবার্ত্তা হইতে লাগিল। দেখিলাম, তিনি কথাবার্ত্তায় অত্যন্ত বিচক্ষণ। তাঁহার বুদ্ধি মার্জ্জিত, শিক্ষা সম্পূর্ণ এবং চিন্তা বহুদূরগামিনী। কথাবার্ত্তায় একটু অবসর পাইয়া তিনি আমার টেবিলের উপরে স্থিত "সেক্ষপিয়র গেলেরির" পাতা উল্টাইতে লাগিলেন। ততক্ষণ আমি অমরনাথকে দেখিয়া লইতে লাগিলাম। অমরনাথ দেখিতে সুপুরুষ, গৌরবর্ণ, কিঞ্চিৎ খর্ব্ব, স্থূলও নহে, শীর্ণও নহে; বড় বড় চক্ষু,

কেশগুলি সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত, যত্ন-রঞ্জিত। বেশভূষার পারিপাট্যের বাড়াবাড়ি নাই, কিন্তু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বটে। তাঁহার কথা কহিবার ভঙ্গী অতি মনোহর; কণ্ঠ অতি সুমধুর। দেখিয়া বুঝিলাম, লোক অতি সুচতুর।

সেক্ষপিয়র গেলেরির পাতা উল্টান শেষ হইলে অমরনাথ নিজ প্রয়োজনের কথা কিছু না বলিয়া ঐ পুস্তকস্থিত চিত্র সকলের সমালোচনা আরম্ভ করিলেন। আমাকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যাহা বাক্য এবং কার্য্য দ্বারা চিত্রিত হইয়াছে, তাহা চিত্রফলকে চিত্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া ধৃষ্টতার কাজ। সে চিত্র কখনই সম্পূর্ণ হইতে পারে না এবং এ সকল চিত্র সম্পূর্ণ নহে। ডেস্‌ডেমনার চিত্র দেখিয়া কহিলেন, "আপনি এই চিত্রে ধৈর্য্য, মাধুর্য্য, নম্রতা পাইতেছেন, কিন্তু ধৈর্য্যের সহিত সে সাহস কৈ? নম্রতার সঙ্গে সে সতীত্বের অহঙ্কার কৈ?" জুলিয়েটের মূর্ত্তি দেখাইয়া কহিলেন, "এ নব যুবতীর মূর্ত্তি বটে, কিন্তু ইহাতে জুলিয়েটের নব-যৌবনের অদমনীয় চাঞ্চল্য কৈ?"

অমরনাথ এইরূপে কত বলিতে লাগিলেন। সেক্ষপিয়রের নায়িকাগণ হইতে শকুন্তলা, সীতা, কাদম্বরী, বাসবদত্তা, রুক্মিণী, সত্যভামা প্রভৃতি আসিয়া পড়িল। অমরনাথ একে একে তাঁহাদিগের চরিত্রের বিশ্লেষণ করিলেন। প্রাচীন সাহিত্যের কথায় ক্রমে প্রাচীন ইতিহাসের কথা আসিয়া পড়িল, তৎপ্রসঙ্গে তাসিতস্, প্লুটার্ক, থুকিদিদিস প্রভৃতির অপূর্ব্ব সমালোচনার অবতারণা হইল। প্রাচীন ইতিবৃত্ত-লেখকদিগের মত লইয়া অমরনাথ কোম্‌তের ত্রৈকালিক উন্নতি-সম্বন্ধীয় মতের সমর্থন করিলেন। কোম্‌ৎ হইতে তাঁহার সমালোচক মিল ও হক্‌স্‌লীর কথা আসিল। হক্‌স্‌লী হইতে ওয়েন্ ও ডারুইন, ডারুইন হইতে বুকনেয়র, সোপেনহয়র প্রভৃতির সমালোচনা আসিল। অমরনাথ অপূর্ব্ব পাণ্ডিত্যস্রোত আমার কর্ণরন্ধ্রে প্রেরণ করিতে লাগিলেন। আমি মুগ্ধ হইয়া আসল কথা ভুলিয়া গেলাম।

বেলা গেল দেখিয়া অমরনাথ বলিলেন, "মহাশয়কে আর বিরক্ত করিব না। যে জন্য আসিয়াছিলাম, তাহা এখনও বলা হয় নাই। রাজচন্দ্র দাস যে আপনাদিগকে ফুল বেচিত, তাহার একটি কন্যা আছে?"

আমি বলিলাম, "আছে বোধ হয়।"

অমরনাথ ঈষৎ হাসিয়া বলিলেন, "বোধ হয় নয়, সে আছে। আমি তাহাকে বিবাহ করিব স্থির করিয়াছি।"

আমি অবাক্ হইলাম। অমরনাথ বলিতে লাগিলেন, "আমি রাজচন্দ্রের নিকট এই কথা বলিতেই গিয়াছিলাম। তাহাকে বলা হইয়াছে। এক্ষণে আপনাদিগের

সঙ্গে একটা কথা আছে। যে কথা বলিব, তাহা মহাশয়ের পিতার কাছে বলাই আমার উচিত। কেন না, তিনি কর্ত্তা, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহাতে আপনাদিগের রাগ করিবার কথা। আপনি সর্ব্বাপেক্ষা স্থিরস্বভাব এবং ধর্ম্মজ্ঞ, এ জন্য আপনাকে বলিতেছি।"

আমি বলিলাম, "কি কথা মহাশয় ?"

অমর। রজনীর কিছু বিষয় আছে।

আমি। সে কি ? সে যে রাজচন্দ্রের কন্যা।

অমর। রাজচন্দ্রের পালিত কন্যা মাত্র।

আমি। তবে সে কাহার কন্যা ? কোথায় বিষয় পাইল ? এ কথা আমরা এতদিন কিছু শুনিলাম না কেন ?

অমর। আপনারা যে সম্পত্তি ভোগ করিতেছেন, ইহাই রজনীর। রজনী মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্কন্যা।

একবার চমকিয়া উঠিলাম। তারপর বুঝিলাম যে, কোন জালসাজ জুয়াচোরের হাতে পড়িয়াছি। প্রকাশ্যে উচ্চহাস্য করিয়া বলিলাম, "মহাশয়কে নিষ্কর্ম্মা লোক বলিয়া বোধ হইতেছে। আমার অনেক কর্ম্ম আছে। এক্ষণে আপনার সঙ্গে রহস্যের আমার অবসর নাই। আপনি গৃহে গমন করুন।"

অমরনাথ বলিলেন, "তবে উকীলের মুখে সংবাদ শুনিবেন।"

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এদিকে বিষ্ণুরাম বাবু সংবাদ পাঠাইয়া দিলেন যে, মনোহর দাসের উত্তরাধিকারী উপস্থিত হইয়াছে,—বিষয় ছাড়িয়া দিতে হইবে। অমরনাথ তবে জুয়াচোর জালসাজ নহে।

কে উত্তরাধিকারী, তাহা বিষ্ণুরাম বাবু প্রথমে কিছু বলেন নাই। কিন্তু অমরনাথের কথা স্মরণ হইল। বুঝি রজনীই উত্তরাধিকারিণী। যে ব্যক্তি দাবিদার, সে যে মনোহর দাসের যথার্থ উত্তরাধিকারী, তদ্বিষয়ে নিশ্চয়তা আছে কিনা, ইহা জানিবার জন্য বিষ্ণুরাম বাবুর কাছে গেলাম। আমি বলিলাম, "মহাশয় পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন যে, মনোহর দাস সপরিবারে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে। তাহার প্রমাণও আছে, তবে তাহার আবার ওয়ারিস আসিল কোথা হইতে ?"

বিষ্ণুরাম বাবু বলিলেন, "হরেকৃষ্ণ দাস নামে তাহার এক ভাই ছিল, জানেন বোধ হয় ?"

আমি। তা ত জানি—কিন্তু সেও ত মরিয়াছে।

বিষ্ণু। বটে, কিন্তু মনোহরের পরে মরিয়াছে; সুতরাং সে বিষয়ের অধিকারী হইয়া মরিয়াছে।

আমি। তা হৌক, কিন্তু হরেকৃষ্ণেরও ত এক্ষণে কেহ নাই।

বিষ্ণু। পূর্ব্বে তাহাই মনে করিয়া আপনাদিগকে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে জানিতেছি যে, তাহার এক কন্যা আছে।

আমি। তবে এত দিন সে কন্যার কোন প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই কেন ?

বিষ্ণু। হরেকৃষ্ণের স্ত্রী তাহার পূর্ব্বে মরে। স্ত্রীর মৃত্যুর পরে শিশুকন্যাকে পালন করিতে অক্ষম হইয়া হরেকৃষ্ণ কন্যাটিকে তাহার শ্যালীকে দান করে। তাহার শ্যালী ঐ কন্যাটিকে আত্মকন্যাবৎ প্রতিপালন করে এবং আপনার বলিয়া পরিচয় দেয়। হরেকৃষ্ণের মৃত্যুর পর তাহার সম্পত্তি লাওয়ারেশ বলিয়া ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক গৃহীত হওয়ার প্রমাণ পাইয়া আমি হরেকৃষ্ণকে লাওয়ারেশ মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু এক্ষণে হরেকৃষ্ণের একজন প্রতিবাসী আমার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার কন্যার কথা প্রকাশ করিয়াছে। আমি তাহার প্রদত্ত সন্ধানের অনুসরণ করিয়া জানিয়াছি যে, তাহার কন্যা আছে বটে।

আমি বলিলাম, "যে হয় একটা মেয়ে ধরিয়া হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা বলিয়া ধূর্ত্ত লোকে উপস্থিত করিতে পারে। কিন্তু সে যে যথার্থ হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তাহার কিছু প্রমাণ আছে কি ?'

"আছে" বলিয়া বিষ্ণুরাম বাবু আমাকে একটা কাগজ দেখিতে দিলেন; বলিলেন, "এ বিষয়ে যে যে প্রমাণ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা উহাতে ইয়াদদাস্ত করিয়া রাখিয়াছি।"

আমি ঐ কাগজ লইয়া পড়িতে লাগিলাম। তাহাতে পাইলাম যে, হরেকৃষ্ণ দাসের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাস এবং হরেকৃষ্ণের কন্যার নাম রজনী।

যাহা প্রমাণ দেখিলাম, তাহা ভয়ানক বটে। আমরা এতদিন অন্ধ রজনীর ধনে ধনী হইয়া তাহাকে দরিদ্র বলিয়া ঘৃণা করিতেছিলাম।

বিষ্ণুরাম এক জোবানবন্দীর জাবেদা নকল আমার হাতে দিয়া বলিলেন, "এক্ষণে দেখুন, এই জোবানবন্দী কাহার ?"

আমি পড়িয়া দেখিলাম যে, জোবানবন্দীর বক্তা হরেকৃষ্ণ দাস; ম্যাজিষ্ট্রেটের

সম্মুখে তিনি এক বালা চুরির মোকদ্দমায় এই জোবানবন্দী দিতেছেন। জোবানবন্দীতে পিতার নাম ও বাসস্থান লেখা থাকে তাহাও পড়িয়া দেখিলাম, তাহা মনোহর দাসের পিতার নাম ও বাসস্থানের সঙ্গে মিলিল। বিষ্ণুরাম জিজ্ঞাসা করিলেন, "মনোহর দাসের ভাই হরেকৃষ্ণের এই জোবানবন্দী বলিয়া আপনার বোধ হইতেছে কিনা ?"

আমি। বোধ হইতেছে।

বিষ্ণু। যদি সংশয় থাকে, তবে এখনি তাহা ভঞ্জন হইবে। পড়িয়া যাউন।

পড়িতে লাগিলাম যে, সে বলিতেছে, "আমার ছয় মাসের একটি কন্যা আছে। এক সপ্তাহ হইল, তাহার অন্নপ্রাশন দিয়াছি। অন্নপ্রাশনের দিন বৈকালে তাহার বালা চুরি গিয়াছে।"

এই পর্য্যন্ত পড়িয়া দেখিলে, বিষ্ণুরাম বলিলেন, "দেখুন, কত দিনের জোবানবন্দী ?"

জোবানবন্দীর তারিখ দেখিলাম, জোবানবন্দী উনিশ বৎসরের।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "ঐ কন্যার বয়স এক্ষণে হিসাবে কত হয় ?"

আমি। উনিশ বৎসর কয় মাস—প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। রজনীর বয়স কত অনুমান করেন ?

আমি। প্রায় কুড়ি।

বিষ্ণু। পড়িয়া যাউন, হরেকৃষ্ণ কিছু পরে বালিকার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

আমি পড়িতে লাগিলাম। দেখিলাম, যে, একস্থানে হরেকৃষ্ণ পুনঃপ্রাপ্ত বালা দেখিয়া বলিতেছেন, "এই বালা আমার কন্যা রজনীর বালা বটে।"

আর বড় সংশয়ের কথা রহিল না—তথাপি পড়িতে লাগিলাম। প্রতিবাদীর মোক্তার হরেকৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তুমি দরিদ্র লোক। তোমার কন্যাকে সোণার বালা দিলে কি প্রকারে ?" হরেকৃষ্ণ দাস উত্তর দিতেছে, "আমি গরীব, কিন্তু আমার ভাই মনোহর দাস দশ টাকা উপার্জ্জন করেন। তিনি আমার মেয়েকে সোণার গহনাগুলি দিয়াছেন।"

তবে যে এই হরেকৃষ্ণ দাস আমাদিগের মনোহর দাসের ভাই, তদ্বিষয়ে আর সংশয়ের স্থান রহিল না।

পরে মোক্তার আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন, "তোমার ভাই তোমার পরিবার বা তোমার আর কাহাকে কখন অলঙ্কার দিয়াছে ?"

উত্তর। না।

পুনশ্চ প্রশ্ন। সংসার-খরচ দেয় ?

উত্তর। না।

প্রশ্ন। তবে তোমার কন্যাকে অন্নপ্রাশনে সোণার গহনা দিবার কারণ কি ?

উত্তর। আমার এই মেয়েটি জন্মান্ধ, সে জন্য আমার স্ত্রী সর্ব্বদা কাঁদিয়া থাকে আমার ভাই ও ভাইজ তাহাতে দুঃখিত হইয়া আমাদিগের মনোদুঃখ যদি কিছু নিবারণ হয়, এই ভাবিয়া অন্নপ্রাশনের সময় মেয়েটিকে এই গহনাগুলি দিয়াছেন।

জন্মান্ধ। তবে যে সে রজনী, তদ্বিষয়ে আর সংশয় কি ?

আমি হতাশ হইয়া জোবানবন্দী রাখিয়া দিলাম। বলিলাম, "আমার আর বড সন্দেহ নাই।"

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "অত অল্প প্রমাণে আপনাকে সন্তুষ্ট হইতে বলি না। আর একটা জোবানবন্দীর নকল দেখুন।"

দ্বিতীয় জোবানবন্দীও দেখিলাম যে, উহাও ঐ কথিত বালা চুরির মোকদ্দমায় গৃহীত হইয়াছিল। সেই জোবানবন্দীতে বক্তা রাজচন্দ্র দাস। তিনি একমাত্র কুটুম্ব বলিয়া ঐ অন্নপ্রাশনে উপস্থিত ছিলেন। তিনি হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিতেছেন এবং চুরির বিষয় সকল সপ্রমাণ করিতেছেন।

বিষ্ণুরাম বলিলেন, "উপস্থিত রাজচন্দ্র দাস সেই রাজচন্দ্র দাস। সংশয় থাকে, ডাকিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করুন।"

আমি বলিলাম, "নিষ্প্রয়োজন।"

বিষ্ণুরাম আরও কতকগুলি দলিল দেখাইলেন, সে সকলের বৃত্তান্ত সবিস্তারে বলিতে গেলে সকলের ভাল লাগিবে না। ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, এই রজনীদাসী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা, তদ্বিষয়ে আমার সংশয় রহিল না। তখন দেখিলাম, বৃদ্ধ পিতামাতা লইয়া অন্নের জন্য কাতর হইয়া বেড়াইব।

বিষ্ণুরামকে বলিলাম, "মোকদ্দমা করা বৃথা। বিষয় রজনী দাসীর, তাহার বিষয় তাহাকে ছাড়িয়া দিব। তবে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর এ বিষয়ে আমার সঙ্গে তুল্যাধিকারী, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার অপেক্ষা রহিল মাত্র।"

আমি একবার আদালতে গিয়া আসল জোবানবন্দী দেখিয়া আসিলাম। এখন পুরাণ নথি ছিঁড়িয়া ফেলে, তখন রাখিত ; আসল দেখিয়া জানিলাম যে, নকলে কোন কোন কৃত্রিমতা নাই।

বিষয় রজনীকে ছাড়িয়া দিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

রজনীকে বিষয় ছাড়িয়া দিলাম, কিন্তু কেহ ত সে বিষয় দখল করিল না।

রাজচন্দ্র দাস একদিন দেখা করিতে আসিল। তাহার মুখে শুনিলাম যে, সে সিমলায় একটি বাড়ী কিনিয়া সেইখানে রজনীকে লইয়া আছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, "টাকা কোথায় পাইলে?" রাজচন্দ্র বলিল, "অমরনাথ কর্জ্জ দিয়াছেন, পশ্চাৎ বিষয় হইতে শোধ হইবে।" জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "তবে তোমরা বিষয় দখল লইতেছ না কেন?" তাহাতে সে বলিল, "সে সকল কথা অমরনাথবাবু জানেন।" "অমরনাথবাবু কি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন?" তাহাতে রাজচন্দ্র বলিল, "না।" পরে রাজচন্দ্রের সঙ্গে কথোপকথন করিতে করিতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "রাজচন্দ্র, তোমায় এতদিন দেখি নাই কেন?"

রাজচন্দ্র বলিল, "একটু গা-ঢাকা হইয়াছিলাম।"

আমি। কার কি চুরি করিয়াছ যে, গা-ঢাকা হইয়াছিলে?

রাজ। চুরি করিব কার? তবে অমরনাথ বাবু বলিয়াছিলেন যে, এখন বিষয় লইয়া গোলযোগ হইতেছে, এখন একটু আড়াল হওয়া ভাল। মানুষের চক্ষুলজ্জা আছে ত?

আমি। অর্থাৎ পাছে আমরা কিছু ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করি। অমরনাথ বাবু বিজ্ঞ লোক দেখিতেছি। তা যাই হউক, এখন যে বড় দেখা দিলে?

রাজ। আপনার ঠাকুর আমাকে ডাকাইয়াছেন।

আমি। আমার ঠাকুর? তিনি তোমার সন্ধান পাইলেন কি প্রকারে?

রাজ। খুঁজিয়া খুঁজিয়া।

আমি। এত খোঁজাখুঁজি কেন? তোমায় বিষয় ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিবার জন্য নয় ত?

রাজ। না না—তা কেন – তা কেন? আর একটা কথার জন্য। এখন রজনীর কিছু বিষয় হইয়াছে শুনিয়া অনেক সম্বন্ধ আসিতেছে। তা কোথায় সম্বন্ধ করি—তাই আপনাদের জিজ্ঞাসা করিতে আসিয়াছি।

আমি। কেন, অমরনাথ বাবুর সঙ্গে ত সম্বন্ধ হইতেছিল? তিনি এত করিয়া রজনীর বিষয় উদ্ধার করিলেন, তাঁহাকে ছাড়া কাহাকে বিবাহ দিবে?

রাজ। যদি তাঁর অপেক্ষাও ভাল পাত্র পাই?

আমি। অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র কোথায় পাইবে?

রাজ। মনে করুন, আপনি যেমন, এমনই পাত্র যদি পাই ?

আমি একটু চমকিলাম। বলিলাম, "তাহা হইলে অমরনাথের অপেক্ষা ভাল পাত্র হইল না। কিন্তু ছেঁদো কথা ছাড়িয়া দাও—তুমি আমার সঙ্গে রজনীর সম্বন্ধ করিতে আসিয়াছ ?"

রাজচন্দ্র একটু কুণ্ঠিত হইল। বলিল, "হাঁ তাই বটে। এ সম্বন্ধ করিতেই কর্ত্তা আমাকে ডাকাইয়াছিলেন।"

শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম। সম্মুখে দারিদ্র্য রাক্ষসকে দেখিয়া ভীত হইয়া পিতা যে এই সম্বন্ধ করিতেছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম—রজনীকে আমি বিবাহ করিলে ঘরের বিষয় ঘরে থাকিবে। আমাকে অন্ধ পুষ্পনারীর কাছে বিক্রয় করিয়া, পিতা বিক্রয়মূল্যস্বরূপ হৃতসম্পত্তি পুনঃপ্রাপ্ত হইবেন। শুনিয়া হাড় জ্বলিয়া গেল।

রাজচন্দ্রকে বলিলাম, "তুমি এখন যাও। কর্ত্তার সঙ্গে আমার সে কথা হইবে।"

আমার রাগ দেখিয়া রাজচন্দ্র পিতার কাছে গেল, সে কি বলিল, বলিতে পারি না। তাহাকে বিদায় দিয়া আমাকে ডাকাইলেন।

তিনি আমাকে নানাপ্রকার অনুরোধ করিলেন—রজনীকে বিবাহ করিতেই হইবে ; নহিলে সপরিবারে মারা যাইব, খাইব কি ? তাঁহার দুঃখ ও কাতরতা দেখিয়া আমার দুঃখ হইল না। বড় রাগ হইল। আমি রাগ করিয়া চলিয়া গেলাম।

পিতার কাছ হইতে গিয়া আমার মা'র হাতে পড়িলাম। পিতার কাছে রাগ করিলাম, কিন্তু মা'র কাছে রাগ করিতে পারিলাম না—তাঁহার চক্ষের জল অসহ্য হইল। সেখান হইতে পলাইলাম। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা স্থির রহিল—যে রজনীকে দয়া করিয়া গোপালের সঙ্গে বিবাহিত করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলাম, আজ টাকার লোভে তাহাকে স্বয়ং বিবাহ করিব ?

বিপদে পড়িয়া মনে করিলাম, ছোটমা'র সাহায্য লইব। গৃহের মধ্যে ছোটমাই বুদ্ধিমতী। ছোটমা'র কাছে গেলাম—"ছোট-মা আমাকে কি রজনীকে বিবাহ করিতে হইবে ? আমি কি অপরাধ করিয়াছি ?"

ছোট-মা চুপ করিয়া রহিলেন।

আমি। তুমিও কি ঐ পরামর্শে ?

ছোট-মা। বাছা রজনী ত সৎ-কায়স্থের মেয়ে।

আমি। হইলই বা।

ছোট-মা। আমি জানি, সে সচ্চরিত্রা।

আমি। তাহাও স্বীকার করি।

ছোট-মা। সে পরম সুন্দরী।

আমি। পদ্মচক্ষু!

ছোট-মা। বাবা, যদি পদ্মচক্ষুই খোঁজ তবে তোমার আর একটা বিবাহ করিতে কতক্ষণ?

আমি। সে কি মা! রজনীর টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করিয়া, তার বিষয় লইয়া, তার পর তাকে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়া আর একজনকে বিবাহ করা কেমন কাজটা হইবে?

ছোট-মা। ঠেলিয়া ফেলিবে কেন? তোমার বড়-মা কি ঠেলা আছেন?

এ কথার উত্তর ছোট-মার কাছে করিতে পারা যায় না। তিনি আমার পিতার দ্বিতীয় পক্ষের বনিতা। বহুবিবাহের দোষের কথা তাঁহার সাক্ষাতে কি প্রকারে বলিব, সে কথা না বলিয়া বলিলাম, "আমি এ বিবাহ করিব না,—তুমি আমায় রক্ষা কর। তুমি সব পার।"

ছোট-মা। আমি না বুঝি, এমন নহে। কিন্তু বিবাহ না করিলে আমরা সপরিবারে অন্নাভাবে মারা যাইব। আমি সকল কষ্ট সহ্য করিতে পারি, কিন্তু তোমাদিগের অন্নকষ্ট আমি চক্ষে দেখিতে পারিব না। তোমার সহস্র বৎসর পরমায়ু হউক, তুমি ইহাতে অমত করিও না।

আমি। টাকাই কি এত বড়?

ছোট-মা। তোমার আমার কাছে নহে; কিন্তু যাহারা তোমার আমার সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের কাছে বটে, সুতরাং তোমার আমার কাছেও বটে। দেখ, তোমার জন্য আমরা তিনজনে প্রাণ দিতেও পারি, তুমি আমাদের জন্য একটি অন্ধকন্যা বিবাহ করিতে পারিবে না?

বিচারে ছোট-মা'র কাছে হারিলাম। হারিলে রাগ বাড়ে। আমার রাগ বাড়িল, আর মনে বিশ্বাস ছিল যে, টাকার জন্য রজনীকে বিবাহ করা বড় অন্যায়। অতএব আমি দম্ভ করিয়া বলিলাম, "তোমরা যাই বল না কেন, আমি এ বিবাহ করিব না।"

ছোট-মাও দম্ভ করিয়া বলিলেন, "তুমিও যাই-ই বল না কেন, আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে তোমার এ বিবাহ দিবই দিব।"

আমি হাসিলাম, "তবে বোধ হয়, তুমি গোয়ালার মেয়ে। আমার এ বিবাহ দিতে পারিবে না।"

ছোট-মা বলিলেন, "না বাবা, আমি কায়েতের মেয়ে।"

ছোট-মা বড় দুষ্ট। আমাকে বাবা বলিয়া গালি ফিরাইয়া দিলেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

আমাদিগের বাড়ীতে এক সন্ন্যাসী আসিয়া মধ্যে মধ্যে থাকিত। কেহ সন্ন্যাসী বলিত, কেহ ব্রহ্মচারী, কেহ দণ্ডী, কেহ অবধূত। পরিধানে গৈরিক বাস, কণ্ঠে রুদ্রাক্ষমালা, মস্তকে রুক্ষ কেশ, জটা নহে, রক্ত চন্দনের ছোট রকমের কোঁটা, বড় একটা ধূলাকাদার ঘটা নাই; সন্ন্যাসীজাতির মধ্যে ইনি একটি বাবু। খড়ম চন্দনকাষ্ঠের, তাহাতে হাতীর দাঁতের বৌল। তিনি যাই হউন, বালকেরা তাঁহাকে সন্ন্যাসী মহাশয় বলিত বলিয়া আমিও তাঁহাকে তাহাই বলিব।

পিতা কোথা হইতে তাঁহাকে লইয়া আসিয়াছিলেন। অনুভবে বুঝিলাম পিতার মনে মনে বিশ্বাস ছিল, সন্ন্যাসী নানাবিধ ঔষধ জানে এবং তান্ত্রিক যাগযজ্ঞে সুদক্ষ। বিমাতা বন্ধ্যা।

পিতার অনুকম্পায় সন্ন্যাসী উপরের একটি বৈঠকখানা আসিয়া দখল করিয়াছিল। ইহা আমার একটু বিরক্তিকর হইয়া উঠিয়াছিল। আবার সন্ধ্যাকালে সূর্য্যের দিকে মুখ করিয়া সারঙ্গ রাগিণীতে আর্য্যাচ্ছন্দে স্তোত্র পাঠ করিত। ভণ্ডামী আর আমার সহ্য হইল না। আমি তাহার অর্দ্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা করিবার জন্য তাহার নিকট গেলাম। বলিলাম, "সন্ন্যাসী ঠাকুর, ছাদের উপর মাথা মুণ্ড কি বকিতেছিলে?"

সন্ন্যাসী হিন্দুস্থানী, কিন্তু আমাদিগের সঙ্গে যে ভাষায় কথা কহিত, তাহার চৌদ্দ আনা নিভাজ সংস্কৃত, এক আনা হিন্দী, এক আনা বাঙ্গালা। আমি বাঙ্গালাই রাখিলাম। সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন, "কেন, কি বকি, আপনি কি জানেন না?"

আমি বলিলাম, "বেদমন্ত্র?"

স। হইলে হইতে পারে।

আমি। পড়িয়া কি হয়?

স। কিছু না।

উত্তরটুকু সন্ন্যাসীর জিত—আমি এতটুকু প্রত্যাশা করি নাই। তখন জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে পড়েন কেন?"

স। কেন, শুনিতে কি কষ্টকর?

আমি। না, শুনিতে মন্দ নয়, বিশেষ আপনি সুকণ্ঠ। তবে যদি কিছু ফল নাই, তবে পড়েন কেন?

স। যেখানে ইহাতে কাহারও কোন অনিষ্ট নাই, সেখানে পড়ায় ক্ষতি কি?

আমি জারি করিতে আসিয়াছিলাম; কিন্তু দেখিলাম যে, একটু হটিয়াছি—সুতরাং আমাকে চাপিয়া ধরিতে হইল। বলিলাম, "ক্ষতি নাই, কিন্তু নিষ্ফলে কেহ কোন কাজ করে না—যদি বেদগান নিষ্ফল, তবে আপনি বেদগান করেন কেন?"

স। আপনিও ত পণ্ডিত, আপনি বলুন দেখি, বৃক্ষের উপর কোকিল গান করে কেন?

ফাঁপরে পড়িলাম। ইহার দুইটি উত্তর আছে, এক—"ইহাতে কোকিলের সুখ,"—দ্বিতীয়—"স্ত্রীকোকিলকে মোহিত করিবার জন্য।" কোন্‌টি বলি? প্রথমটি আগে বলিলাম;—"গাইয়াই কোকিলের সুখ।"

স। গাইয়াই আমার সুখ।

আমি। তবে টপ্পা, খিয়াল প্রভৃতি থাকিতে বেদগান করেন কেন?

স। কোন্ কথাগুলি সুখকর, সামান্য গণিকাগণের কদর্য্য চরিত্রের গুণগান সুখকর, না দেবতাদিগের অসীম মহিমাগান সুখকর?

হারিয়া দ্বিতীয় উত্তরে গেলাম; বলিলাম, "কোকিল গায় কোকিল-পত্নীকে মোহিত করিবার জন্য। মোহনার্থ যে শারীরিক স্ফূর্ত্তি, তাহাতে জীবের সুখ। কণ্ঠস্বরের স্ফূর্ত্তি সেই শারীরিক স্ফূর্ত্তির অন্তর্গত। আপনি কাহাকে মুগ্ধ করিতে চাহেন?"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "আমার আপনার মনকে। মন আত্মার অনুরাগী নহে, আত্মার হিতকারী নহে। তাহাকে বশীভূত করিবার জন্য গাই।"

আমি। আপনারা দার্শনিক, মন এবং আত্মা পৃথক বলিয়া মানেন। কিন্তু মন একটি পৃথক্, আত্মা একটি পৃথক্ পদার্থ, ইহা মানিতে পারি না। মনেরই ক্রিয়াতে দেখিতে পাই—ইচ্ছা, প্রবৃত্ত্যাদি আমার মনে। সুখ আমার মনে, দুঃখ আমার মনে। তবে আবার মনের অতিরিক্ত আত্মা কেন মানিব? যাহার ক্রিয়া দেখি; তাহাকেই মানিব; যাহার কোন চিহ্ন দেখি না, তাহাকে মানিব কেন?

স। তবে বল না কেন, মন ও শরীর এক। শরীর ও মনের প্রভেদ

কেন মানিব? যে কিছু কার্য্য করিতেছ, সকলই শরীরের কার্য্য—কোন্‌টি মনের কার্য্য?

আমি। চিন্তা-প্রবৃত্তি-ভোগাদি।

স। কিসে জানিলে, সে সকল শারীরিক ক্রিয়া নহে?

আমি। তাহাও সত্য বটে। মন শরীরের ক্রিয়া * মাত্র।

স। ভাল ভাল। তবে আর একটু এসো। বল না কেন যে, শরীরও পঞ্চভূতের ক্রিয়া মাত্র। শুনিয়াছি, তোমরা পঞ্চভূত মান না—তোমরা বহুভূতবাদী। তাই হউক, বল না কেন যে, ক্ষিত্যাদি বা অন্য ভূতগণ, শরীর-রূপ ধারণ করিয়া সকলই করিতেছে? এই যে তুমি আমার সঙ্গে কথা কহিতেছ—আমি বলি যে কেবল ক্ষিত্যাদি আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া শব্দ করিতেছে, শচীন্দ্রনাথ নহে! মন ও শরীরাদির কল্পনার প্রয়োজন কি? ক্ষিত্যাদি ভিন্ন শচীন্দ্রনাথের অস্তিত্ব মানি না।

হারিয়া ভক্তিভরে সন্নাসীকে প্রণাম করিয়া উঠিয়া গেলাম। কিন্তু সেই অবধি সন্ন্যাসীর সঙ্গে একটু সম্প্রীতি হইল। সর্ব্বদা তাঁহার কাছে আসিয়া বসিতাম এবং শাস্ত্রীয় আলাপ করিতাম। দেখিলাম, সন্ন্যাসীর অনেক প্রকার ভণ্ডামী আছে। সন্ন্যাসী ঔষধ বিলায়, সন্ন্যাসী হাত দেখিয়া গণিয়া ভবিষ্যৎ বলে, সন্ন্যাসী যাগ-হোমাদিও মধ্যে মধ্যে করিয়া থাকে—নল চালে, চোর বলিয়া দেয়, আরও কত ভণ্ডামী করে। এক দিন আমার অসহ্য হইয়া উঠিল। এক দিন আমি তাঁহাকে বলিলাম, "আপনি মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত; আপনার এ সকল ভণ্ডামী কেন?

স। কোন্‌টা ভণ্ডামী?

আমি। এই নলচালা, হাতগণা প্রভৃতি।

স। কতকগুলা অনিশ্চিত বটে, কিন্তু তথাপি কর্ত্তব্য।

আমি। যাহা অনিশ্চিত জানিতেছেন, তদ্দ্বারা লোককে প্রতারণা কেন করেন?

স। তোমরা মড়া কাট কেন?

আমি। শিক্ষার্থ।

স। যাহারা শিক্ষিত, তাহারা কাটে কেন?

আমি। তত্ত্বানুসন্ধান জন্য।

* Function of the brain.

স। আমরাও তত্ত্বানুসন্ধান জন্য এ সকল করিয়া থাকি। শুনিয়াছি, বিলাতী পণ্ডিতের মধ্যে অনেকে বলেন, লোকের মাথার গঠন দেখিয়া তাহার চরিত্রের কথা বলা যায়। যদি মাথার গঠনে চরিত্র বলা যায়, তবে হাতের রেখা দেখিয়াই বা কেন না বলা যাইবে? ইহা মানি যে, হাতের রেখা দেখিয়া কেহ এ পর্য্যন্ত ঠিক বলিতে পারে নাই, ইহার কারণ এই হইতে পারে যে, ইহার প্রকৃত সঙ্কেত অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই, কিন্তু ক্রমে ক্রমে হাত দেখিতে দেখিতে প্রকৃত সঙ্কেত পাওয়া যাইতে পারে। এ জন্য হাত পাইলেই দেখি।

আমি। আর নলচালা?

স। তোমরা লৌহের তারে পৃথিবীময় লিপি চালাইতে পার, আমরা কি নলটি চালাইতে পারি না? তোমাদের একটি ভ্রম আছে, তোমরা মনে কর যে, যাহা ইংরেজেরা জানে, তাহাই সত্য, যাহা ইংরেজে জানে না, তাহাই অসত্য, তাহা মনুষ্যজ্ঞানের অতীত, তাহা অসাধ্য। বস্তুতঃ তাহা নহে। জ্ঞান অনন্ত। কিছু তুমি জান, কিছু আমি জানি, কিছু অন্যে জানে; কিন্তু কেহই বলিতে পারে না যে, আমি সব জানি, আর কেহ আমার জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছু জানে না। কিছু ইংরেজে জানে, কিছু আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা জানিতেন। ইংরেজেরা যাহা জানে, ঋষিরা তাহা জানিতেন না; ঋষিরা যাহা জানিতেন, ইংরেজেরা এ পর্য্যন্ত তাহা জানিতে পারেন নাই। সেই সকল আর্য্যবিদ্যা প্রায় লুপ্ত হইয়াছে। আমরা কেহ কেহ দুই একটি বিদ্যা জানি। যত্নে গোপন রাখি, কাহাকেও শিখাই না।

আমি হাসিলাম। সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বিশ্বাস করিতেছ না, কিছু প্রত্যক্ষ দেখিতে চাও?"

আমি বলিলাম. "দেখিলে বুঝিতে পারি।"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "পশ্চাৎ দেখাইব। এক্ষণে তোমার সঙ্গে আমার একটি বিশেষ কথা আছে। আমার সঙ্গে তোমার ঘনিষ্ঠতা আছে। তোমার পিতা আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন যে, তোমাকে বিবাহে প্রবৃত্তি দিই।"

আমি হাসিয়া বলিলাম, "প্রবৃত্তি দিতে হইবে না, আমি বিবাহে প্রস্তুত —কিন্তু—"

স। কিন্তু কি?

আমি। কন্যা কৈ? এক কাণা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।

স। এ বাঙ্গালা দেশে কি তোমার যোগ্য কন্যা নাই?

আমি। হাজার হাজার আছে; কিন্তু বাছিয়া লইব কি প্রকারে? এই

শত সহস্র কন্যার মধ্যে কে আমাকে চিরকাল ভালবাসিবে, তাহা কি প্রকারে বুঝিব ?

স। আমার একটি বিদ্যা আছে। যদি পৃথিবীতে এমত কেহ থাকে যে, তোমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, তবে তাহাকে স্বপ্নে দেখাইতে পারি। কিন্তু যে তোমাকে এখন ভালবাসে না, ভবিষ্যতে বাসিতে পারে, তাহা আমার বিদ্যার অতীত।

আমি। এ বিদ্যা বড় আবশ্যক বিদ্যা নহে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে প্রায় প্রণয়শালী বলিয়া জানে।

স। কে বলিল ? অজ্ঞাত প্রণয়ই পৃথিবীতে অধিক, তোমাকে কেহ ভালবাসে ? তুমি কি তাহাকে জান ?

আমি। আত্মীয়স্বজন ভিন্ন কেহ যে আমাকে বিশেষ ভালবাসে, এমন আমি জানি না।

স। তুমি আমাদের বিদ্যা কিছু প্রত্যক্ষ করিতে চাহিতেছিলে, আজ এইটি প্রত্যক্ষ কর।

আমি। ক্ষতি কি ?

স। তবে শয়নকালে আমাকে শয্যাগৃহে ডাকিও।

আমার শয্যাগৃহ বহির্ব্বাটীতে। আমি শয়নকালে সন্ন্যাসীকে ডাকাইলাম। সন্ন্যাসী আসিয়া আমাকে শয়ন করিতে বলিলেন। আমি শয়ন করিলে তিনি বলিলেন, "যতক্ষণ আমি এখানে থাকিব, চক্ষু চাহিও না। আমি গেলে যদি জাগ্রত থাক, চাহিও।" সুতরাং আমি চক্ষু মুদিয়া রহিলাম—সন্ন্যাসী কি কৌশল করিল, কিছুই জানিতে পারিলাম না। সন্ন্যাসী যাইবার পূর্ব্বেই আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম।

সন্ন্যাসী বলিয়াছিল, পৃথিবীর মধ্যে যে নায়িকা আমাকে মর্ম্মান্তিক ভালবাসে, অদ্য তাহাকেই আমি স্বপ্নে দেখিব ; স্বপ্নে দেখিলাম বটে। কলকল গঙ্গাপ্রবাহমধ্যে সৈকতভূমি, তাহার প্রান্তভাগে অর্দ্ধজলমগ্ন,—কে ?

"রজনী"

পরদিন প্রভাতে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন, কাহাকে স্বপ্ন দেখিয়াছিলে ?

আমি। কাণা ফুলওয়ালী।

স। কাণা ?

আমি। জন্মান্ধ।

সন্ন্যাসী। আশ্চর্য্য! কিন্তু যেই হউক, তাহার অধিক পৃথিবীতে আর কেহ তোমাকে ভালবাসে না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম।

চতুর্থ খণ্ড

(সকলের কথা)

প্রথম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

বড়ই গোল বাধিল। আমি ত সন্ন্যাসী ঠাকুরের হাতে পায়ে ধরিয়া, কাঁদিয়া কাটিয়া শচীন্দ্রকে রজনীর বশীভূত করিবার উপায় করিতেছি। সন্ন্যাসী তন্ত্রসিদ্ধ; জগদম্বার কৃপায় যাহা মনে করেন, তাহাই করিতে পারেন; মিত্র মহাশয় ষষ্টি বৎসর বয়সে যে এ পামরীর এত বশীভূত, তাহা আমার গুণে কি সন্ন্যাসী ঠাকুরের গুণে, তাহা বলিয়া উঠা ভার; আমিও কায়মনোবাক্যে পতিপদ সেবার ত্রুটি করি না, ব্রহ্মচারীও আমার জন্য যাগ-যজ্ঞ তন্ত্র-মন্ত্রপ্রয়োগে ত্রুটি করেন না। যাহার জন্য যাহা তিনি করিয়াছেন, তাহা ফলিয়াছে। কামার-বৌর পিতলের টুকনি সোণা করিয়া দিয়াছেন। উনি না পারেন কি? উঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে শচীন্দ্র যে রজনীকে ভালবাসিবে—রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিবে, তাহাতে আমার কোন সন্দেহই নাই, কিন্তু তবু গোল বাধিয়াছে। গোলমাল অমরনাথ বাধাইয়াছে। এখন শুনিতেছি অমরনাথের সঙ্গেই রজনীর বিবাহ স্থির হইয়াছে।

রজনীর মাসী-মাস্কয়া, রাজচন্দ্র এবং তাহার স্ত্রী আমাদিকের দিকে। তাহার কারণ, কর্ত্তা বলিয়াছেন, বিবাহ যদি হয়, তবে তোমাদিগকে ঘটকবিদায়স্বরূপ কিছু দিব। কথাটা ঘটকবিদায়, কিন্তু, আঁচটা দু-হাজার দশ হাজার! কিন্তু তাহারা আমাদের দিকে হইলেও কিছু হইতেছে না। অমরনাথ ছাড়িতেছে না। সে নিশ্চয় রজনীকে বিবাহ করিবে, জিদ করিতেছে।

ভাল, অমরনাথ কে? মেয়ের বিবাহ দিবার কর্ত্তা হইল তাহার মাস্কয়া মাসী—বাপ-মা বলাই উচিত—রাজচন্দ্র ও তাহার স্ত্রী, তাহারা যদি আমাদিকের দিকে,

তবে অমরনাথের জিদে কি আসিয়া যায়? সে তাহাদিগকে বিষয় দেওয়াইয়া দিয়াছে বটে, কিন্তু তাহার মেহনতানা দুই চারি হাজার ধরিয়া দিলেই হইবে। আমার ছেলের বৌ করিব বলিয়াই আমি যে কন্যার সম্বন্ধ করিতেছি, অমরনাথ কি না তাহাকে বিবাহ করিতে চায়! অমরনাথের এত বড় স্পর্দ্ধা! আমি একবার অমরনাথকে কিছু শিক্ষা দিয়াছি—আর একবার না হয় কিছু শিক্ষা দিব। আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সঙ্গে বিবাহ দিব।

আমি অমরনাথের সকল গুণ জানি। অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত্ত—তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়। আমি সতর্ক হইয়াই কার্য্য আরম্ভ করিলাম।

প্রথমে রাজচন্দ্র দাসের স্ত্রীকে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। সে আসিলে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন গা! মালী-বৌ?"—রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে আমরা আজিও মালী-বৌ বলিতাম, রাগ না হইলে বরং বলিতাম না, রাগ হইলেই মালী-বৌ বলিতাম—মালী-বৌ বলিল, "কি গা?"

আমি। মেয়ের বিয়ে নাকি অমরনাথ বাবুর সঙ্গে দিবে?

মালী-বৌ। সেই কথাই ত এখন হচ্ছে।

আমি। কেন হচ্ছে, আমাদের সঙ্গে কি কথা হইয়াছিল?

মালী-বৌ। কি কর্‌ব মা—আমি মেয়েমানুষ, অত কি জানি?

মাগীর মোটা বুদ্ধি দেখিয়া আমার বড় রাগ হইল,—আমি বলিলাম, "সে কি মালী-বৌ? মেয়ে মানুষ জানে না ত কি পুরুষমানুষে জানে? পুরুষমানুষ আবার সংসার-ধর্ম্ম কুটুম্ব-কুটুম্বিতার কি জানে? পুরুষমানুষ মাথায় মোট করিয়া টাকা বহিয়া আনিয়া দিবে, এই পর্য্যন্ত। পুরুষমানুষ আবার কর্ত্তা না কি?"

বোধ হয়, মাগীর মোটা বুদ্ধিতে আমার কথাগুলো অসঙ্গত বোধ হইল—সে একটু হাসিল। আমি বলিলাম, "তোমার স্বামীর কি মত, অমরনাথের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ দেন?"

মালী-বৌ বলিল, "তাঁর মত নয়—তবে অমরনাথ বাবু হইতেই রজনী বিষয় পাইয়াছে, তাঁর বাধ্য হইতেই হয়।"

আমি। তবে অমরনাথ বাবুকে বল গিয়া, বিষয় এখনও রজনী পায় নাই। বিষয় আমাদের; বিষয় আমরা ছাড়িব না। পার, তোমরা বিষয় মোকদ্দমা করিয়া লও গিয়া।

মালী-বৌ। সে কথা আগে বলিলেই হইত। এত দিন মোকদ্দমা উপস্থিত হইত।

আমি। মোকদ্দমা করা মুখের কথা নহে। টাকার শ্রাদ্ধ। রাজচন্দ্র দাস ফুল বেচিয়া কত টাকা করিয়াছে?

মালী-বৌ রাগে গর্‌গর্‌ করিতে লাগিল। সত্য বলিতেছি, আমার কিছুই রাগ হয় নাই। মালী-বৌ একটু রাগ সামলাইয়া বলিল, "অমর বাবু আমার জামাই হইলেই বিষয় অমর বাবুর হইবে। তিনি টাকা দিয়া মোকদ্দমা করিতে পারেন, তাঁহার এমন শক্তি আছে।"

এই বলিয়া মালী-বৌ উঠিয়া যায়, আমি তাহার আঁচল ধরিয়া বসাইলাম। মালী-বৌ হাসিয়া বসিল। আমি বলিলাম, "অমর বাবু মোকদ্দমা করিয়া বিষয় লইলে তোমার কি উপকার?"

মালী-বৌ। আমার মেয়ের সুখ হবে।

আমি। আর আমার ছেলের সঙ্গে তোমার মেয়ের বিয়ে হ'লে বুঝি বড় দুঃখ হবে?

মালী-বৌ। তা কেন? তবে যেখানে থাকে, আমার মেয়ে সুখী হইলেই হইল।

আমি। তোমাদের নিজের কিছু সুখ চাই না?

মালী-বৌ। আমাদের আবার সুখ? মেয়ের সুখেই আমাদের সুখ।

আমি। ঘটকালীটা?

মালী-বৌ মুখ মুচকাইয়া হাসিল। বলিল, "আসল কথাটা বলিব মা-ঠাকুরাণি? এখানে বিয়ের মেয়ের মত নাই।"

আমি। সে কি? কি বলে?

মালী-বৌ। এখানকার কথা হলেই বলে, কাণার আবার বিয়ের কাজ কি?

আমি। আর অমরনাথের সঙ্গে বিয়ের কথা হইলে?

মালী-বৌ। বলে, ওঁ হতে আমাদের সব। উনি যা বলিবেন, তাহাই করিতে হইবে।

আমি। তা বিয়ের কন্যার আবার মতামত কি? মা-বাপের মতামত হইলেই হইল।

মালী-বৌ। রজনী ত ক্ষুদে মেয়ে নয়, আর আমার পেটের সন্তানও নয়। আর বিষয় তার, আমাদের নয়। সে আমাদের হাঁকাইয়া দিলে আমরা কি করিতে পারি? বরং তার মন রাখিয়াই আমাদের এখন চলিতে হইতেছে।

আমি ভাবিয়া চিন্তিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম—"রজনীর সঙ্গে অমরনাথের দেখাশুনা হয় কি ?"

মালী-বৌ। না, অমর বাবু দেখা করেন না।

আমি। আমার সঙ্গে রজনীর একবার দেখা হয় না কি ?

মালী-বৌ। আমারও ইচ্ছা তাই। আপনি যদি তাকে বুঝাইয়া পড়াইয়া তাহার মত করাইতে পারেন। আপনাকে রজনী বিশেষ ভক্তি-শ্রদ্ধা করে।

আমি। তা চেষ্টা করিয়া দেখিব ; কিন্তু রজনীর দেখা পাই কি প্রকারে ? কাল তাহাকে এ বাড়ীতে একবার পাঠাইয়া দিতে পার ?

মালী-বৌ। তার আটক কি ? সে ত এই বাড়ীতেই খাইয়া মানুষ। কিন্তু যার বিয়ের সম্বন্ধ হইতেছে, তাহাকে কি শ্বশুরবাড়ীতে অমন অদিনে অক্ষণে বিয়ের আগে আসিতে আছে ?

মর্ মাগী। আবার কাচ! কি করি, আমি অন্য উপায় না দেখিয়া বলিলাম, "আচ্ছা, রজনী না আসিতে পারে, আমি একবার তোমাদের বাড়ী যাইতে পারি কি ?"

মালী-বৌ। সে কি! আমাদের কি এমন ভাগ্য হইবে যে, আপনার পায়ের ধূলা আমাদের বাড়ীতে পড়িবে ?

আমি। কটুম্বিতা হইলে আমার কেন, অনেকেরই পড়িবে। তুমি আমাকে আজ নিমন্ত্রণ করিয়া যাও।

মালী-বৌ। তা আমাদের বাড়ীতে আপনাকে পাঠাইতে কর্ত্তার মত হইবে কেন ?

আমি। পুরুষমানুষের আবার মতামত কি ? মেয়েমানুষের যে মত পুরুষ মানুষেরও সেই মত।

মালী-বৌ যোড়হাত করিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া হাসিতে হাসিতে বিদায় গ্রহণ করিল।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথের কথা

রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য আমার এত কষ্ট সফল হইয়াছে, মিত্রেরাও নির্ব্বিবাদে বিষয় ছাড়িয়া দিয়াছে, তথাপি বিষয় দখল লওয়া হয় নাই, ইহা শুনিয়া অনেকে চমৎকৃত হইতে পারেন। তাহাতে আমিও কিছু বিস্মিত। বিষয় আমার নহে, আমি দখল লইবার কেহ নহি। বিষয় রজনীর, সে দখল না লইলে কে কি করিতে পারে? কিন্তু রজনী কিছুতেই বিষয়ে দখল লইতে সম্মত নহে। বলে—আজ নহে—আর দুই দিন যাক্,—পশ্চাৎ দখল লইবেন ইত্যাদি। দখল না লউক—কিন্তু দরিদ্রকন্যার ঐশ্বর্য্যে এত অনাস্থা কেন, তাহা আমি অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছি না। রাজচন্দ্র এবং রাজচন্দ্রের স্ত্রী এ বিষয়ে রজনীকে অনুরোধ করিয়াছে, কিন্তু রজনী বিষয় সম্প্রতি দখল লইতে চায় না। ইহার মর্ম্ম কি? কাহার জন্য এত পরিশ্রম করিলাম?

ইহার যা হয় একটা চূড়ান্ত স্থির করিবার জন্য আমি রজনীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলাম, রজনীর সঙ্গে আমার বিবাহের কথা উত্থাপিত হওয়া অবধি আমি আর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে বড় যাইতাম না কেন না, এখন আমাকে দেখিলে রজনী কিছু লজ্জিত হইত। কিন্তু আজ না গেলে নয় বলিয়া রজনীর কাছে গেলাম। সে বাড়ীতে আমার অবারিতদ্বার। আমি রজনীর সন্ধানে তাহার ঘরে গিয়া তাহাকে দেখিতে পাইলাম না ফিরিয়া আসিতেছি, এমত সময় দেখিতে পাইলাম, রজনী আর একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে উপরে উঠিতেছে। সে স্ত্রীলোককে দেখিয়াই চিনিলাম —অনেক দিন দেখি নাই, কিন্তু দেখিয়াই চিনিলাম যে, ঐ গজেন্দ্রগামিনী ললিতলবঙ্গলতা।

রজনী ইচ্ছাপূর্ব্বক জীর্ণবস্ত্র পরিয়াছিল—লজ্জায় সে লবঙ্গলতার সঙ্গে ভাল করিয়া কথা কহিতেছিল না। লবঙ্গলতা হাসিতে উছলিয়া পড়িতেছিল—রাগ বা বিদ্বেষের কিছুমাত্র লক্ষণ দেখা গেল না।

সে হাসি অনেক দিন শুনি নাই। সে হাসি তেমনই ছিল– পূর্ণিমার সমুদ্রে ক্ষুদ্র তরঙ্গের তুল্য, সপুষ্প বসন্তলতার আন্দোলন তুল্য—তাহা হইতে সুখ ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া ঝরিয়া পড়িতেছিল।

আমি অবাক্ হইয়া নিষ্পন্দশরীরে সশঙ্কচিত্তে এই বিচিত্র-চরিত্রা রমণীর মানসিক শক্তির আলোচনা করিতেছিলাম। ললিতলবঙ্গলতা কিছুতেই টলে না! লবঙ্গলতা

মহান্ ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পড়িয়াছে—তবু সেই সুখময় হাসি ; যে রজনী হইতে এই ঘোর বিপদ ঘটিয়াছে, তাহারই গৃহে উঠিতেছে, তাহার সঙ্গে আলাপ করিতেছে, তবু সেই সুখময় হাসি ! অথচ আমি জানি, লবঙ্গ কোন কথাই ভুলে নাই।

আমি সরিয়া পার্শ্বের ঘরে গেলাম। লবঙ্গলতা প্রথমে সেই ঘরে প্রবেশ করিল—নিঃশঙ্কচিত্তে আজ্ঞাদায়িনী রাজরাজেশ্বরীর ন্যায় রজনীকে বলিল,—"রজনী, তুই এখন আর কোথাও যা ! তোর বরের সঙ্গে আমার গোপনে কিছু কথা আছে। ভয় নাই ! তোর বর সুন্দর হইলেও আমার বৃদ্ধ স্বামীর অপেক্ষা সুন্দর নহে।" রজনী অপ্রতিভ হইয়া কি ভাবিতে ভাবিতে সরিয়া গেল।

ললিতলবঙ্গলতা ভ্রূকুটি কুটিল করিয়া, সেই মধুর হাসি হাসিয়া ইন্দ্রাণীর মত আমার সম্মুখে দাঁড়াইল। একবার বৈ অমরনাথকে কেহ আত্মবিস্মৃত দেখে নাই ; আবার আত্মবিস্মৃত হইলাম। সেবারেও ললিতলবঙ্গলতা—এবারেও—ললিতলবঙ্গলতা।

লবঙ্গ হাসিয়া বলিল, "আমার মুখপানে চাহিয়া কি দেখিতেছ ? তোমার অর্জ্জিত ঐশ্বর্য্য কাড়িয়া লইতে আসিয়াছি কি না ? মনে করিলে তাহা পারি।"

আমি বলিলাম, "তুমি সব পার, কিন্তু ঐটি পার না ; পারিলে কখন রজনীকে বিষয় দিয়া এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া সতীনকে খাওয়াইবার বন্দোবস্ত করিতে না।"

লবঙ্গ উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিল, "ওটা বুঝি বড় গায় লাগিবে মনে করেছ ? সতীনকে রাঁধিয়া দিতে হয়, বড় দুঃখের কথা বটে, কিন্তু একটা পাহারাওয়ালাকে ডাকিয়া তোমাকে ধরাইয়া দিলে এখনই আবার পাঁচটা রাঁধুনী রাখিতে পারি।"

আমি বলিলাম, "বিষয় রজনীর, আমাকে ধরাইয়া দিলে কি হইবে ? যাহার বিষয়, সে ভোগ করিতে থাকিবে।"

লবঙ্গ। তুমি কস্মিনকালে স্ত্রীলোক চিনলে না। যাহাকে ভালবাসে, তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রজনী এখনই বিষয় ছাড়িয়া দিবে।

আমি। অর্থাৎ আমার রক্ষার জন্য বিষয়টা তোমাকে ঘুষ দিবে ?

লবঙ্গ। তাই।

আমি। তবে এত দিন সে ঘুষ চাও নাই, আমাদিগের বিবাহ হয় নাই বলিয়া। বিবাহ হইলে কি সে ঘুষ চাহিবে ?

লবঙ্গ। তোমার মত ছোটলোকে বুঝিবে কি প্রকারে ? চোরেরা বুঝিতে পারে না যে, পরের দ্রব্য অস্পৃশ্য ; রজনীর সম্পত্তি রাখিতে পারিলেও আমি রাখিব কেন ?

আমি বলিলাম, "তুমি যদি এমন না হবে, তবে আমার সে মরণ-কুবুদ্ধি ঘটিবে কেন? যদি আমার এত অপরাধ মার্জ্জনা করিয়াছ, এত অনুগ্রহ করিয়াছ, তবে আর একটি ভিক্ষা আছে। যাহা জান, তাহা যদি অন্যের কাছে না বলিয়াছ, তবে রজনীর কাছেও বলিও না।"

দর্পিতা লবঙ্গলতা ভ্রূভঙ্গী করিল,—কি সুন্দর ভ্রূভঙ্গী, বলিল, "আমি কি ঠক? যে তোমার স্ত্রী হইবে, তাহার কাছে তোমার নামে ঠকাম করিবার জন্য তাহার বাড়ীতে আসিয়াছি?"

এই বলিয়া লবঙ্গলতা হাসিল। তাহার হাসির মর্ম্ম আমি কিছু কখন বুঝিতে পারি না। লবঙ্গ বিলক্ষণ রাগিয়া উঠিয়াছিল—কিন্তু হাসিতে সব রাগ ভাঙ্গিয়া গেল। যেন জলের উপর হইতে মেঘের ছায়া সরিয়া গেল। তাহার উপর মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় জ্বলিতে লাগিল। আমি লবঙ্গলতার মর্ম্ম কখনও বুঝিতে পারিলাম না।

হাসিয়া লবঙ্গ বলিল, "তবে আমি রজনীর কাছে যাই?"

"যাও।"

ললিতলবঙ্গলতা ললিতলবঙ্গলতার মত দুলিতে দুলিতে চলিল। ক্ষণেক পরে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল। গিয়া দেখিলাম, লবঙ্গলতা দাঁড়াইয়া আছে। রজনী তাহার পায়ে হাত দিয়া কাঁদিতেছে। আমি গেলে, লবঙ্গলতা বলিল, "শুন তোমার ভবিষ্যৎ ভার্য্যা কি বলিতেছে! তোমার সম্মুখে নহিলে এমন কথা আমি কাণে শুনিব না"

আমি বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি?"

লবঙ্গলতা রজনীকে বলিল, "বল। তোমার বর আসিয়াছে—"

রজনী সকাতরে অশ্রুপূর্ণলোচনে ললিতলবঙ্গলতার চরণস্পর্শ করিয়া বলিল, "আমার এই ভিক্ষা, আমার যে কিছু সম্পত্তি আছে, এই বাবুর যত্নে আমার যে সম্পত্তি উদ্ধৃত হইয়াছে, আমি লেখাপড়া করিয়া আপনাকে দান করিব, আপনি গ্রহণ করিবেন না কি?"

আহ্লাদে আমার সর্ব্বান্তঃকরণ প্লাবিত হইল—আমি রজনীর জন্য যে যত্ন করিয়াছিলাম—যে ক্লেশ স্বীকার করিয়াছিলাম, তাহা সার্থক বোধ হইল। আমি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলাম, এখন আরও পরিষ্কার বুঝিলাম যে, রমণীকুলে অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন। লবঙ্গলতার প্রোজ্জ্বল জ্যোতিও তাহার কাছে ম্লান হইল। আমি ইতিপূর্ব্বেই রজনীর অন্ধনয়নে আত্মসমর্পণ করিয়াছিলাম—আজি তাহার

কাছে বিনা মূল্যে বিক্রীত হইলাম। এই অমূল্য রত্নে আমার অন্ধকার পুরী প্রসারিত করিয়া এ জীবন সুখে কাটাইব। বিধাতা আমার কি সে দিন করিবেন না?

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি মনে করিয়াছিলাম, রজনীর এই বিস্ময়কর কথা শুনিয়া অমরনাথ আগুনে সেঁকা কলাপাতের মত শুকাইয়া উঠিবে। কৈ, তা ত কিছু দেখিলাম না। তাহার মুখ না শুকাইয়া বরং প্রফুল্ল হইল। বিস্মিত হতবুদ্ধি যা হইবার, তাহা আমি হইলাম।

আমি প্রথমে তামাসা মনে করিলাম, কিন্তু রজনীর কাতরতা, অশ্রুপাত এবং দার্ঢ্য দেখিয়া আমার নিশ্চয়ই প্রতীতি জন্মিল যে, রজনী আন্তরিক বলিতেছে। আমি বলিলাম, "রজনী, কায়েতের কুলে তুমিই ধন্য। তোমার মত কেহ নাই। কিন্তু আমি তোমার দান গ্রহণ করিব না।"

রজনী বলিল, "না গ্রহণ করেন, আমি ইহা বিলাইয়া দিব।"

আমি। অমরনাথ বাবুকে?

রজনী। আপনি উঁহাকে সবিশেষ চিনেন না, আমি দিলেও উনি লইবেন না। লইবার অন্য লোক আছে।

আমি। অমরনাথ বাবু কি বল?

অমর। আমার সঙ্গে কোন কথা হইতেছে না, আমি কি বলিব?

আমি বড় ফাঁপরে পড়িলাম, রজনী যে বিষয় ছাড়িয়া দিতেছে, তাহাতে বিস্মিত আবার অমরনাথ যে বিষয় উদ্ধারের জন্য এত করিয়াছিল, যাহার লোভে রজনীকে বিবাহ করিবার জন্য উদ্যোগ করিতেছে, সে বিষয় হাতছাড়া হইতেছে দেখিয়াও সে প্রফুল্ল। কাণ্ডখানা কি?

আমি অমরনাথকে বলিলাম যে, "যদি স্থানান্তরে যাও, তবে আমি রজনীর সঙ্গে সকল কথা মুখ ফুটিয়া কই।" অমরনাথ অমনি সরিয়া গেল। আমি তখন রজনীকে বলিলাম, "সত্য সত্যই কি তুমি বিষয় বিলাইয়া দিবে?"

"সত্য সত্যই। আমি গঙ্গাজল নিয়া শপথ করিয়া বলিতেছি।"

আমি। আমি তোমার দান লই, তুমি যদি আমার কিছু দান লও।

রজনী। অনেক লইয়াছি।

আমি। আরও কিছু লইতে হইবে।

রজনী। একখানি প্রসাদি কাপড় দিবেন।

আমি। তা না। আমি যা দিই, তাই নিতে হইবে।

রজনী। কি দিবেন?

আমি। শচীন্দ্র বলিয়া আমার একটি পুত্র আছে। আমি তোমাকে শচীন্দ্র দান করিব। স্বামিস্বরূপ তুমি তাহাকে গ্রহণ করিবে। তুমি যদি তাহাকে গ্রহণ কর, তোমার বিষয় গ্রহণ করিব।

রজনী দাঁড়াইয়া ছিল, ধীরে ধীরে বসিয়া পড়িয়া অন্ধ নয়ন মুদিল। তার পর তাহার মুদিত নয়ন হইতে অবিরল জলধারা পড়িতে লাগিল—চক্ষের জল আর ফুরায় না। আমি বিষম বিপদে পড়িলাম। রজনী কথা কহে না—কেবল কাঁদে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি রজনি! অত কাঁদ কেন?"

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "যে দিন গঙ্গার জলে আমি ডুবিয়া মরিতে গিয়াছিলাম—ডুবিয়াছিলাম, লোকে ধরিয়া তুলিল। সে শচীন্দ্রের জন্য, তুমি যদি বলিতে, তুমি অন্ধ, তোমার চক্ষু ফুটাইয়া দিব, আমি তাহা চাহিতাম না—আমি শচীন্দ্র চাহিতাম। শচীন্দ্রের অপেক্ষা এ জগতে আর কিছুই নাই—আমার প্রাণ তাঁহার কাছে, দেবতার কাছে ফুলের কলিমাত্র—শ্রীচরণে স্থান পাইলেই সার্থক। অন্ধের দুঃখে কথা শুনিবে কি?"

আমি রজনীর কাতরতা দেখিয়া কাতর হইয়া বলিলাম, "শুনিব।"

তখন রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে সকল কথা বলিল। শচীন্দ্রের কণ্ঠ, শচীন্দ্রের স্পর্শ, অন্ধের রূপোন্মাদ! তাহার পলায়ন, নিমজ্জন, উদ্ধার সকল বলিল। বলিয়া বলিল, "ঠাকুরাণি, তোমাদের চক্ষু আছে—চক্ষু থাকিলে এত ভালবাসা বাসিতে পারে কি?"

মনে মনে বলিলাম, "কাণি! তুই ভালবাসার কি জানিস্! তুমি লবঙ্গলতার অপেক্ষা সহস্র গুণে সুখী!" প্রকাশ্যে বলিলাম, "না রজনি! আমার বুড়া স্বামী—আমি অতশত জানি না। তুমি শচীন্দ্রকে তবে বিবাহ করিবে, ইহা স্থির?"

রজনী বলিল, "না।"

আমি। সে কি? তবে এত কথা কি বলিতেছিলে—এত কাঁদিলে কেন?

রজনী। আমার সে সুখ কপালে নাই বলিয়াই এত কাঁদিলাম।

আমি। সে কি? আমি বিবাহ দিব।

রজনী। দিতে পারিবেন না। অমরনাথ হইতে আমার সর্ব্বস্ব। অমরনাথ আমার বিষয় উদ্ধারের জন্য যাহা করিয়াছেন, পরের জন্য পরে কি তত করে? তাও ধরি না, তিনি আপনার প্রাণ দিয়া আমার প্রাণরক্ষা করিয়াছেন।

রজনী সে বৃত্তান্ত বলিল। পরে কহিল, "যাহার কাছে আমি এত ঋণী, তিনি আমার যাহা করিবেন, তাহাই হইবে। তিনি যখন অনুগ্রহ করিয়া আমাকে দাসী করিতে চাহিয়াছেন, তখন আমি তাঁহারই দাসী হইব, আর কাহারও নহে!"

হরি! হরি! কেন বাছাকে সন্ন্যাসী দিয়া ঔষধ করিলাম? বিবাহ ব্যতীতও বিষয় থাকে—রজনী ত এখনই বিষয় দিতে চাহিতেছে। কিন্তু ছি! রজনীর দান লইব? ভিক্ষা মাগিয়া খাইব—সেও ভাল। আমি বলিয়াছি—আমি যদি এই বিবাহ না দিই ত আমি কায়েতের মেয়ে নই। আমি এ বিবাহ দিবই দিব। আমি রজনীকে বলিলাম, "তবে আমি তোমার দান লইব না। তুমি যাহাকে ইচ্ছা, তাহাকে দান করিও। আমি উঠিলাম।"

রজনী বলিল, "আর একবার বসুন। আমি অমরনাথ বাবুর দ্বারা একবার অনুরোধ করাইব। তাঁহাকে ডাকিতেছি।"

অমরনাথের সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ আমার ইচ্ছা। আমি আবার বসিলাম, রজনী অমরনাথকে ডাকিল।

অমরনাথ আসিল; আমি রজনীকে বলিলাম, "অমরনাথ বাবু এ বিষয়ে যদি অনুরোধ করিতে চাহেন, তবে সকল কথা কি তোমার সাক্ষাতে খুলিয়া বলিতে পারিবেন? আপনার প্রশংসা আপনি দাঁড়াইয়া শুনিও না।"

রজনী সরিয়া গেল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি অমরনাথকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি রজনীকে বিবাহ করিবে?"

অ। করিব—স্থির।

আমি। এখনও স্থির? রজনীর বিষয় ত রজনী আমাকে দিতেছে।

অ। আমি রজনীকে বিবাহ করিব—বিষয় বিবাহ করিব না।

আমি। বিষয়ের জন্যই ত রজনীকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলে?

অ। স্ত্রীলোকের মন এমনই কদর্য্য।

আমি। আমাদের উপর এত অভক্তি কত দিন?

অ। অভক্তি নাই—তাহা হইলে বিবাহ করিতে চাহিতাম না।

আমি। কিন্তু বাছিয়া বাছিয়া অন্ধ কন্যাতে এত অনুরাগ কেন? তাই বিষয়ের কথা বলিতেছিলাম!

অ। তুমি বৃদ্ধতে এত অনুরক্ত কেন? বিষয়ের জন্য কি?

আমি। কাহারও সাক্ষাতে তাহার স্বামীকে বুড়া বলিতে নাই। আমার সঙ্গে রাগারাগি কেন? তুমি কি মুখরা স্ত্রীলোকের মুখকে ভয় কর না? (কিন্তু রাগারাগি আমার আন্তরিক বাসনা)

অমরনাথ বলিল, "ভয় করি বৈকি? রাগের কথা কিছু বলি নাই। তুমি যেমন মিত্রজাকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনি ভালবাসি।"

আমি। কটাক্ষের গুণে না কি?

অ। না। কটাক্ষ নাই বলিয়া। তুমিও কাণা হইলে আরও সুন্দর হইতে।

আমি। সে কথা মিত্রজাকে জিজ্ঞাসা করিব, তোমাকে নহে। সম্প্রতি, তুমিও যেমন রজনীকে ভালবাস, আমিও রজনীকে তেমনই ভালবাসি!

অ। তুমি রজনীকে বিবাহ করিতে চাও না কি?

আমি। প্রায়। আমি নিজে তাহাকে বিবাহ না করি, তাহার ভাল বিবাহ দিতে চাই। তোমার সঙ্গে তাহার বিবাহ হইতে দিব না।

অ। আমি সুপাত্র। রজনীর এরূপ আর জুটিতেছে না।

আমি। তুমি কুপাত্র। আমি সুপাত্র জুটাইয়া দিব।

অ। আমি কুপাত্র কিসে?

আমি। কামিজটা খুলিয়া পিঠ বাহির কর দেখি।

অমরনাথের মুখ শুকাইয়া কাল হইয়া গেল। অতি দুঃখিতভাবে বলিল, "ছি! লবঙ্গ!"

আমার দুঃখ হইল, কিন্তু দুঃখ দেখিয়া ভুলিলাম না। বলিলাম, "একটি গল্প বলিব, শুনিবে?"

আমি কথা চাপা দিতেছি মনে করিয়া অমরনাথ বলিল, "শুনিব।"

আমি তখন বলিতে লাগিলাম, "প্রথম যৌবন কালে লোকে আমাকে রূপবতী বলিত।"

অ। এটা যদি গল্প, তবে সত্য কোন্ কথা ?

আমি। পরে শোন। সেই রূপ দেখিয়া এক চোর মুগ্ধ হইয়া, আমার পিত্রালয়ে যে ঘরে আমি এক পরিচারিকার সঙ্গে শয়ন করিয়া ছিলাম, সেই ঘরে সিঁধ দিল।

এই কথা বলিতে আরম্ভ করায় অমরনাথ গলদ্‌ঘর্ম্ম হইয়া উঠিল। বলিল, "ক্ষমা কর।"

আমি বলিতে লাগিলাম, "সেই চোর সিঁধপথে আমার কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরে আলো জ্বলিতেছিল—আমি চোরকে চিনিলাম, ভীতা হইয়া পরিচারিকাকে উঠাইলাম। সে চোরকে চিনিত না। আমি তখন অগত্যা চোরকে আদর করিয়া আশ্বস্ত করিয়া পালঙ্কে বসাইলাম।"

অমর। ক্ষমা কর, সে ত সকলই জানি।

আমি। তবু একবার স্মরণ করাইয়া দেওয়া ভাল। ক্ষণেক পরে চোখের অলক্ষ্যে আমার সঙ্কেতানুসারে পরিচারিকা বাহিরে গিয়া দ্বারবান্‌কে ডাকিয়া লইয়া সিঁধমুখে দাঁড়াইয়া রহিল। আমিও সময় বুঝিয়া, বাহিরে প্রয়োজন ছলনা করিয়া নির্গত হইয়া, বাহির হইতে একমাত্র দ্বারের শৃঙ্খল বন্ধ করিলাম। মন্দ করিয়াছিলাম ?

অমরনাথ বলিল, "এ সকল কথা কেন ?"

আমি। পরে চোর নির্গত হইল কি প্রকারে, বল দেখি ? ডাকিয়া পাড়ার লোক জমা করিলাম। বড় বড় বলবান্ আসিয়া চোরকে ধরিল। চোর লজ্জায় মুখে কাপড় দিয়া রহিল। আমি দয়া করিয়া তাহার মুখের কাপড় খুলাইলাম না, কিন্তু স্বহস্তে লোহার শলা তপ্ত করিয়া তাহার পিঠে লিখিয়া দিলাম—

"চোর"

অমরবাবু অতি গ্রীষ্মেও কি আপনি গায়ের জামা খুলিয়া শয়ন করেন না ?

অ। না।

আমি। লবঙ্গলতার হস্তাক্ষর মুছিবার নহে। আমি রজনীকে ডাকিয়া এই গল্প শুনাইয়া যাই, ইচ্ছা ছিল কিন্তু শুনাইব না, তুমি রজনীর যোগ্য নহ, রজনীকে বিবাহ করিতে চেষ্টা পাইও না। যদি ক্ষান্ত না হও, তবে সুতরাং শুনাইতে বাধ্য হইব।

অমরনাথ কিছুক্ষণ ভাবিল। পরে দুঃখিতভাবে বলিল, "শুনাইতে হয়, শুনাইও, তুমি শুনাও বা না শুনাও, আমি স্বয়ং আজি তাহাকে সকল শুনাইব। আমার দোষ-গুণ

সকল শুনিয়া রজনী আমাকে গ্রহণ করিতে হয়, গ্রহণ করিবে, না করিতে হয়, না করিবে। আমি তাহাকে প্রবঞ্চনা করিব না।"

আমি হাসিয়া মনে মনে অমরনাথকে শত শত ধন্যবাদ করিতে করিতে, হর্ষ-বিষাদে ঘরে আসিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রনাথের কথা

ঐশ্বর্য হারাইয়া কিছু দিন পরে আমি পীড়িত হইলাম। ঐশ্বর্য্য হইতে দারিদ্র্যে পতনের আশঙ্কায় মনে কোন বিকার উপস্থিত হইয়াছিল বলিয়া কি, কি জন্য এই পীড়ার উৎপত্তি, তাহা আমি বলিবার কোন চেষ্টা পাইব না। কেবল পীড়ার লক্ষণ বলিব।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে রৌদ্রের তাপ অপনীত হইলে পর প্রাসাদের উপর বসিয়া অধ্যয়ন করিতেছিলাম, সমস্ত দিবস অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। জগতের দুরূহ গূঢ়তত্ত্ব সকলের আলোচনা করিতেছিলাম। কিছুরই মর্ম্ম বুঝিতে পারি না, কিন্তু কিছুতেই আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি পায় না। যত পড়ি, তত পড়িতে সাধ করে। শেষে শ্রান্তিবোধ হইল। পুস্তক বন্ধ করিয়া হস্তে লইয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম। একটু নিদ্রা আসিল—অথচ নিদ্রা নহে। সে মোহ নিদ্রার ন্যায় সুখকর বা তৃপ্তিজনক নহে। ক্লান্ত হস্ত হইতে পুস্তক খসিয়া পড়িল। চক্ষু চাহিয়া আছি—বাহ্যবস্তু সকলই দেখিতে পাইতেছি, কিন্তু কি দেখিতেছি তাহা বলিতে পারি না। অকস্মাৎ সেইখানে প্রভাতবীচিবিক্ষেপ-চপলা কলকলনাদিনী নদী বিস্তৃত দেখিলাম। যেন তথা উষার উজ্জ্বলবর্ণে পূর্ব্বদিক প্রভাসিত হইতেছে—দেখি, সেই গঙ্গা-প্রবাহমধ্যে, সৈকতমূলে রজনী। রজনী জলে নামিতেছে! ধীরে, ধীরে, ধীরে! অন্ধ অথচ কুঞ্চিত ভ্রূ; বিকলা অথচ স্থিরা; সেই প্রভাত শান্তিশীতলা ভাগীরথীর ন্যায় গম্ভীরা, ধীরা সেই ভাগীরথীর ন্যায় অন্তরে দুর্জ্জয় বেগশালিনী! ধীরে, ধীরে, ধীরে,—জলে নামিতেছে। দেখিলাম, কি সুন্দর! রজনী কি সুন্দরী! বৃক্ষ হইতে নবমঞ্জরীর সুগন্ধের ন্যায়, দূরশ্রুত সঙ্গীতের শেষ ভাগের ন্যায়, রজনী জলে, ধীরে—ধীরে—ধীরে নামিতেছে। ধীরে রজনি! ধীরে! আমি দেখি তোমায়। তখন অনাদর করিয়া দেখি নাই, এখন একবার ভাল করিয়া দেখিয়া লই। ধীরে রজনি, ধীরে!

আমার মূর্চ্ছা হইল। মূর্চ্ছার লক্ষণ সকল আমি অবগত নহি। যাহা পশ্চাৎ শুনিয়াছি, তাহা বলিয়া কোন ফল নাই। আমি যখন পুনর্ব্বার চেতনা প্রাপ্ত হইলাম, তখন রাত্রিকাল—আমার নিকটে অনেক লোক। কিন্তু আমি সে সকল কিছুই দেখিলাম না। আমি দেখিলাম—কেবল সেই মৃদুনাদিনী গঙ্গা, আর সেই মৃদুগামিনী রজনী ধীরে, ধীরে, ধীরে জলে নামিতেছে। চক্ষু মুদিলাম, তবু দেখিলাম, সেই গঙ্গা আর সেই রজনী! আবার চাহিলাম, আবার দেখিলাম, সেই গঙ্গা, আর সেই রজনী! দিগন্তরে চাহিলাম, আবার সেই রজনী, ধীরে ধীরে ধীরে জলে নামিতেছে। ঊর্দ্ধে চাহিলাম, ঊর্দ্ধেও আকাশবিহারিণী গঙ্গা ধীরে ধীরে ধীরে বহিতেছে, আকাশবিহারিণী—রজনী ধীরে, ধীরে, নামিতেছে। অন্য দিকে মন ফিরাইলাম, তথাপি সেই গঙ্গা আর সেই রজনী। আমি নিরস্ত হইলাম। চিকিৎসকেরা আমার চিকিৎসা করিতে লাগিল।

অনেক দিন ধরিয়া আমার চিকিৎসা হইতে লাগিল, কিন্তু আমার নয়নাগ্র হইতে রজনীরূপ তিলেক জন্য অন্তর্হিত হইল না। আমি জানি না আমার কি রোগ বলিয়া চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করিতেছিল। আমার নয়নাগ্রে যে রূপ অহরহঃ নাচিতেছিল, তাহার কথা কাহাকেও বলি নাই।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

শচীন্দ্রের কথা

ওহে ধীরে, রজনি, ধীরে! ধীরে, ধীরে আমার এই হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ কর! এত দ্রুতগামিনী কেন? তুমি অন্ধ, পথ চেন না, ধীরে রজনি, ধীরে! ক্ষুদ্র এই পুরী, আঁধার, আঁধার, আঁধার! চিরান্ধকার! দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর,—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।

ওহে ধীরে, রজনি, ধীরে! এ পুরী আলো কর, কিন্তু দাহ কর কেন? কে জানে যে শীতল প্রস্তরেও দাহ করিবে—তোমায় ত পাষাণগঠিতা পাষাণময়ী জানিতাম, কে জানে যে, পাষাণেও দাহ করিবে? অথবা কে জানে, পাষাণে ও লৌহে সংঘর্ষণেই অগ্ন্যুৎপাত হয়। তোমার প্রস্তরধবল, প্রস্তর-স্নিগ্ধদর্শন, প্রস্তরগঠিতবৎ মূর্ত্তি যত দেখি, ততই দেখিতে ইচ্ছা হয়। অন্যদিন পলকে পলকে

দেখিয়াও মনে হয়, দেখিলাম কৈ? আবার দেখি। আবার দেখি, কিন্তু দেখিয়াও ত সাধ মিটিল না।

পীড়িতাবস্থায় আমি প্রায় কাহারও সঙ্গে কথা কহিতাম না। কেহ কথা কহিতে আসিলে ভাল লাগিত না। রজনীর কথা মুখে আনিতাম না—কিন্তু প্রলাপকালে কি বলিতাম না বলিতাম, তাহা স্মরণ করিয়া বলিতে পারি না। প্রলাপ সচরাচরই ঘটিত।

শয্যা প্রায় ত্যাগ করিতাম না। শুইয়া শুইয়া কত কি দেখিতাম, তাহা বলিতে পারি না। কখন দেখিতাম, সমরক্ষেত্রে যবনিকাপাত হইতেছে; রক্তের নদী বহিতেছে; কখন দেখিতাম, সুবর্ণপ্রান্তরে হীরকবৃক্ষে স্তবকে স্তবকে নক্ষত্র ফুটিয়া আছে! কখন দেখিতাম, আকাশমার্গে অষ্টশশী-সমন্বিত শনৈশ্চর মহাগ্রহ চতুশ্চক্রবাহী বৃহস্পতির উপর মহাবেগে পতিত হইল—গ্রহ উপগ্রহ সকল খণ্ড খণ্ড হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল—আঘাতোৎপন্ন বহ্নিতে সে সকল জ্বলিয়া উঠিয়া দাহ্যমানাবস্থাতে মহাবেগে বিশ্বমণ্ডলের চতুর্দ্দিকে প্রধাবিত হইতেছে। কখন দেখিতাম, এই জগৎ জ্যোতির্ম্ময় কান্তরূপধর দেবযোনির মূর্ত্তিতে পরিপূর্ণ; তাহারা অবিরত অম্বর পথ প্রভাসিত করিয়া বিচরণ করিতেছে। তাহাদিগের অঙ্গের সৌরভে আমার নাসারন্ধ্র পরিপূর্ণ হইতেছে, কিন্তু যাহাই দেখি না, সকলের মধ্যস্থলে রজনীর সেই প্রস্তরময়ী মূর্ত্তি দেখিতে পাইতাম। হায়! রজনী! পাথরে এত আগুন?

ধীরে রজনি, ধীরে, ধীরে, ধীরে রজনি, ঐ অন্ধ নয়ন উন্মিলিত কর! দেখ, আমায় দেখ, আমি তোমায় দেখি! ঐ দেখিতেছি—তোমার নয়নপদ্ম ক্রমে প্রস্ফুটিত হইতেছে—ক্রমে, ক্রমে, ক্রমে, ধীরে, ধীরে, ধীরে, ধীরে নয়নরাজীব ফুটিতেছে, এ সংসারে কাহার না নয়ন আছে? গো, মেষ, কুক্কুর, মার্জার ইহাদেরও নয়ন আছে—তোমার নাই? নাই, নাই, তবে আমারও নাই। আমিও আর চক্ষু চাহিব না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

লবঙ্গলতার কথা

আমি জানিতাম, শচীন্দ্র একটা কাণ্ড করিবে—ছেলেবয়সে অত ভাবিতে আছে! দিদি ত একবার চেয়েও দেখেন না—আমি বলিলে বিমাতা বলিয়া আমার কথা গ্রাহ্য করে না। ও সব ছেলেকে আঁটিয়া উঠা ভার। এখন দায়

দেখিতেছি আমার। ডাক্তার বৈদ্য কিছু করিতে পারিল না, পরিবেও না। তারা রোগই নির্ণয় করিতে জানে না—রোগ হলো মনে—হাত দেখিলে, চোখ দেখিলে, জিভ দেখিলে তারা কি বুঝিবে? যদি তারা আমার মত আড়ালে লুকাইয়া বসিয়া আড়ি পেতে ছেলের কাণ্ড দেখিত, তবে এক দিন রোগের ঠিকানা করিলে করিতে পারিত।

কথাটা কি? "ধীরে রজনি!" ছেলে ত একেলা থাকিলে এই কথাই বলে। সন্ন্যাসী ঠাকুরের ঔষধে কি এই ফল ফলিল? আমার মাথা খাইতে কেন আমি এমন কাজ করিলাম? ভাল, রজনীকে একবার রোগীর কাছে বসাইয়া রাখিলে হয় না? কৈ, আমি রজনীর বাড়ী গিয়াছিলাম, সেত সেই অবধি আমার বাড়ী একবারও আসে নাই। ডাকিয়া পাঠাইলে না আসিয়া থাকিতে পারিবে না। এই ভাবিয়া রজনীর গৃহে লোক পাঠাইলাম—বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমার বিশেষ প্রয়োজন আছে, একবার আসিতে বলিও।

মনে করিলাম, আগে একবার শচীন্দ্রের কাছে রজনীর কথা পাড়িয়া দেখি। তাহা হইলে বুঝিতে পারিব, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের পীড়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না?

অতএব প্রকৃত তত্ত্ব জানিবার জন্য শচীন্দ্রের কাছে গিয়া বসিলাম। এ-কথা ও-কথার পর রজনীর প্রসঙ্গ ছলে পাড়িলাম! আর কেহ সেখানে ছিল না। রজনীর নাম শুনিবামাত্র বাছা অমনি চমকিত হংসীর ন্যায় গ্রীবা তুলিয়া আমার মুখপ্রতি চাহিয়া রহিল। আমি যত রজনীর কথা বলিতে লাগিলাম, শচীন্দ্র কিছুই উত্তর করিল না, কিন্তু ব্যাকুলিত চক্ষে আমার প্রতি চাহিয়া রহিল। ছেলে বড় অস্থির হইয়া উঠিল—এটা পাড়ে, সেটা ভাঙ্গে, এইরূপ আরম্ভ করিল। আমি পরিশেষে রজনীকে তিরস্কার করিতে লাগিলাম; সে অত্যন্ত ধনলুব্ধা, আমাদের পূর্ব্বকৃত উপকার কিছুমাত্র স্মরণ করিল না। এইরূপ কথাবার্ত্তা শুনিয়া শচীন্দ্র অপ্রসন্ন ভাবাপন্ন হইলেন, এমন আমার বোধ হইল; কিন্তু কথায় কিছু প্রকাশ পাইল না।

নিশ্চয় বুঝিলাম, এটি সন্ন্যাসীর কীর্ত্তি। তিনি এক্ষণে স্থানান্তরে গিয়াছেন, অল্প দিনে আসিবার কথা ছিল; তাঁহার প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। কিন্তু তাহাও মনে ভাবিতে লাগিলাম যে, তিনিই বা কি করিবেন? আমি নির্ব্বোধ দুরাকাঙ্ক্ষা-পরবশ স্ত্রীলোক—ধনের লোভে অগ্রপশ্চাৎ না ভাবিয়া আপনিই এই বিপত্তি উপস্থিত করিয়াছি। তখন মনে জানিতাম যে, রজনীকে নিশ্চয়ই পুত্রবধূ করিব। তখন কে জানে যে, কাণা ফুলওয়ালীও দুর্ল্লভ হইবে? কে জানে যে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রৌষধে হিতে বিপরীত হইবে? স্ত্রীলোকের বুদ্ধি অতি ক্ষুদ্র, তাহা জানিতাম

না ; আপনার বুদ্ধির অহঙ্কারে আপনি মজিলাম। আমার এমন বুদ্ধি হইবার আগে আমি মরিলাম না কেন ? এখন ইচ্ছা হইতেছে মরি, কিন্তু শচীন্দ্র বাবুর আরোগ্য না দেখিয়া মরিতে পারিতেছি না।

কিছু দিন পরে কোথা হইতে সেই পূর্ব্ব পরিচিত সন্ন্যাসী আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি বলিলেন, তিনি শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন, কে তাঁহাকে শচীন্দ্রের পীড়ার সংবাদ দিল, তাহা কিছুই বলিলেন না।

শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত শুনিলেন, পরে শচীন্দ্রের কাছে বসিয়া নানা প্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। তৎপরে প্রণাম করিবার জন্য আমি তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলাম। প্রণাম করিয়া মঙ্গল-জিজ্ঞাসার পর বলিলাম, "মহাশয় সর্ব্বজ্ঞ ; না জানেন, এমন তত্ত্বই নাই। শচীন্দ্রের কি রোগ আপনি অবশ্য জানেন।"

তিনি বলিলেন, "উহা বায়ুরোগ। অতি দুশ্চিকিৎস্য।"

আমি বলিলাম, "তবে শচীন্দ্র সর্ব্বদা রজনী নাম করে কেন ?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "তুমি বালিকা, বুঝিবে কি ?"

(কি সর্ব্বনাশ, আমি বালিকা, আমি শচীর মা !)

"এই রোগের এক গতি এই যে, হৃদয়স্থ লুক্কায়িত এবং অপরিচিত ভাব বা প্রবৃত্তি সকল প্রকাশিত হইয়া পড়ে এবং অত্যন্ত বলবান্ হইয়া উঠে। শচীন্দ্র কদাচিৎ আমাদিগের দৈববিদ্যা সকলের পরীক্ষার্থী হইলে আমি কোন তান্ত্রিক অনুষ্ঠান করিলাম। তাহাতে যে তাঁহাকে আন্তরিক ভালবাসে, তিনি তাহাকে স্বপ্নে দেখিবেন। শচীন্দ্র রাত্রিযোগে রজনীকে স্বপ্নে দেখিলেন। স্বাভাবিক নিয়ম এই যে, যে আমাদিগকে ভালবাসে বুঝিতে পারি, আমরা তাহার প্রতি অনুরক্ত হই। অতএব সেই রাত্রে শচীন্দ্রের মনে রজনীর প্রতি অনুরাগের বীজ গোপনে সমারোপিত হইল। কিন্তু রজনী অন্ধ এবং ইতর লোকের কন্যা ইত্যাদি কারণে সে অনুরাগ প্রস্ফুট হইতে পারে নাই। অনুরাগের লক্ষণ স্বহৃদয়ে কিছু দেখিতে পাইলেও শচীন্দ্র তৎপ্রতি বিশ্বাস করেন নাই। ক্রমে ঘোরতর দারিদ্র্যদুঃখের আশঙ্কা তোমাদিগকে পীড়িত করিতে লাগিল। সর্ব্বাপেক্ষা শচীন্দ্রই তাহাতে গুরুতর ব্যথা পাইলেন। অন্যমনে দারিদ্র্যদুঃখ ভুলিবার জন্য শচীন্দ্র অধ্যয়নে মন দিলেন। অন্যমনা হইয়া বিদ্যালোচনা করিতে লাগিলেন। সেই বিদ্যালোচনার আধিক্যহেতু চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল। তাহাতেই এই মানসিক রোগের সৃষ্টি। সেই মানসিক রোগকে অবলম্বন করিয়া রজনীর প্রতি সেই বিলুপ্তপ্রায় অনুরাগ পুনঃ প্রস্ফুটিত হইল। এখন আর শচীন্দ্রের সে মানসিক শক্তি ছিল না যে, তদ্দ্বারা

তিনি সেই অবহিত অনুরাগকে প্রশমিত করেন। বিশেষ পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, এই সকল মানসিক পীড়ার কারণ যে, গুপ্ত মানসিক ভাব বিকসিত হয়, তাহা অপ্রাকৃত হইয়া উঠে। তখন তাহা বিকারের স্বরূপ প্রতীয়মান হয়। শচীন্দ্রের সেইরূপ এ বিকার।"

আমি তখন কাতর হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে, "ইহার প্রতীকারের কি হইবে?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আমি ডাক্তারী শাস্ত্রের কিছুই জানি না। ডাক্তারদিগের দ্বারা এ রোগ উপশম হইতে পারে কি না, তাহা বিশেষ বলিতে পারি না, কিন্তু ডাক্তারেরা কখনও এ সকল রোগের প্রতীকার করিয়াছে, এমন আমি শুনি নাই।"

আমি বলিলাম যে, "অনেক ডাক্তার দেখান হইয়াছে, কোন উপকার হয় নাই।"

স। সচরাচর বৈদ্যচিকিৎসকের দ্বারাও কোন উপকার হইবে না।

আমি। তবে কি কোন উপায় নাই?

স। যদি বল, তবে আমি ঔষধ দিই।

আমি। আপনার ঔষধের অপেক্ষা কাহার ঔষধ? আপনি আমাদের রক্ষাকর্ত্তা, আপনিই ঔষধ দিন।

স। তুমি বাড়ীর গৃহিণী। তুমি বলিলেই ঔষধ দিতে পারি। শচীন্দ্রও তোমার বাধ্য। তুমি বলিলেই সে আমার ঔষধ সেবন করিবে। কিন্তু কেবল ঔষধে আরোগ্য হইবে না। মানসিক পীড়ার মানসিক চিকিৎসা চাই। রজনীকে চাই।

আমি। রজনী আসিবে। ডাকিয়া পাঠাইয়াছি।

স। কিন্তু রজনীর আগমনে ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহাও বিবেচ্য। এমন হইতে পারে যে, রজনীর প্রতি এই অপ্রাকৃত অনুরাগ রুগ্নাবস্থায় দেখা সাক্ষাৎ হইলে বদ্ধমূল হইয়া স্থায়িত্ব প্রাপ্ত হইবে। যদি রজনীর সঙ্গে বিবাহ না হয়, তবে রজনীর না আসাই ভাল।

আমি। রজনীর আসা ভাল হউক, মন্দ হউক, তাহা বিচার করিবার সময় নাই। ঐ দেখুন, রজনী আসিতেছে।

সেই সময় একজন পরিচারিকার সঙ্গে রজনী আসিয়া উপস্থিত হইল। অমরনাথও শচীন্দ্রের পীড়া শুনিয়া স্বয়ং শচীন্দ্রকে দেখিতে আসিয়াছিলেন এবং রজনীকে সঙ্গে আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। আপনি বহির্ব্বাটিতে থাকিয়া, পরিচারিকার সঙ্গে তাহাকে অন্তঃপুরে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

পঞ্চম খণ্ড

অমরনাথের কথা

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই অন্ধ পুষ্পনারী কি মোহিনী জানে, তাহা বলিতে পারি না। চক্ষে কটাক্ষ নাই, অথচ আমার মত সন্ন্যাসীকেও মোহিত করিল। আমি মনে করিয়াছিলাম, লবঙ্গলতার পর আর কখন কাহাকে ভালবাসিব না। মনুষ্যের সকলই অনর্থক দম্ভ। অন্য দূরে থাক্, সহজেই এই অন্ধ পুষ্পনারী কর্ত্তৃক মোহিত হইলাম।

মনে করিয়াছিলাম—এ জীবন অমাবস্যার রাত্রিস্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে সহসা চন্দ্রোদয় হইল। মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতরাইয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণ সেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি এমনই চিরকাল দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দন-কানন আনিয়া বসাইল। আমার এ সুখের আর সীমা নাই। চিরকাল যে অন্ধকার গুহামধ্যে বাস করিয়াছে, সহসা সে যদি এই সূর্য্যকিরণ-সমুজ্জ্বল তরুপল্লব-কুসুম-সুশোভিত মনুষ্য-লোকে স্থাপিত হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! যে চিরকাল পরাধীন, পরপীড়িত, দাসানুদাস ছিল, সে যদি হঠাৎ সর্ব্বেশ্বর সার্ব্বভৌম হয়, তাহার যে আনন্দ, আমার সেই আনন্দ! রজনীর মত যে জন্মান্ধ, হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সে আনন্দ!

কিন্তু এ আনন্দ পরিণামে কি হইবে, তাহা বলিতে পারি না। আমি চোর। আমার পিঠে আগুনের অক্ষরে আছে যে, আমি চোর! যে দিন রজনী সেই অক্ষরে হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিবে, এ কিসের দাগ—আমি তাহাকে কি বলিব? বলিব কি যে, ও কিছু নহে? সে অন্ধ, কিন্তু যাহাকে অবলম্বন করিয়া আমি সংসারে সুখী হইতে চাহিতেছি—তাহাকে আবার প্রতারণা করিব? যে পারে, সে করুক। আমি যখন পারিয়াছি, তখন ইহার অপেক্ষাও গুরুতর দুষ্কার্য্য করিয়াছি—করিয়া ফলভোগ করিয়াছি—আর কেন? আমি লবঙ্গলতার কাছে বলিয়াছিলাম, সকল কথা রজনীকে বলিব, কিন্তু বলিতে মুখ ফুটে নাই। এখন বলিব।

যে দিন রজনী শচীন্দ্রকে দেখিয়া আসিয়াছিল, সেই দিন অপরাহ্ণে আমি রজনীকে এই কথা বলিতে গেলাম। গিয়া দেখিলাম যে, রজনী একা বসিয়া

কাঁদিতেছে। আমি তখন তাহাকে কিছু না বলিয়া রজনীর মাসীকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে, রজনী কাঁদিতেছে কেন? তাহার মাসী বলিল যে, কি জানি? মিত্র-দিগের বাড়ী হইতে আসিয়া অবধি রজনী কাঁদিতেছে। আমি স্বয়ং শচীন্দ্রের নিকট যাই নাই—আমার প্রতি শচীন্দ্র বিরক্ত, যদি আমাকে দেখিয়া তাহার পীড়াবৃদ্ধি হয়, এই আশঙ্কায় যাই নাই—সুতরাং সেখানে কি হইয়াছিল, তাহা জানিতাম না। রজনীকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "কেন কাঁদিতেছ?" রজনী চক্ষু মুছিয়া চুপ করিয়া রহিল।

আমি বড় কাতর হইলাম। বলিলাম, "দেখ রজনী! তোমার যাহা কিছু দুঃখ তাহা জানিতে পারিলে আমি প্রাণপাত করিয়া তাহা নিবারণ করিব—তুমি কি দুঃখে কাঁদিতেছ, আমায় বলিবে না?"

রজনী আবার কাঁদিতে আরম্ভ করিল। বহুকষ্টে আবার রোদন সংবরণ করিয়া বলিল, "আপনি এত অনুগ্রহ করেন; কিন্তু আমি তাহার যোগ্য নহি।"

আমি। সে কি রজনি! আমি মনে জানি, আমিই তোমার যোগ্য নহি। আমি তোমাকে সেই কথাই বলিতে আসিয়াছি।

রজনী। আমি আপনার অনুগৃহীত দাসী, আমাকে অমন কথা কেন বলেন?

আমি। শুন রজনি। আমি তোমাকে বিবাহ করিয়া ইহজন্ম সুখে কাটাইব, এই আমার একান্ত ভরসা। এ আশা আমার ভগ্ন হইলে বুঝি আমি মরিব, কিন্তু সে আশাতেও যে বিঘ্ন, তাহা তোমাকে বলিতে আসিয়াছি। শুনিয়া উত্তর দিও, না শুনিয়া উত্তর দিও না। প্রথম-যৌবনে একদিন আমি রূপান্ধ হইয়া উন্মত্ত হইয়াছিলাম—জ্ঞান হারাইয়া চোরের কাজ করিয়াছিলাম। অঙ্গে আজিও তাহার চিহ্ন আছে। সেই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছি।

তখন ধীরে, ধীরে, নিতান্ত ধৈর্য্যমাত্র সহায় করিয়া সেই অকথনীয় কথা রজনীকে বলিলাম। রজনী অন্ধ, তাই বলিতে পারিলাম, চক্ষে চক্ষে সন্দর্শন হইলে বলিতে পারিতাম না।

রজনী নীরব হইয়া রহিল। আমি তখন বলিলাম, "রজনি! রূপোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া প্রথম-যৌবনে একদিন এই অজ্ঞানের কার্য্য করিয়াছিলাম। আর কখনও কোন অপরাধ করি নাই। চিরজীবন সেই একদিনের অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছি। আমাকে কি তুমি গ্রহণ করিবে?

রজনী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "আপনি যদি চিরকাল দস্যুবৃত্তি করিয়া থাকেন, আপনি যদি সহস্র ব্রহ্মহত্যা, গোহত্যা, স্ত্রীহত্যা করিয়া থাকেন, তাহা হইলেও আপনি আমার কাছে দেবতা। আপনি আমাকে চরণে স্থান দিলেই আমি

আপনার দাসী হইব। কিন্তু আমি আপনার যোগ্যা নহি। সেই কথাটি আপনার শুনিতে বাকী আছে।

আমি। সে কি রজনি!

রজনী। আমার এই পাপ মন পরের কাছে বিক্রীত।

আমি চমকিয়া শিহরিয়া উঠিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, "সে কি রজনি!"

রজনী বলিল,—আমি স্ত্রীলোক—আপনার কাছে ইহার অধিক আর কি প্রকারে বলিব? কিন্তু লবঙ্গ ঠাকুরাণী সকল জানেন। যদি আপনি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, তবে সকল শুনিতে পাইবেন। বলিবেন, "আমি সকল কথা বলিতে বলিয়াছি।"

আমি তখনই মিত্রদিগের গৃহের দিকে গেলাম; যে প্রকারে লবঙ্গের সাক্ষাৎ পাইলাম, তাহা লিখিয়া ক্ষুদ্র বিষয়ে কালক্ষেপ করিব না। দেখিলাম, লবঙ্গলতা ধূল্যবলুণ্ঠিতা হইয়া শচীন্দ্রের জন্য কাঁদিতেছে। যাইবামাত্র লবঙ্গলতা আমার পা জড়াইয়া আরও কাঁদিতে লাগিল—বলিল, "ক্ষমা কর! তোমার উপর আমি এত অত্যাচার করিয়াছিলাম বলিয়া বিধাতা আমাকে দণ্ডিত করিয়াছেন। আমার গর্ভজ পুত্রের অধিক প্রিয় পুত্র শচীন্দ্র বুঝি আমারই দোষে প্রাণ হারায়। আমি বিষ খাইয়া মরিব। আমি তোমার সম্মুখে বিষ খাইয়া মরিব।"

আমার বুক ভাঙ্গিয়া গেল। রজনী কাঁদিতেছে, লবঙ্গ কাঁদিতেছে! ইহারা স্ত্রীলোক, চক্ষের জল ফেলে, আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কি রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। লবঙ্গ কাঁদিতেছে, রজনী কাঁদিতেছে, আমি কাঁদিতেছি—আর শচীন্দ্রের এই দশা। কে বলে সংসার সুখের? সংসার অন্ধকার!

আপনার দুঃখ রাখিয়া আগে লবঙ্গের দুঃখের কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। লবঙ্গ তখন কাঁদিতে কাঁদিতে শচীন্দ্রের পীড়ার বৃত্তান্ত সমুদয় বলিল। সন্ন্যাসীর বিদ্যাপরীক্ষা হইতে রুগ্নশয্যায় রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত লবঙ্গ সকল বলিল।

তারপর রজনীর কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। বলিলাম, "রজনী সকল কথা বলিতে বলিয়াছে, বল।"

লবঙ্গ তখন রজনীর আছে যাহা শুনিয়াছিল, অকপটে সকল বলিল।

রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে?

এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল। আমার অদৃষ্টে সুখ বিধাতা লেখেন নাই—পরের সুখ কাড়িয়া লইব কেন? শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, এ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।

প্রভো, তোমার অনেক সন্ধান করিয়াছি, কৈ তুমি? দর্শনে-বিজ্ঞানে তুমি নাই। জ্ঞানীর জ্ঞানে—ধ্যানীর ধ্যানে তুমি নাই। তুমি অপ্রমেয়, এজন্য তোমার পক্ষে প্রমাণ নাই। এই স্ফূটিতোন্মুখ হৃৎপদ্মেই তোমার প্রমাণ-ইহাতে তুমি আরোহণ কর। আমি অন্ধ পুষ্পনারীকে পরিত্যাগ করিয়া তোমার ছায়া সেখানে স্থাপন করি।

তুমি নাই? না থাক, তোমার নামে আমি সকল উৎসর্গ করিব। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরং তস্মৈ নমঃ" বলিয়া এ কলঙ্কলাঞ্ছিত দেহ উৎসর্গ করিব। তুমি যাহা দিয়াছ, তুমি কি লইবে না? তুমি লইবে, নহিলে এ কলঙ্কের ভার আজ কে পবিত্র করিবে?

প্রভো! আপনার কাছে একটা নিবেদন আছে। এ দেহ কলঙ্কিত করাইল কে, তুমি না আমি? আমি যে অসৎ, অসার, দোষ আমার না তোমার? আমার এ মণিহীরার দোকান সাজাইল কে, তুমি না আমি? যাহা তুমি সাজাইয়াছ, তাহা তোমাকেই দিব। আমি এ ব্যবসা আর রাখিব না।

সুখ! তোমাকে সর্ব্বত্র খুঁজিলাম—পাইলাম না। সুখ নাই—তবে আশায় কাজ কি? যে দেশে অগ্নি নাই, সে দেশে ইন্ধন আহরণ করিয়া কি হইবে? প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, সব বিসর্জ্জন দিব।

* * * *

আমি পরদিন শচীন্দ্রকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র অধিকতর স্থির—অপেক্ষাকৃত প্রফুল্ল। তাহার অনেকক্ষণ কথোপকথন করিতে লাগিলাম। বুঝিলাম, আমার উপর যে বিরক্তি, শচীন্দ্রের মন হইতে তাহা যায় নাই।

পরদিন পুনরপি তাহাকে দেখিতে গেলাম। প্রত্যহ তাহাকে দেখিতে যাইতে লাগিলাম। শচীন্দ্রের দুর্ব্বলতা ও ক্লিষ্টভাব কমিল না, কিন্তু ক্রমে স্থৈর্য্য জন্মিতে লাগিল। প্রলাপ দূর হইল। ক্রমে শচীন্দ্র প্রকৃতিস্থ হইল।

রজনীর কথা এক দিনও শচীন্দ্রের মুখে শুনি নাই। কিন্তু ইহা দেখিয়াছি যে,

যে দিন হইতে রজনী আসিয়াছিল, সেই দিন হইতে তাঁহার পীড়া উপশম হইয়া আসিতেছিল।

এক দিন যখন আর কেহ শচীন্দ্রের কাছে ছিল না, তখন আমি ধীরে ধীরে বিনা আড়ম্বরে রজনীর কথা পাড়িলাম। ক্রমে তাহার অন্ধতার কথা পাড়িলাম। অন্ধের দুঃখের কথা বলিতে লাগিলাম, এই জগৎসংসার-শোভা-দর্শনে সে যে বঞ্চিত,—প্রিয়জন-দর্শন-সুখে সে যে আজন্ম-মৃত্যু পর্য্যন্ত বঞ্চিত, এই সকল কথা তাঁহার সাক্ষাতে বলিতে লাগিলাম। দেখিলাম, শচীন্দ্র মুখ ফিরাইলেন, তাঁহার চক্ষু জলপূর্ণ হইল।

অনুরাগ বটে ?

তখন বলিলাম, "আপনি রজনীর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। আমি সেই জন্য একটি কথার পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতে চাই। রজনী একে বিধাতাকর্ত্তৃক পীড়িতা, আবার আমা কর্ত্তৃক আরও গুরুতর পীড়িতা হইয়াছে।"

শচীন্দ্র আমার প্রতি বিকট কটাক্ষ নিক্ষেপ করিলেন !

আমি বলিলাম, "আপনি যদি সমুদয় মনোযোগ পূর্ব্বক শুনেন, তবেই আমি বলিতে প্রবৃত্ত হই।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "বলুন।"

আমি বলিলাম, "আমি অত্যন্ত লোভী এবং স্বার্থপর। আমি তাহার চরিত্রে মোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। সে আমার নিকট বিশেষ কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিল, সেই জন্য আমার অভিপ্রায়ে সম্মত হইয়াছে।"

শচীন্দ্র বলিলেন, "মহাশয়, এ সকল কথা আমাকে বলিতেছেন কেন ?"

আমি বলিলাম, "আমি ভাবিয়া দেখিলাম, আমি সন্ন্যাসী, আমি নানা দেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াই, অন্ধ রজনী কি প্রকারে আমার সঙ্গে দেশে দেশে বেড়াইবে ? আমি এখন ভাবিতেছি, অন্য কোন ভদ্রলোক তাহাকে বিবাহ করে, তবে সুখের হয়। আমি তাহাকে অন্য পাত্রস্থ করিতে চাই। যদি কেহ আপনার সন্ধানে থাকে, সেই জন্য আপনাকে এত কথা বলিতেছি।"

শচীন্দ্র একটু বেগের সহিত বলিলেন, "রজনীর পাত্রের অভাব নাই।" আমি বুঝিলাম, রজনীর বরপাত্র কে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

পরদিন আবার মিত্রদিগের আলয়ে গিয়া দেখা দিলাম। লবঙ্গলতাকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, আমি কলিকাতা ত্যাগ করিয়া যাইব, এক্ষণে সম্প্রতি প্রত্যাগমন করিব না—তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিব।

লবঙ্গলতা আমার সহিত পুনশ্চ সাক্ষাৎ করিল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি ?"

ল। শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও, আমি তোমার গুণ জানিতাম না।

আমি নীরব হইয়া রহিলাম। তখন অবসর পাইয়া লবঙ্গলতা জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি আমার সঙ্গে সাক্ষাতের ইচ্ছা করিয়াছ কেন ? তুমি না কি কলিকাতা হইতে উঠিয়া যাইতেছ ?"

আমি। যাইব।

ল। কেন ?

আমি। যাইব না কেন ? আমাকে যাইতে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

ল। যদি আমি বারণ করি ?

আমি। আমি তোমার কে যে বারণ করিবে ?

ল। তুমি আমার কে ? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—

লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না। আমি ক্ষণেক অপেক্ষা করিয়া বলিলাম, "যদি লোকান্তর থাকে, তবে ?"

লবঙ্গলতা বলিল, "আমি স্ত্রীলোক—সহজে দুর্ব্বলা। আমার কত বল, দেখিয়া তোমার কি হইবে ? আমি ইহাই বলিতে পারি, আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।"

আমি বড় বিচলিত হইলাম, বলিলাম, "আমি সে কথায় বিশ্বাস করি। কিন্তু একটি কথা আমি কখন বুঝিতে পারিলাম না। তুমি যদি আমার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী, তবে আমার গায়ে চিরদিনের জন্য এ কলঙ্ক লিখিয়া দিলে কেন ? এ যে মুছিলে যায় না—কখন মুছিলে যাইবে না।"

লবঙ্গ অধোবদনে রহিল। ক্ষণেক ভাবিল। বলিল, "তুমি কুকাজ করিয়াছিলে, আমিও বালিকাবুদ্ধিতেই কুকাজ করিয়াছিলাম। যাহার যে দণ্ড, বিধাতা তাহার

বিচার করিবেন, আমি বিচারের কে? এখন সে অনুতাপ আমার—কিন্তু সে সকল কথা না বলাই ভাল। তুমি আমার সে অপরাধ ক্ষমা করিবে?"

আমি। তুমি না বলিতেই আমি ক্ষমা করিয়াছি। ক্ষমাই বা কি? উচিত দণ্ড করিয়াছিলে—তোমার অপরাধ নাই। আমি আর আসিব না—আর কখন তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে না। কিন্তু যদি কখনও ইহার পরে শোন যে, অমরনাথ কুচরিত্র নহে, তবে তুমি আমার প্রতি একটু—অণুমাত্র—স্নেহ করিবে?

ল। তোমাকে স্নেহ করিলে আমি অধর্ম্মে পতিত হইব।

আমি। না, আমি সে স্নেহের ভিখারী আর নহি। তোমার এই সমুদ্রতুল্য হৃদয়ে কি আমার জন্য এতটুকু স্থান নাই?

ল। না,—যে আমার স্বামী না হইয়া একবার আমার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইয়াছিল, স্বয়ং তিনি মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ে এতটুকু স্থান নাই। লোকে পাখী পুষিলে যে স্নেহ করে, ইহলোকে তোমার প্রতি আমার সে স্নেহও কখন হইবে না।

আবার "ইহলোকে।" যাক্—আমি লবঙ্গের কথা বুঝিলাম কি না, বলিতে পারি না, কিন্তু লবঙ্গ আমার কথা বুঝিল না, কিন্তু দেখিলাম, লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।

আমি বলিলাম, "আমার যাহা বলিবার অবশিষ্ট আছে, তাহা বলিয়া যাই। আমার কিছু ভূ-সম্পত্তি আছে, আমার তাহাতে প্রয়োজন নাই। তাহা আমি দান করিয়া যাইতেছি।"

ল। কাহাকে?

আমি। যে রজনীকে বিবাহ করিবে, তাহাকে।

ল। তোমার সমুদয় স্থাবর সম্পত্তি?

আমি। হাঁ, তুমি এই দানপত্র এক্ষণে তোমার কাছে অতি গোপনে রাখিবে; যতদিন না রজনীর বিবাহ হয়, ততদিন ইহার কথা প্রকাশ করিও না। বিবাহ হইয়া গেলে রজনীর স্বামীকে দানপত্র দিও।

এই কথা বলিয়া ললিতলবঙ্গলতার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া, দানপত্র আমি তাহার নিকট ফেলিয়া দিয়া চলিয়া গেলাম। আমি সকল বন্দোবস্ত ঠিক করিয়া আসিয়াছিলাম—আমি আর বাড়ী গেলাম না। একেবারে ষ্টেশনে গিয়া বাষ্পীয় শকটারোহণে কাশ্মীরযাত্রা করিলাম।

দোকানপাট উঠিল।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

ইহার দুই বৎসর পরে, একদা ভ্রমণ করিতে করিতে আমি ভবানীনগর গেলাম। শুনিলাম যে, মিত্রবংশীয় কেহ তথায় বাস করিতেছেন। কৌতূহল-প্রযুক্ত আমি দেখিতে গেলাম। দ্বারদেশে শচীন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ হইল।

শচীন্দ্র আমাকে চিনিতে পারিয়া নমস্কার আলিঙ্গন পূর্ব্বক আমার হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া উত্তমাসনে বসাইলেন। অনেকক্ষণ তাঁহার সঙ্গে নানাবিধ কথোপকথন হইল। তাঁহার নিকট শুনিলাম যে, তিনি রজনীকে বিবাহ করিয়াছেন। কিন্তু রজনী ফুলওয়ালী ছিল, পাছে কলিকাতায় ইহাতে লোকে ঘৃণা করে, এই ভাবিয়া, তিনি কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া ভবানীনগরে বাস করিতেছেন। তাঁহার পিতা ও ভ্রাতা কলিকাতাতেই বাস করিতেছেন।

আমার নিজ সম্পত্তি প্রতিগ্রহণ করিবার জন্য শচীন্দ্র আমাকে বিস্তর অনুরোধ করিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, আমি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম না, শেষে শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আমাকে অনুরোধ করিলেন। আমারও সে ইচ্ছা ছিল। শচীন্দ্র আমাকে অন্তঃপুরে রজনীর নিকট লইয়া গেলেন।

রজনীর নিকটে গেলে, সে আমাকে প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি গ্রহণ করিল। আমি দেখিলাম যে, ধূলি গ্রহণ কালে পাদস্পর্শ জন্য অন্ধগণের স্বাভাবিক নিয়মানুযায়ী সে ইতস্ততঃ হস্তসঞ্চালন করিল না, এককালেই আমার পাদস্পর্শ করিল। কিছু বিস্মিত হইলাম।

সে আমাকে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু মুখ অবনত করিয়া রহিল। আমার বিস্ময় বাড়িল। অন্ধদিগের লজ্জা চক্ষুগত নহে। চক্ষে চক্ষে মিলনজনিত যে লজ্জা, তাহা তাহাদিগের ঘটিতে পারে না বলিয়া তাহারা দৃষ্টি লুকাইবার জন্য মুখ নত করে না। একটা কি কথা জিজ্ঞাসা করিলাম, রজনী মুখ তুলিয়া আবার নত করিল, দেখিলাম—নিশ্চিত দেখিলাম, সে চক্ষে কটাক্ষ।

জন্মান্ধ রজনী কি এখন তবে দেখিতে পায়? আমি শচীন্দ্রকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিতে যাইতেছিলাম, এমত সময় শচীন্দ্র আমাকে বসিবার আসন দিবার জন্য রজনীকে আজ্ঞা করিলেন। রজনী একখানা কার্পেট লইয়া পাতিতেছিল—যেখানে পাতিতেছিল, সেখানে অল্প এক বিন্দু জল পড়িয়াছিল, রজনী আসন রাখিয়া, অগ্রে অঞ্চলের দ্বারা জল মুছিয়া লইয়া আসন পাতিল। আমি বিলক্ষণ দেখিয়াছিলাম যে, রজনী সেই জল স্পর্শ না করিয়াই আসন পাতা বন্ধ করিয়া জল মুছিয়া লইয়াছিল। অতএব স্পর্শের দ্বারা কখন সে জানিতে পারে নাই যে, সেখানে জল আছে, অবশ্য সে জল দেখিতে পাইয়াছিল।

আমি আর থাকিতে পারিলাম না, জিজ্ঞাসা করিলাম, "রজনি, এখন তুমি কি দেখিতে পাও ?"

রজনী মুখ নত করিয়া ঈষৎ হাসিয়া বলিল, "হাঁ।"

আমি বিস্মিত হইয়া শচীন্দ্রের মুখপানে চাহিলাম। শচীন্দ্র বলিলেন, "আশ্চর্য্য বটে, কিন্তু ঈশ্বর-কৃপায় না হইতে পারে এমন কি আছে ? আমাদিগের ভারতবর্ষে চিকিৎসা সম্বন্ধে কতকগুলি অতি আশ্চর্য্য প্রকরণ ছিল,—সে সকল তত্ত্ব ইউরোপীয়েরা বহুকাল পরিশ্রম করিলেও আবিষ্কৃত করিতে পারিবেন না। চিকিৎসাবিদ্যা কেন, সকল বিদ্যাতেই এইরূপ। কিন্তু সে সকল এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, কেবল দুই এক জন সন্ন্যাসী, উদাসীন প্রভৃতির কাছে সে সকল লুপ্ত বিদ্যার কিয়দংশ অতি গুহ্যভাবে অবস্থিতি করিতেছে। আমাদিগের বাড়ীতে একজন সন্ন্যাসী কখন কখন যাতায়াত করিয়া থাকেন, তিনি আমাকে ভালবাসিতেন। তিনি যখন শুনিলেন আমি রজনীকে বিবাহ করিব, তখন বলিলেন, 'শুভদৃষ্টি হইবে কি প্রকারে ? কন্যা যে অন্ধ ?' আমি রহস্য করিয়া বলিলাম, 'আপনি অন্ধত্ব আরোগ্য করুন।' তিনি বলিলেন, 'করিব—এক মাসে।' ঔষধ দিয়া তিনি এক মাসে রজনীর চক্ষে দৃষ্টির সৃজন করিলেন।

আমি আরও বিস্মিত হইলাম, বলিলাম, "না দেখিলে আমি ইহা বিশ্বাস করিতাম না। ইউরোপীয় চিকিৎসা শাস্ত্রানুসারে ইহা অসাধ্য !"

এই কথা হইতেছিল, এমত সময়ে এক বৎসরের একটি শিশু টলিতে টলিতে, চলিতে চলিতে, পড়িতে পড়িতে, উঠিতে উঠিতে, সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। শিশু আসিয়া রজনীর পায়ের কাছে দুই একটা আছাড় খাইয়া, তাহার বস্ত্রের একাংশ ধৃত করিয়া, টানাটানি করিয়া উঠিয়া, রজনীর হাঁটু ধরিয়া তাহার মুখপানে চাহিয়া উচ্চ হাসি হাসিয়া উঠিল। তাহার পরে ক্ষণেক আমার মুখপানে চাহিয়া হস্ত উত্তোলন করিয়া আমাকে বলিল, "দা !" (যা)

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কে এটি ?"

শচীন্দ্র বলিলেন, "আমার ছেলে।"

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইহার নাম কি রাখিয়াছেন ?

শচীন্দ্র বলিলেন, "অমরপ্রসাদ।"

আমি আর সেখানে দাঁড়াইলাম না।

সম্পূর্ণ

পরিচ্ছেদ-পরিচিতি ও টীকা

প্রথম খণ্ড

'রজনী' উপন্যাসটি যে আঙ্গিকে রচিত বাংলা ভাষায় সে রীতি অভিনব। নায়ক-নায়িকা বা পাত্র-পাত্রীরা নিজেদের মুখে তাঁদের বক্তব্য উপস্থাপিত করেছেন এবং সেইভাবেই সমগ্র উপন্যাসটি বিবৃত। ফলে, প্রচলিত রীতিতে যেমন দেখা যায় ঔপন্যাসিক সমগ্র কাহিনীটি বিবৃত করছেন এবং বিবৃতির মধ্যেই বিভিন্ন নায়ক-নায়িকা তাঁদের সংলাপ বলেছেন। কিন্তু 'রজনী' উপন্যাসে এক একটি খণ্ড এক একজন পাত্র বা পাত্রীর নিজের কথায় বিবৃতি দান করেছেন। অর্থাৎ ঔপন্যাসিকের একক সত্তা বহুধা বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর মাধ্যমে একক দায়িত্বকে বিশ্লিষ্ট ক'রে উপন্যাসটি বর্ণনা করেছেন। এ রীতি অনেকটা নাটকের রীতির সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। নাটকে যেমন বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মাধ্যমে সমগ্র নাটকের কাহিনী বিবৃত হয়, সেখানে নাট্যকার নেপথ্যে থাকেন, এই ধরনের উপন্যাসেও ঔপন্যাসিক নেপথ্যে থেকে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর কাহিনী বিবৃত করেছেন। নাট্যকারের ব্যক্তিত্ব, প্রবণতা যেমন বিভিন্ন পাত্র-পাত্রীর সংলাপে সব সময় ধরা পড়ে না, তেমনি এই শ্রেণীর উপন্যাসেও বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী তাঁদের প্রবণতা, মানসিকতা ও বাচনভঙ্গী নিয়ে উপন্যাসে আত্মপ্রকাশ করেছেন। লেখককে সেখানে অন্তরালে আত্মগোপন ক'রে থাকতে হয়েছে। যদি লেখকের ব্যক্তিত্বের ছাপ পাত্র-পাত্রীদের প্রকাশভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রণ করে, একই ছাঁচে প্রকাশ করে, তা হবে রচনাকারের দুর্বলতা।

'রজনী' উপন্যাসে এই আঙ্গিকের দোষত্রুটি আমরা ভূমিকা অংশে আলোচনা করেছি।

বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' উপন্যাসের ভূমিকায় বলেছেন, 'লর্ড লিটন-প্রণীত 'Last Days of Pompeii' নামক উৎকৃষ্ট উপন্যাসে নিদিয়া নামে একটি কানা ফুলওয়ালী আছে; রজনী তৎস্মরণে সূচিত হয়। যে সকল মানসিক বা নৈতিকতত্ত্ব প্রতিপাদন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য তাহা অন্ধ-যুবতীর সাহায্যে বিশেষ স্পষ্টতালাভ করিতে পারিবে বলিয়াই ঐরূপ ভিত্তির উপর রজনীর চরিত্র নির্মাণ করা গিয়াছে।

"উপাখ্যানের অংশবিশেষ বা নায়ক-নায়িকা বিশেষের দ্বারা ব্যক্ত করা প্রচলিত রচনা-প্রণালীর মধ্যে সচরাচর দেখা যায় না, কিন্তু ইহা নূতন নহে; উইল্‌কি কলিন্সকৃত 'Woman in White' নামক গ্রন্থপ্রণয়নে ইহা প্রথম ব্যবহৃত হয়। এই প্রথার

এই গুণ যে, যে কথা যাহার মুখে শুনিতে ভাল লাগে, সেই কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়। এই প্রথা অবলম্বন করিয়াছি বলিয়াই, এই উপন্যাসে যে সকল অনৈসর্গিক বা অপ্রাকৃত ব্যাপার আছে, আমাকে তাহার দায়ী হইতে হয় নাই।"

'রজনী' উপন্যাসের প্রথম খণ্ডটি 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় যেরূপে প্রকাশিত হয়েছিল, গ্রন্থাকারে সেই রূপই যথাযথ বজায় আছে। যদিও অন্যান্য খণ্ডের পরিবর্তন বহুলাংশে লক্ষ্য করা যায়। প্রথম খণ্ডটি—'রজনীর কথা'। প্রথম খণ্ডটি আটটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং রজনী আত্মকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে সমগ্র উপন্যাসের পটভূমিকা বিবৃত করেছে। রজনী অন্ধনারী, কুমারী। অন্ধনারী তার জীবনের সুখদুঃখের কথা বলতে গিয়ে তার জীবিকার্জনের কথা বলেছে। ফুল এবং ফুলের মালা বিক্রী ক'রে তাদের দিন কেটেছে। এই প্রসঙ্গে পিতৃমাতৃপরিচয়ের ইঙ্গিত পেয়েছি। ফুল এবং ফুলের মালা বিক্রীর সূত্রে রজনীকে ঘটনাচক্রে যেতে হয়েছে প্রতিবেশী ধনীগৃহ রামসদয় মিত্রের বাড়ীতে। এই ধনীগৃহে রামসদয় বাবুর দ্বিতীয় পুত্র শচীন্দ্রের প্রতি কিভাবে তার অনুরাগ সঞ্চারিত হয়েছে, তা রজনী নিজেই বর্ণনা করেছে। অন্ধ রজনীর অন্ধত্বের কথা লবঙ্গলতার মুখে শুনে শচীন্দ্র রজনীর চোখ পরীক্ষা ক'রে দেখবার জন্য তার চিবুক তুলে ধরেছিল। সেই স্পর্শ কুমারী রজনীর জীবনে বিদ্যুৎস্পর্শের মতো তাকে সচকিত ক'রে তোলে। আর এই স্পর্শানুভূতি স্মৃতিই রজনীর চিত্তে দূরাকাঙ্ক্ষার তাড়নায় তাকে প্রতিদিন টেনে নিয়ে যেতো ঐ বড় বাড়ীতে—ফুল পৌঁছে দেবার অছিলায় আর তার সমস্ত অবসর রমণীয় হয়ে উঠত শচীন্দ্রের চিন্তায়।

একদিন সে শুনল ছোটবাবু শচীন্দ্র ও ছোটমা লবঙ্গলতা নিতান্ত কৃপাবশে রজনীর বিবাহের উদ্যোগ করেছেন এবং পাত্র ঠিক হয়ে গেছে। শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহের আকাঙ্ক্ষা রজনী সচেতন মনে ঠাঁই না দিলেও সে ভাবতেই পারে না, অন্য কাউকে বিবাহ করার কথা। রজনী যখন অনুভব করলো এই বিবাহের ব্যাপার ত'ন এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের আশায় সে সুযোগের সন্ধান করতে লাগলো। অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়েও গেল রজনী। রজনীর সঙ্গে যার বিবাহের কথা লবঙ্গলতা ঠিক করেছিল, তার প্রথমা স্ত্রী চাঁপাসুন্দরী এই বিবাহ ভণ্ডুল ক'রে দেওয়ার আশায় রজনীকে আত্মগোপন করার কাজে সহযোগিতা করলো। রজনীও আসন্ন বিবাহের উদ্যোগ থেকে পরিত্রাণ লাভের আশায় অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না ক'রেই চাঁপার ভাই হীরালালের সঙ্গে গভীর রাত্রে গৃহত্যাগ করলো। হীরালাল গঙ্গার ঘাটে রজনীকে নৌকোয় তুলে নৌকো ছেড়ে দিলো। রজনীর একাকীত্বের সুযোগ নিয়ে স্বভাব-দুর্বৃত্ত হীরালাল রজনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব দিলো। রজনী দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করাতে হীরালাল

চুপ করে রইলো বটে, কিন্তু শেষ রাতে একস্থানে নৌকো ভিড়িয়ে রজনীকে নামতে বললো। রজনী নামলে হীরালাল নৌকো আবার ছেড়ে দিলো। তাকে ফেলে রেখে নৌকো চলে যাচ্ছে বুঝতে পেরে রজনী যখন তার কারণ জিজ্ঞেস করলো, হীরালাল জানালো তাকে বিবাহ করতে রাজী না হওয়ার জন্যই সে জলবেষ্টিত এই চরায় তাকে পরিত্যাগ ক'রে রজনীকে এইভাবেই শাস্তি দেবে। রজনী নৌকো ধরতে গেল বটে, কিন্তু নৌকো তখন নাগালের বাইরে। তখন রজনী পিছু হঠে নৌকোর শব্দ অনুসরণ ক'রে তার হাতের তালের লাঠি হীরালালের দিকে ছুঁড়ে মারলো। হীরালাল আহত হ'ল বটে, কিন্তু নৌকা C ়ালো না। নির্জন রাত্রিতে পরিত্যক্ত রজনী আকাশ-পাতাল কত কি ভাবতে লাগলো। এই দুঃখখিন্ন জীবন রেখে লাভ কি! জলে ডুবে রজনী জীবনের জ্বালা নেভাতে চাইলো। অন্ধ বালিকা এক পা এক পা ক'রে গঙ্গার জলের দিকে এগিয়ে চললো। ক্রমে গলা, মুখ, নাক, চোখ ডুবলো। রজনী গঙ্গার স্রোতে ভেসে গেল—"ডুবিলাম, কিন্তু মরিলাম না···আমি সেই প্রভাতবায়ু তাড়িত গঙ্গাজল-প্রবাহ মধ্যে নিমগ্ন হইয়া ভাসিতে ভাসিতে চলিলাম। ক্রমে শ্বাস নিশ্চেষ্ট, চেতনা বিনষ্ট হইয়া আসিল।" এইভাবেই প্রথম খণ্ডের 'রজনীর কথা' শেষ হল এবং পরবর্তী খণ্ডে অন্য চরিত্রের মাধ্যমে বক্তব্য প্রকাশ করার আগে রজনী বলেছে—"এ যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর এক জন বলিবে।"

প্রথম পরিচ্ছেদ

রজনী তার সুখদুঃখের আত্মকথা বর্ণনা করেছে প্রথম পরিচ্ছেদে। অন্ধ যুবতী তার বেদনার কাহিনী বলতে গিয়ে কাহিনীর পটভূমিকা বর্ণনা করেছে। তারই জবানীতে আমরা জানতে পারি অন্ধ যুবতীর অনুভূতি ও বেদনার কথা। বঙ্কিমচন্দ্র 'রজনী' নামকরণের মধ্যে এই ইঙ্গিতটুকু দিয়েছেন। অন্ধের জীবনে সমস্ত কিছুই চির অন্ধকারময়। শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের অনুভূতি অন্ধের দর্শনেন্দ্রিয়ের যে ন্যূনতা তাকে দূর করতে চায়। ফলে একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব অন্য ইন্দ্রিয়ের তীব্রতা দিয়ে সে পূরণ করতে চেষ্টা করে। চির অন্ধকারময় জগতের অধিবাসী অন্ধ এই যুবতী। রজনী জন্মান্ধ। তাই চক্ষুষ্মান্ ব্যক্তিদের তুলনায় সে ভিন্ন প্রকৃতির। তাই সে বলে যে ক্ষুদ্র যুথিকার গন্ধে সে সুখী, কিন্তু চন্দ্রকিরণের মহিমা সে বোঝে না। অন্ধকারময় নিশ্ছিদ্র রাত্রির যে একটা নিজস্ব রূপ আছে সে রূপ অনুভূতির। তাই রজনী বলেছে—"তোমাদের জীবন দৃষ্টিময়—আমার জীবন অন্ধকার—দুঃখ এই, আমি ইহা অন্ধকার বলিয়া জানি না। আমার এ রুদ্ধনয়নে তাই আলো। না জানি তোমাদের আলো কেমন।···তুমি রূপ

দেখিয়া সুখী, আমি শব্দ শুনিয়া সুখী"। এইভাবে কাহিনী শুরু ক'রে রজনী তার অনুভূতির পরিচয় দিয়ে তার ব্যক্তি পরিচয় দিয়েছে। বালিগঞ্জের প্রান্তভাগে তার পিতার একটি ফুলের বাগান ছিল। সেই ফুল এবং ফুলের মালা থেকে বিক্রয়লব্ধ অর্থ দিয়েই তাদের সংসার চলত। রজনী মালা গেঁথে দিত এবং তার পিতা মহানগরীর পথে পথে সেই মালা বিক্রয় করত। নিতান্ত সাধারণ অবস্থার মধ্যে রজনীদের দিন চলত। রজনী সতেরো বয়স বছর পর্যন্ত এইভাবেই তার জীবন কাটিয়েছে।

"তাই বলিয়া কি আমার সুখ নাই"—যাদের দৃষ্টিশক্তি আছে তারা মনে করতে পারে অন্ধদের জীবনই দুঃখময়। কিন্তু একটি ইন্দ্রিয়ের অভাব অপর ইন্দ্রিয়গুলিকে আরো বেশী সজাগ ক'রে তোলে। তাই রজনীর ক্ষেত্রেও আমরা ক্রমে ক্রমে দেখব তার দৃষ্টিশক্তির অভাব সে পূরণ ক'রে নিয়েছে শব্দ-স্পর্শ-গন্ধের অতি প্রখর সচেতনতা দিয়ে।

"আমি মনুমেণ্টমহিষী"—অন্ধের জীবনের নিঃসঙ্গতা ও সীমিত জীবনের অভিজ্ঞতা নিয়ে রজনীর জীবন কেটেছে। মনুমেণ্টের উচ্চতা সম্পর্কে রজনী তার পিতার কাছে যে গল্প শুনেছে তাই দিয়েই সে মনুমেণ্ট সম্পর্কে ধারণা করে নিয়েছে। শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর যে অনুরাগ সঞ্চারিত হতে আমরা দেখেছি, সেই কাহিনীর পূর্বে রজনীর জীবনের নিঃসঙ্গতা কেটেছে মনুমেণ্টের উচ্চতা এবং তার স্বামী সম্পর্কে ও স্বামীর মহিমা সম্পর্কে উচ্চ ধারণায়। অন্যদিকে শিশু বামাচরণকে নিয়ে তার প্রতি রজনীর স্নেহাতুর হৃদয়ের প্রকাশ। রজনীচিত্তের স্বামী পরিবৃত সংসারের জন্য বুভুক্ষার ইঙ্গিত এখানে প্রকাশ পেয়েছে। এই অভাববোধ থেকেই স্বভাবের জাগরণ। অর্থাৎ স্বামিপ্রেম সম্পর্কে রজনীর চিত্তের আকুলতা পরবর্তী অংশে প্রকাশ পেয়েছে।

"জটিলা কুটিলা" - শ্রীরাধিকার শাশুড়ী জটিলা ও ননদিনী কুটিলা। কৃষ্ণপ্রেম পাগলিনী রাধিকাকে এরা দুজনে বড় যন্ত্রণা দিত। আধুনিককালে নতুন বধূকে যেসব শাশুড়ী ও ননদিনী নানাভাবে নির্যাতন করে (অপভাষায় যাকে বলে বউ *কাঁটকী শাশুড়ী বা ননদ*) ও নানা ছল-ছুতোয় বউ-এর দোষ খুঁজে বেড়ায়, তাদেরই জটিলা কুটিলা বলে। এখানে রজনী পরিহাস করে বলেছে, সেকালে যেমন জটিলা কুটিলা, রাধার লৌকিক স্বামী আয়ান থাকতেও কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী হওয়ার জন্য রাধাকে অসতী বলে ভর্ৎসনা করত, রজনীও তেমনি মনুমেণ্টকে একবার বিবাহ করে আবার শিশু বামাচরণকে বররূপে বরণ করল, তাতে কি আধুনিক জটিলা কুটিলা রজনীকে সতী বলবে?

"বলে কি কলে গা"—বলে কি করে গা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে রজনী তাদের উপজীবিকা ফুল বিক্রয়কে অবলম্বন ক'রে কাহিনীর বিস্তার ঘটিয়েছে। এই প্রসঙ্গেই রামসদয় মিত্রের বাড়ী ও বাড়ীর অন্দর মহলের পাত্র-পাত্রীদের পরিচয় কাহিনীতে বিবৃত। রামসদয় মিত্রের ভুবনেশ্বরী নামে একজন চিররুগ্না ও প্রাচীনা গৃহিণী ছিলেন। তাকে রজনী আধখানা গৃহিণী বলেছে। আর যিনি পুরাগৃহিণী তাঁর নাম ললিতলবঙ্গলতা ওরফে লবঙ্গলতা। রামসদয় বাবু ৬৩ বছরের বৃদ্ধ, আর লবঙ্গলতার বয়স ১৯। এই লবঙ্গলতা রূপসী। কিন্তু রজনীর কাছে রূপ গৌণ ব্যাপার। আসলে লবঙ্গ গুণবতী।

লবঙ্গ রজনীর কাছ থেকে নিয়মিত ফুল কিনত এবং চার আনার জায়গায় দু'টাকা দাম দিত। লবঙ্গের দৌলতে রজনীদের সংসার চলত। কিন্তু তবুও ঘটনাচক্রে এই গৃহকে কেন্দ্র ক'রে রজনীচিত্তে বেদনার পদধ্বনি শোনা গেল। রজনী ফুল দিতে গিয়ে একদিন রামসদয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বরে তীব্র আকর্ষণ অনুভব করল এবং শচীন্দ্রের হস্তের স্পর্শে তার চিত্তে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। রজনী বলেছে "সে স্পর্শ পুষ্পময়···আ মরি মরি! কোন্ বিধাতা এ কুসুমময় স্পর্শ গড়িয়াছিল"! রজনীর চিত্তে এই প্রেমানুভূতি শচীন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণকে তীব্রতর ক'রে তুলল। রজনী শচীন্দ্রের রূপ দর্শনের নেশায় অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়ল—"আমার হৃদয়ের মধ্যে চক্ষু ফুটাইয়া দে, আমি একবার অন্তরের ভিতর অন্তর লুকাইয়া মনের সাধে রূপ দেখে নারীজন্ম সার্থক করি।" কিন্তু রজনীর বেদনা ও কাতরতা কেউই বুঝল না।

"সুন্দরের সেই রামরাজ্য"—বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীতে আছে, বিদ্যাকে নিয়ে সুন্দর নিজের রাজ্যে ফিরে গিয়ে সুখে রাজ্য ভোগ করতে লাগল।

"মালিনীর কিল আর ফিরিল না"—হীরা মালিনীর লাঞ্ছনাই সার হলো। বিদ্যা ও সুন্দরের গোপন প্রণয়ে হীরা দূতীর কাজ করে। যখন এই সংবাদ প্রকাশ হয়ে পড়ে, তখন রাজার কাছে হীরা মালিনীর লাঞ্ছনার অবধি ছিল না।

"ললিতলবঙ্গলতা-পরিশীলনকোমলমলয়সমীরে"—কবি জয়দেবের "গীতগোবিন্দম্" কাব্যের একটি বিখ্যাত পদের পংক্তি।

"রতিপতি"—কামদেব। মদনের সৌন্দর্য নয়ন অভিরাম।

"অঞ্জনানন্দন"—অঞ্জনার পুত্র হনুমান।

"এমন করিয়া কর্ণবিবর······দেয় নাই"—শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর রজনীর চিত্তে

যে পুলক ও আবেশ সঞ্চার করেছিলো, স্পর্শানুভূতির পূর্বে তা তার চিত্তকে দোলায়িত করে তুলেছে।

"পুষ্পগন্ধময় বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ—বীণাধ্বনিবৎ স্পর্শ কথাটির দ্বারা অন্ধ রজনীর চিত্তের একটি বিশেষ অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। স্পর্শানুভূতির যে সুখ তা একটি বিশেষ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের সমীপে উপনীত হয়। আবার গন্ধের মাধুর্য ও ধ্বনির চমৎকারিত্ব ঘ্রাণেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে মনের দ্বারে উপনীত হয়। কিন্তু রজনীর দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবজনিত ক্ষোভ, সে যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সেই অভাবকে পূরণ ক'রে নিতে চেয়েছে। শচীন্দ্রের স্পর্শের মধ্যে রজনী ফুলের সৌরভ, বীণার ঝংকার অনুভব করেছে। যার সবগুলি ইন্দ্রিয়ই সক্রিয়, তার অনুভূতিতে এই নিবিড়তা ও সমগ্রতা পাওয়া যায় না।

"হৃদয়ের মধ্যে খুঁজিলাম……গন্ধ"—রূপদর্শনের নেশায় রজনীর তীব্র আকুলতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

সেইদিন থেকে রজনী রামসদয়বাবুর বাড়ীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করত। রজনীর চিত্তে প্রেমের পদধ্বনি দিনে দিনে তীব্রতা লাভ করল। তাতে রজনীচিত্তের বেদনাই শুধু বাড়ল। রজনীচিত্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে—শচীন্দ্রের কথার শব্দ শোনবার ভরসায় সে বারবার তাদের বাড়ী যেতে চেয়েছে। রজনী নানা যুক্তি দিয়ে নিজের চিত্তকে বোঝাতে চেয়েছে। শচীন্দ্রের কণ্ঠস্বর শোনার সম্ভাবনা একেবারেই যে নেই, তার অন্তঃপুরে আসার সম্ভাবনাও যে নেই! এইভাবে সে নিজের চিত্তকে সংযত করার চেষ্টা করেছে। তাই প্রত্যহ সে নিরাশ হলেও, প্রত্যহই সে ছুটে যেত। অন্ধের রূপমোহ যেন অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রকাশ পেতো রজনীর মধ্যে। অন্য ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে রূপানুভূতির তীব্রতা রজনীচিত্তে যেন তার দর্শনেন্দ্রিয়কে নতুন রূপে প্রতিভাত করেছে। রজনী তাতে শুধু কাতরতাই প্রকাশ করেছে।

"রূপ রূপবানের···দর্শকের মনে"—রূপ বা সৌন্দর্য মূলতঃ দ্রষ্টার চিত্তবৃত্তির আবিষ্কার। রূপ বস্তুতে নেই, আছে দ্রষ্টার কল্পনায় বা উপলব্ধিতে। রূপ যদি নিতান্তই বস্তুগত হতো, তবে একজনকে সকলেই রূপবান, একজনকে সকলেই কুৎসিত দেখত। অন্যের চোখে অসুন্দরও, বিশেষ একজনের চোখে পরম সুন্দররূপে প্রকাশ পায়।

"শুষ্কভূমিতে বৃষ্টি পড়িল"—রজনীর কুমারী হৃদয়ে অনুরাগের সঞ্চার।

"শুষ্ককাষ্ঠে অগ্নি সংলগ্ন হইল"—প্রেমের অভিজ্ঞতাহীন চিত্তে অনুরাগের

স্পর্শ লাভ। অগ্নির দাহিকাশক্তি কাষ্ঠে ছিল বলেই, অগ্নির স্পর্শেই তা জ্বলে ওঠে। তেমনি রজনীচিত্তে প্রেমানুভূতি ছিল বলেই তা শচীন্দ্রের স্পর্শে প্রকাশ পেলো।

'বোবার কবিত্ব কেবল তাহার যন্ত্রণার জন্য"—চিত্তের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করতে চায় কিন্তু পারে না, সেই অপ্রকাশের বেদনায় হৃদয় গুমরে মরে।

"আমার হৃদয়ে……যন্ত্রণার জন্য"—শচীন্দ্রকে চোখে দেখতে না পাওয়ার বেদনায় রজনীর এই কাতরতা।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

রজনী পিতামাতার কথাবার্তা থেকে বুঝতে পারল, লবঙ্গলতা ও শচীন্দ্র রজনীর বিবাহের উদ্‌যোগ-আয়োজন করছে। পাত্র মিত্র-বাড়ীর সরকারের পুত্র গোপাল। অর্থের বিনিময়ে সে অন্ধ কন্যাকেও বিবাহ করতে রাজী। তাতে তার পিতামাতার আনন্দ হ'ল বটে, কিন্তু রজনীর মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়ল। রজনী ঠিক করল রামসদয় বাবুদের বাড়ী আর যাবে না। কিন্তু যথাকালে ফুল নিয়ে সে ঠিকই গেল। রজনী গিয়েছিল লবঙ্গলতার সঙ্গে ঝগড়া করতে। কিন্তু লবঙ্গলতার ধমক খেয়ে কাঁদতে কাঁদতে উঠে এলো। পথে শচীন্দ্রের সঙ্গে আবার সাক্ষাৎ। রজনীকে লবঙ্গলতার কাছে নিয়ে আসবার জন্য সিঁড়ির কাছে শচীন্দ্র হাত ধরে তাকে সাহায্য করল। রজনীর মনে হ'ল এই বুঝি তার জীবনের শ্রেষ্ঠ মুহূর্ত। প্রতিজ্ঞা করল রজনী, ইহজন্মে আর কেউ অন্ধ ফুলওয়ালীর স্বামী হতে পারে না!

"যথাসময়ে……চলিলাম"—রজনীর সমস্ত প্রতিজ্ঞা ভেসে গেল। ঝোঁকের মাথায় রজনী যাই বলুক না কেন, সময় হলে কে যেন তাকে টেনে নিয়ে গেল।

"বিধাতা আমায়……করেন নাই"—শচীন্দ্রের রূপ রজনী দেখেনি সত্য, কিন্তু তার দরদ মাখানো কথা তো সে শুনেছে।

"এখন মরি না কেন"—প্রেমের বিদ্যুৎস্পর্শে যখন রজনীর সমস্ত দেহ রোমাঞ্চিত, মন যখন অপূর্ব ভাবাবেগে আবিষ্ট, তখনই যদি এই জীবনের অবসান হয়, সে তো সৌভাগ্য। মুহূর্তের মধ্যেই তো এই স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে, এই আবেশ যাবে টুটে। তখন এই হারানোর বেদনা তাকে যে দুঃখ দেবে, সেই দুঃখ থেকে পরিত্রাণের জন্য রজনী এই সুখাবেশের মধ্যেই তার জীবনের সমাপ্তি চেয়েছে।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

গোপালবাবুর সঙ্গে রজনীর বিবাহের কথা প্রায় পাকা হয়ে এসেছে। কিন্তু রজনী ভেবে উঠতে পারছে না, কি করবে! এমন সময় রজনীর একটি সুযোগ

মিলল। গোপালবাবুর স্ত্রী চাঁপা নিজের ঘরে সতীন আসার পথ বন্ধ করার জন্য উঠে পড়ে লাগল। হীরালাল নামে চাঁপার একটি ভাই ছিল। ভাইটি নিষ্কর্মা, অপদার্থ, মূর্খ ও লম্পট চরিত্রের। সে মদ খায় ও গাঁজা টানে আর লম্বা-চওড়া কথা বলে। সে একদিন উপযাচক হ'য়ে রজনীদের বাড়ী এল। টাকা পেলে সে নাকি রজনীকে বিবাহ করতে প্রস্তুত।

"রূপোষ হইল" – গা ঢাকা দিল।

'স্তুশ্চভিশ্চুসাৎ"—ব্যাকরণের একটি সূত্রের বিকৃত আকার। কঠিন সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণ ক'রে হীরালাল নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করবার চেষ্টা করেছে।

"ঘরের এদিক্ সেদিক্ দেখিতে লাগিল" - অন্ধ রজনী হীরালালের আচরণ টের পেল কি করে? মনে হয়, লেখক এই পংক্তিটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন না।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

বিয়ের দিন ক্রমেই এগিয়ে এল। আর একদিন বাকী। নিশ্চিত বিবাহ বন্ধনের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আশায় রজনী তার পিতামাতাকে বিবাহ বাতিল ক'রে দেবার অনুরোধ জানাল। এই অবস্থায় চাঁপা শেষ পর্যন্ত এসে তাকে উদ্ধার করল। স্থির হ'ল চাঁপা রজনীকে দু'দিন বাপের বাড়ী লুকিয়ে রাখবে। রজনী তাতেই সম্মত হল। চাঁপা এসে গভীর রাত্রে রজনীকে নিয়ে গেল। হীরালালের সঙ্গে রজনী পথে বেরোল। হীরালালের সঙ্গে যেতে রজনীর আপত্তির কোনো সুযোগই রইল না। শেষে হীরালালের হাতের তালের লাঠি দ্বিখণ্ডিত ক'রে রজনী একদিকে হীরালালকে তার শক্তি সম্পর্কে সচেতন করল, অন্যদিকে আধখানা লাঠি নিজের হাতে রাখল আত্মরক্ষার্থে।

"ঐশিক নিয়ম"—যে নিয়মে বিশ্ব-সংসার চলিতেছে।

"আমার সর্ব্বনাশিনী কুপ্রবৃত্তি মূর্তিমতী হইয়া আসিয়াছিল"—রজনীর সুপ্ত ইচ্ছা যেন চাঁপার রূপ ধরে তাকে বিপদের পথে ঠেলে দিল।

"এই সংসারের····· দয়াদাক্ষিণ্যশূন্য"—অন্ধ ব'লে, বিপন্নকে কেউ দয়া করে না, এমনই বুঝি জগতের নিয়ম। জগতের নিয়ন্তা শক্তি আপন মনে কাজ করে চলেছে, কোনো দিকে তার দৃষ্টি নেই। কালের চক্র ঘুরছে, যে চাকার তলায় পড়বে, তার নিস্তার নেই।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

বিবাহ করবার জন্য হীরালাল রজনীকে প্রথমে অনুরোধ করল, শেষে ভয় দেখাল। তাতেও কোনো ফল না হওয়াতে রজনীকে গঙ্গার চরায় নামিয়ে দিয়ে হীরালাল চলে গেল। রজনী গোড়ায় অনেক অনুরোধ জানিয়েছিল, কিন্তু হীরালালের একটি সর্ত— তাকে বিবাহ করতে হবে। রজনীকে একা ফেলে যখন হীরালালের নৌকো চলে যাচ্ছে, রজনী সেই শব্দ অনুসরণ করে তালের লাঠি নিক্ষেপ ক'রে হীরালালকে আঘাত করল। কিন্তু হীরালাল তাতে ক্রুদ্ধ হ'য়ে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিতে দিতে নৌকো বেয়ে চলে গেল।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

গঙ্গার সেই নির্জন চরায় দাঁড়িয়ে রজনী চিন্তা করতে লাগল। এ দুঃখের জীবন আর রাখার ইচ্ছে নেই তার। গঙ্গার তরঙ্গের মধ্যে নিজেকে ভাসিয়ে দিলেই তো মৃত্যুকে বরণ করা যায়। জীবন সম্পর্কে রজনীর বিতৃষ্ণা দেখা দিল। এই অসার জীবনে সুখ নেই। রজনীর চিত্তে সংসার সম্পর্কে দার্শনিক নির্লিপ্ততা দেখা দিল। অন্ধের রূপোন্মাদনা রজনীকে আরো বেশী অধীর ক'রে তুলল। তার চিত্তে প্রশ্ন দেখা দিল—"আমি কেন জন্মিলাম? কেন অন্ধ হইলাম? জন্মিলাম ত শচীন্দ্রের যোগ্য হইয়া জন্মিলাম না কেন? শচীন্দ্রের যোগ্য না হইলাম তবে শচীন্দ্রকে ভালবাসিলাম কেন? ভালবাসিলাম তবে তাঁহার কাছে থাকিতে পারিলাম না কেন? কিসের জন্য শচীন্দ্রকে ভাবিয়া গৃহত্যাগ করিতে হইল? নিঃসহায় অন্ধ, গঙ্গার চরে মরিতে আসিলাম কেন?···তবে কি আমার কর্ম্মফল? কোন্ পাপে আমি জন্মান্ধ।" রজনী গঙ্গার দিকে এগিয়ে চলল মৃত্যুর সংকল্প নিয়ে। ডুবলেও রজনী মরল না। স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। তার চেতনা লুপ্ত হ'ল।

"আর এক জন বলিবে"—রজনী কাহিনীর পরবর্তী অংশের ইংগিত দিয়েছে। সমগ্র প্রথম খণ্ডটিতে রজনী নিজের কথা বলেছে। কাহিনীর আর কোনোও অংশে রজনী এককভাবে নিজের কথা বলেনি। অন্যের কথায় আমরা রজনীর জীবনের পরিণতি বা তার মানসিক দ্বন্দ্বের পরিচয় পেয়েছি। ভূমিকায় বঙ্কিমচন্দ্র বলেছেন, "যে কথা যাহার মুখে শোভা পায়, সে কথা তাহার মুখে ব্যক্ত করা যায়।" রজনীর আত্মকথনের মধ্যে তার চরিত্রটি ধীরে ধীরে বিকশিত হয়ে উঠেছে এবং তার চিত্তের নানা ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার মধ্য দিয়েই উপন্যাসের কাহিনীভাগ গড়ে উঠেছে। রজনীর

কথাবার্তা এবং মানসিকতা এমনভাবে সে নিজে বর্ণনা করেছে, যাতে তার চরিত্রটি সম্পর্কে আমাদের সম্যক্ ধারণা হতে কোনো অসুবিধা হয় না। এই আত্মকথনের মধ্যেই তার যে আত্মস্বীকৃতি প্রকাশ পেয়েছে, অন্য কোনওভাবে বা অন্য কারোর দ্বারা তা এতখানি স্পষ্ট হ'য়ে উঠত না। অন্ধ নারীর স্পর্শানুভূতি, তার রূপোন্মত্ততা, শচীন্দ্রের প্রতি তার তীব্র আসক্তি সবই তার নিজের কথাতে প্রকাশ পেয়েছে। এই গভীর আবেগাকুলতা, প্রেমসঞ্চারের প্রতিক্রিয়া, জীবনের প্রতি মোহ আর অন্য কোনোওভাবে এত মহিমময়রূপে প্রকাশ পেতো না। বঙ্কিমচন্দ্রের সার্থকতা সেখানেই।

রজনী-চরিত্র অঙ্কনে বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম খণ্ডের মধ্যেই যে আঙ্গিক-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন, তা সত্যই অতুলনীয়। অন্য কোনোওভাবে অন্ধ নারীর জীবনাবেগকে এভাবে জীবন্ত ক'রে তোলা যেতো না ; কারণ অন্ধের রাজ্য অনুভূতির রাজ্য এবং শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের মধ্যেই দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব সে পূরণ করে নেয়। তাই তার এই অতিবিচিত্র মানসিক অবস্থাটি সে নিজেই যেভাবে বলতে পারে, অন্যের পক্ষে সেভাবে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমরা আগেই বলেছি, কাহিনীর পরবর্তী অংশে রজনী এককভাবে আর নিজের কথা বলেনি, তার কারণ হীরালালের সঙ্গে তার গৃহত্যাগের পর, রজনীর জীবনে এমন কতকগুলি ঘটনা ঘটে গেছে, যার ফলে রজনী শুধু অন্তর্দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কাহিনীর পরবর্তী ঘটনাবলী রজনীর এই তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এগিয়ে যেতে পারেনি। মাঝে মাঝে আমরা রজনীর এই অন্তর্দ্বন্দ্ব, তার বেদনা বা অন্ধত্বের অসহায়তা উপলব্ধি করেছি বটে, কিন্তু রজনী প্রথম খণ্ডের মত সমগ্র কাহিনীতে তেমন সজীব হয়ে উঠতে পারেনি। বিশেষতঃ, অমরনাথ-লবঙ্গলতা প্রসঙ্গের ওপর গুরুত্ব দেওয়ায় রজনীর কাহিনী যেন অকস্মাৎ গৌণ হয়ে উঠেছে। রজনীর প্রেমের তীব্র আকুলতা ও তার অন্ধ জীবনের বাধা, রজনীর মুখে শোনবার জন্য পাঠকের ঔৎসুক্যকে লেখক যেন পরবর্তী খণ্ডগুলিতে তেমন গুরুত্ব দেননি। ব্যঞ্জনার সাহায্যেও রজনীর জীবনে এই রূপমোহের চিত্রটি ফুটিয়ে তোলা হয়নি। প্রথম খণ্ডে রজনীর অকপট আত্মকথন, তার সম্পর্কে পাঠকের ধারণাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করেছে বটে, কিন্তু পরবর্তী অংশে রজনী নিজেকে প্রকাশ করতে হয়তো খানিকটা কুণ্ঠিত। কেন না, প্রেমের পদসঞ্চার অনাঘ্রাত কুমারী জীবনে যে লজ্জার নবারুণ রাগ সঞ্চার করে, সেই দ্বিধাই রজনীর বক্তব্য বা অনুভূতিকে লেখক অন্যের মাধ্যমে বিবৃত করেছেন। প্রেমের স্পর্শে রজনীর কুমারী চিত্তের যে জাগরণ, তার ফলে সরলরেখায় যে জীবন প্রবাহিত

হচ্ছিল, তা অকস্মাৎ তরঙ্গবিক্ষুব্ধ ঘূর্ণাবর্তে পড়ে রজনীর আয়ত্তের বাইরে চলে গেল। এই কাহিনী তখন রজনীর একার কাহিনী না থেকে বিচিত্র জীবন-সম্ভারে ইন্দ্রধনুর বর্ণচ্ছটার বৈচিত্র্য নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। প্রথম খণ্ডে রজনীর প্রেম-পূর্ব জীবনের সরল কাহিনী প্রেমসঞ্চারের আবেগাকুল ঝোড়োবাতাস রজনীর নিস্তরঙ্গ জীবনে যে চাঞ্চল্য জাগিয়েছে, তার ফলে রজনী রুটিন বাঁধা সংকীর্ণ জীবন থেকে দ্বন্দ্বসংক্ষুব্ধ বিরাট সংসারের আবর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায়ভাবে সেই স্রোতে এগিয়ে গেছে। সেখানে রজনীর কথা আর একার কথা নয়, সকলের সঙ্গেই তার কথা বিবৃত। তাই প্রথম খণ্ডে রজনীর কথা থাকলেও পরবর্তী অংশে তার আত্মকথন আমরা পাই না।

দ্বিতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় খণ্ড সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত এবং এই খণ্ডটির কথক অমরনাথ। অমরনাথ ধনী পিতার পুত্র, সৎকায়স্থ কুলোদ্ভব। বিদ্যা, বুদ্ধি, রূপ কিছুরই অভাব ছিল না অমরনাথের। কিন্তু তাঁর বংশের এক খুল্লতাত পত্নী কুলত্যাগিনী হওয়ায় সেই অখ্যাতির জন্য ভাল বংশ থেকে অমরনাথের কোন বিবাহ সম্বন্ধ এল না। অমরনাথের পিতৃবিয়োগের পর অমরনাথের পিসী একটি বিবাহের সম্বন্ধ নিয়ে এলেন। পিসীর শ্বশুরবাড়ীর গ্রামে লবঙ্গলতা নামে একটি মেয়ে ছিল, তার সঙ্গে অমরনাথের বিবাহের কথা উঠল। অমরনাথ পিসীর গ্রামে যেতেন বলে লবঙ্গলতার সঙ্গে আগেই তার পরিচয় ছিল। লবঙ্গকে অমরনাথ লেখাপড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। কিন্তু বিবাহের কথা আরম্ভ হওয়ার পর থেকে লবঙ্গ আর অমরনাথের কাছে যেত না। লবঙ্গ অসামান্যা সুন্দরী ছিল। কিন্তু এই বিবাহ অমরনাথের কুলকলঙ্কের জন্য ভেঙে গেল। রামসদয় মিত্রের সঙ্গে লবঙ্গলতার বিবাহ হ'য়ে গেল। এর কিছুদিন পরে একটা গুরুতর দুষ্কর্ম করতে গিয়ে অমরনাথ হলেন লাঞ্ছিত এবং মনের দুঃখে গৃহত্যাগ ক'রে তিনি দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ঘুরতে ঘুরতে তিনি কাশীধামে এসে উপস্থিত হলেন এবং সেখানে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে পুলিশের অত্যাচারঘটিত একটি কাহিনী জানতে পারেন। এই কাহিনীটি হ'ল—রজনী নামে একটি অন্ধ বালিকা তার পিতার সম্পত্তিতে বঞ্চিত হয়ে দরিদ্র জীবন যাপন করছে এবং তার সেই সম্পত্তি ভোগ করছে রামসদয় মিত্র। অমরনাথ এবারে একটি কাজের মত কাজ পেলেন – রজনী যদি বেঁচে থাকে, তবে তার সন্ধান ক'রে তাকে খুঁজে বের করা এবং তার পিতার সম্পত্তি তাকে ফিরিয়ে দেওয়া। নানাস্থানে ঘুরে ঘুরে শেষে অমরনাথ বাংলাদেশে এলেন এবং সেখানে অপ্রত্যাশিত-ভাবে রজনীর সন্ধান পেলেন। রজনীকে এক দুর্বৃত্ত আক্রমণকারীর হাত থেকে রক্ষা করতে গিয়ে তিনি গুরুতর আহত হলেন। আরোগ্য লাভ করে অমরনাথ রজনীকে নিয়ে কলকাতা গেলেন এবং তার পিতামাতার নিকট উপস্থিত হলেন। রজনীর মুখে অমরনাথ রজনীর পলায়ন বৃত্তান্ত সবই জেনে নিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় খণ্ডে কাহিনী অগ্রগতির সঙ্গে আরো জটিল দ্বন্দ্ববহুল রূপ নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। অমরনাথ প্রসঙ্গে প্রথম খণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে লবঙ্গলতা প্রসঙ্গের সূত্র ধরে। লবঙ্গকে কেন্দ্র করে অমরনাথের যে বেদনাময় স্মৃতি তাই তাকে ঠেলে

দিয়েছে উদ্দেশ্যহীনভাবেই ভবঘুরের জীবন যাপন করতে। রজনীর বৃত্তান্ত আকস্মিকভাবেই তার কানে এসেছে। দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখি অমরনাথ শুধু রজনীকেই উদ্ধার করেননি, রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্যও সচেষ্ট। এই সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপার নিয়েই লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের সংঘর্ষ উপস্থিত। লবঙ্গলতা ও অমরনাথের যে পূর্বপরিচয় ছিল, তা কাহিনীকে আরো কৌতূহলোদ্দীপক করে তুলেছে। কাহিনীর অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর পরবর্তী খণ্ডে লবঙ্গলতা-অমরনাথের দ্বন্দ্ব আরো তীব্র হ'য়ে উঠেছে এবং তার ফলে তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য স্পষ্টতর হ'য়ে দেখা দিয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে অমরনাথের কথার মধ্য দিয়ে রজনী-অমরনাথ-লবঙ্গলতা কাহিনী আরো বিস্তৃতি লাভ করেছে।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে অমরনাথ নিজের পরিচয় দেবার আগে তার জীবন সম্পর্কে অনাসক্তি ও হতাশা প্রকাশ করেছেন। সূত্রপাতে অমরনাথ বলেছেন—"আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরের কোন্ চরে লাগিয়া আমার এ নৌকা ভাঙিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।"

এরপর অমরনাথ নিজের পরিচয় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন। ধনী, শিক্ষিত অমরনাথের জন্য বিবাহের সম্বন্ধ স্থির করা, কুলকলঙ্কের জন্য বারবার সম্বন্ধ ভেঙে যাওয়া, শেষে পিসীর শ্বশুর বাড়ীর গ্রামে লবঙ্গলতার সঙ্গে তার সম্বন্ধের পরিচয় পাই। লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের পূর্বপরিচয় ছিল। কারণ বালিকাকে অমরনাথ পড়ার ব্যাপারে সাহায্য করতেন। লবঙ্গ অত্যন্ত রূপবতী, সেই রূপের আকর্ষণে অমরনাথ লবঙ্গের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হলেন। কিন্তু একই কারণে এখানেও অমরনাথের বিবাহ ভেঙে গেল। লবঙ্গের সঙ্গে ভবানীনগরের রামসদয় মিত্রের বিবাহ হ'ল। এই বিবাহের কয়েক বছর বাদে অমরনাথের জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটল, যার ফলে অমরনাথ গৃহত্যাগী হয়ে নানাদেশ ভ্রমণ ক'রে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও স্থায়িভাবে বাস করার মন হ'ল না তাঁর। ইচ্ছা করলেই তিনি বিবাহ ক'রে স্থায়িভাবে বাস করতে পারতেন। বলেছেন তিনি,—"আমার সব ছিল—ধন-সম্পদ, বয়স, বিদ্যা, বাহুবল, কিছুরই অভাব ছিল না; অদৃষ্ট দোষে একদিনের দুর্বুদ্ধি-দোষে সকল ত্যাগ করিয়া আমি এই সুখময় গৃহ—এই উদ্যানতুল্য পুষ্পময় সংসার ত্যাগ করিয়া, বাত্যাতাড়িত পতঙ্গের মত দেশে দেশে বেড়াইলাম।" জীবনে নিজের সুখে ইচ্ছাকৃত-

ভাবে জলাঞ্জলি দিয়ে দুঃখময় জীবনকে অমরনাথ বরণ ক'রে নিলেন। একটা আশাভঙ্গজনিত বেদনায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ভ্রমণ ক'রে অমরনাথের জীবন কাটল। তার দুষ্কর্মের স্মৃতি মন থেকে মুছে যায়নি। তাই সংসার তাঁর কাছে শ্রীহীন, জীবন অর্থহীন মনে হয়েছে।

"সর্পের মণি…… বিদ্যা ছিল"—অমরনাথের ক্ষুব্ধ মনের বেদনা প্রকাশ পেয়েছে। কলঙ্কিত জীবনে বিদ্যার বড়াই ক'রে লাভ নেই।

"পতত্রি"—পক্ষী।

"তরঙ্গে নৌকা ……কূল পাওয়া যায়"—জীবনে দুঃখ এলেও সেই দুঃখকে অতিক্রম করার চেষ্টা না ক'রে অমরনাথ লালন করেছেন, নিজের আচরণ সম্পর্কে অমরনাথ নিজেকেই যেন ধিক্কার দিয়েছেন। তাই দুঃখ থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার চেষ্টা তিনি করেননি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দেশে দেশে ঘুরে ধীরে ধীরে অমরনাথ নিজের দুষ্কর্মের বেদনাময় স্মৃতি থেকে খানিকটা সাম্‌লে উঠলেন। কাশীতে গোবিন্দকান্ত দত্ত নামে একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সঙ্গে অমরনাথের আলাপ হয়। একদিন কথা প্রসঙ্গে গোবিন্দবাবু পুলিসের অত্যাচার ঘটিত একটি কাহিনী বললেন। হরেকৃষ্ণ দাস নামে এক দরিদ্র ব্যক্তির রজনী নামে একটি কন্যা ছিল। কিন্তু তার গৃহিণীর মৃত্যু হওয়ায় এবং সে নিজেও রুগ্ন হওয়ায় আপন কন্যাটিকে প্রতিপালনের জন্য শ্যালীপতি রাজচন্দ্র দাসকে দিয়েছিল। রজনীর নামে কতকগুলি স্বর্ণালঙ্কার ছিল। সেগুলি হরেকৃষ্ণ রাজচন্দ্রকে দেয়নি। শেষে মৃত্যুকালে সেই অলঙ্কারগুলি সে গোবিন্দবাবুর কাছে জমা রাখে, রজনী বড় হ'লে সেগুলো তাকে দেবার জন্য। হরেকৃষ্ণের মৃত্যু হ'লে তার কোনোও উত্তরাধিকার নেই ভেবে পুলিস স্বর্ণালঙ্কার সমেত সমস্ত কিছুই আত্মসাৎ করলো। কথা প্রসঙ্গে অমরনাথ জানতে পারলেন হরেকৃষ্ণের এক ভাই মনোহর দাস এবং হরেকৃষ্ণের শ্যালীপতি রাজচন্দ্র রজনীকে নিয়ে কলকাতায় থাকেন।

এই পরিচ্ছেদে রজনী-কাহিনী আরো আকর্ষণীয় ও নাটকীয় রূপলাভ করেছে। রজনী-কাহিনী পটভূমিকায় একটি রহস্য ঘনীভূত হয়ে উঠেছে এবং অমরনাথ যে সেই রহস্য উন্মোচনে উদ্যোগী হতে চলেছেন, তার ইঙ্গিত এই পরিচ্ছেদে আমরা পেয়েছি।

"কপোলকল্পিত"—কাল্পনিক গাল-গল্প।

"লাওয়ারেশ"—বেওয়ারিশ, উত্তরাধিকারহীন অবস্থায়।

"ফৌত করিয়াছে"—মরেছে।

"শ্যালীপতি"—রজনীর মেসোমশায়।

"নন্দি-ভৃঙ্গি সঙ্গে দেবাদিদেব মহাদেব দারোগা"—নন্দী-ভৃঙ্গি-ভূতপ্রেত সঙ্গে নিয়ে মহাদেব যেমন দক্ষযজ্ঞ লণ্ডভণ্ড করতে এসেছিলেন, দারোগাও তেমনি তার পুলিসের দলবল নিয়ে সমস্ত কিছু লণ্ডভণ্ড করতে উপস্থিত হয়েছিল।

"হুজুরে হাজির"—আদালতে বিচারকের সামনে উপস্থিত হওয়া।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে অমরনাথের দার্শনিক মানসিকতা প্রকাশ পেয়েছে। অমরনাথ এখানে আত্মবিশ্লেষণ করেছেন। কিসের অভাবে তাঁর এই দুঃখবোধ, নানাভাবে আলোচনা ক'রে সেই সত্যকে তিনি উপলব্ধি করার চেষ্টা করেছেন। সুখ-দুঃখের রহস্য কি—বলেছেন অমরনাথ, অভাব থেকেই তো দুঃখ! অমরমাথ কিসের অভাবে দুঃখী। ধন-ধর্ম-যশ-বল-মান-রূপ-স্বাস্থ্য-বিদ্যা-বুদ্ধি কিছুরই তো তাঁর অভাব নেই। তবুও তাঁর এই দুঃখ কেন? নিজের জীবন সম্পর্কে হতাশা তাঁকে এতদূর গ্লানিময় ক'রে তুলেছে যে, বেঁচে থাকার কোনও আকর্ষণও তিনি বোধ করছেন না। লবঙ্গলতাকে ভালবাসার ক্ষত অমরনাথ যেন কিছুতেই ভুলতে পারেন না। তাই তিনি মনে করেন ভালবাসার অভাব নয়, ভালবাসাই দুঃখ। শেষ পর্যন্ত অমরনাথ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন, "আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ।...সকলই অসার। তাই আমার কেবল দুঃখ সার।"

"বেকনের ঘুষখোর অপবাদ"—প্রসিদ্ধ ইংরাজ রাজনীতিবিদ্ ও দার্শনিক ফ্রান্সিস বেকন ঘুষ গ্রহণের জন্য দণ্ডিত হন।

"সক্রেতিস্ অপযশ হেতু বধদণ্ডার্হ"—সক্রেটিসের মতো দার্শনিককেও অভিযুক্ত করা হয় যে, তিনি নাকি যুবকদের নৈতিক চরিত্র নষ্ট করেছেন এবং সেই অভিযোগে সক্রেতিস্‌কে বিষপানে আত্মত্যাগ করতে হয়।

"যুধিষ্ঠির দ্রোণবধে মিথ্যাবাদী"—ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠিরের মতো পুণ্যাত্মা চরিত্রেও মিথ্যাভাষণের কলঙ্ক স্পর্শ করেছিলো। "অশ্বত্থামা হতঃ ইতি গজঃ" ব'লে তাঁর বলার ভঙ্গীর জন্য ইচ্ছাকৃতভাবে বিভ্রান্তির সৃষ্টি ক'রে তিনি অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মৃত্যুর কারণ হয়েছিলেন।

"অর্জুন বভ্রুবাহন কর্তৃক পরাভূত" চিরজয়ী অর্জুন মণিপুর রাজ্যে নিজ পুত্রের নিকট পরাজিত হন।

"কাইসারকে বিথীনিয়ার রাণী বলিত"—দিগ্বিজয়ী সিজার বিথীনিয়ার রাজার মনস্তুষ্টির জন্য তাঁর পরিচর্যা করতেন। সেজন্য এতবড় বীরকেও লোকে বিদ্রূপ ক'রে বিথীনিয়ার রাণী বলত।

"সেক্সপীয়রকে বল্‌টের ভাঁড় বলিয়াছিল"—গ্রীক নাটকের প্রচলিত নিয়ম ও শৃঙ্খলা সেকস্‌পীয়র লঙ্ঘন করেছিলেন ব'লে প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক ভল্‌টেয়ার সেকস্‌পীয়রকে নিন্দা করেছিলেন।

"মান চাহি কেবল আপনার কাছে"—আত্মসম্মান সম্পর্কে অমরনাথ এত সচেতন ব'লে অমরনাথ অন্যের কাছে মান পাওয়াকে খুব বেশী গুরুত্ব দিতেন না।

"ভালোবাসাই দুঃখ"—লবঙ্গলতাকে ভালবেসে অমরনাথের জীবনে যে বিপর্যয় ঘটেছিল, সেই স্মৃতি তাকে জীবনভোর এইভাবে বিতাড়িত ক'রে নিয়ে বেড়িয়েছে।

"আমার কাম্যবস্তুর অভাবই আমার দুঃখ"—মানুষ জীবনে কিছু-না-কিছু প্রত্যাশা করে। সেই প্রত্যাশিত বস্তুর প্রাপ্তিতেই তার সুখ, অপ্রাপ্তিতে তার দুঃখ। অমরনাথের উপলব্ধি ঘটেছে যে, তাঁর জীবনে কোনোও প্রত্যাশা নেই এবং কোনোও কিছু কাম্যবস্তুর অভাবই তার দুঃখ। তাই সে দুঃখকেই তিনি একমাত্র সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

অমরনাথের মনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে, কাম্যবস্তু কি কিছুই নেই? যে উদ্দেশ্যকে চরিতার্থ করবার জন্যে জীবন উৎসর্গ ক'রে জীবনের বেদনা ও দুঃখকে ভোলা যায়, এমন কিছুই কি অমরনাথের ভেতর নেই? পরের উপকারের দ্বারা জীবনের শূন্যতা কাটানো যায় বটে, কিন্তু সে কাজে কতটুকু সময়ই বা ব্যয় হয়! দার্শনিকচিন্তা নিয়ে অমরনাথ নিজেকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। পরোপকার ক'রে কত সময় কাটাবেন অমরনাথ। কারুর ছেলের অসুখে ওষুধ কিনে দিয়ে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্র দিয়ে, দরিদ্র বিধবাকে মাসোহারা দিয়ে, কারুর ছেলের স্কুলের বেতন দিয়ে কতটুকু সময় যায় বা পরিশ্রম হয়। তাতে মানসিক শক্তিই বা কতটুকু নিয়োজিত হয়। অন্য একটি উপায় হচ্ছে সভা-সমিতি, ক্লাব, রেজলিউশন, বক্তৃতা, আবেদন-নিবেদন ইত্যাদি করেও সময় কাটানো যায় বটে, কিন্তু এসবের ওপর অমরনাথের খুব বেশী ভরসা নেই। তাছাড়া সামাজিক সংস্কারে—যেমন বিধবার বিবাহ দেওয়া, কুলীন ব্রাহ্মণের বিবাহ বন্ধ

করা, অল্পবয়সে বিবাহ বন্ধ করা, জাতি উঠাইয়া দেওয়া, স্ত্রী-স্বাধীনতার জন্য আন্দোলন কোনো ব্যাপারেই অমরনাথের কোনো ভরসা নেই। তাই এই কর্মহীনতার গ্লানি অমরনাথকে বারংবার পীড়িত করছে। তাতেই তাঁর দুঃখ। আর কিছু দুঃখ নেই। লবঙ্গলতার হস্তলিপি পর্যন্ত অমরনাথ ভুলে যেতে বসেছেন।

"আমার এক বাঞ্ছনীয়···উন্মূলিত করিয়াছি"—লবঙ্গলতাকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় অমরনাথ যে বাসনা পোষণ করতেন, ঘটনাচক্রে সে বাসনা অপূর্ণই থাকবে মেনে নিয়ে অমরনাথ সেই স্মৃতি ভুলতে বারবার চেষ্টা করেছেন।

"মানসিক শক্তি-সকল···উত্তেজিত হয়"—অর্থসাহায্য বা চিকিৎসা সাহায্য ক'রে যে সময় কাটে, তাতে মানসিক সামর্থ্যের কোনো চর্চা বা ব্যয় হয় না।

"আমার গরু নাই"—এখানে অমরনাথ বলেছেন তাঁর স্ত্রী নেই।

"পরের গোয়ালের···সম্বন্ধ নাই"—অন্যের গৃহিণীদের সম্পর্কে অমরনাথের বিশেষ কোনো যোগাযোগ নেই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এতদিন বাদে অমরনাথ যেন কাজের মত একটা কাজ খুঁজে পেলেন। তিনি রজনীকে খুঁজে বের করবেন এবং তার পৈতৃক সম্পত্তিও উদ্ধার ক'রে দেবেন। এই প্রসঙ্গে অমরনাথ লবঙ্গলতার কথা তার সতীন পুত্র শচীন্দ্রের পরিচিতি বর্ণনা করেছেন। শচীন্দ্রের পিতা রামসদয় মিত্র এবং পিতামহ বাঞ্ছারাম। বাঞ্ছারামের একজন পরম বন্ধু মনোহর দাসের আনুকূল্যে তিনি প্রচুর সম্পত্তির অধিকারী হন। কিন্তু বাঞ্ছারামের পুত্র রামসদয়ের সঙ্গে তাঁর সদ্ভাব না থাকায় এবং পরমহিতৈষী মনোহর দাসকে রামসদয় একদিন কটুকথা বলায় মনোহর দাস বাঞ্ছারামের কর্ম পরিত্যাগ করে দেশান্তরী হন। অনেক অনুসন্ধান করেও বাঞ্ছারাম যখন মনোহর দাসের কোনো হদিশ পেলেন না, তখন তিনি পুত্রের ওপর অত্যন্ত কুপিত হয়ে উইল ক'রে মনোহর দাসের উত্তরাধিকারীর নামে সমস্ত সম্পত্তি লিখে দিলেন এবং মনোহর দাসের উত্তরাধিকারীর কোনো সন্ধান না পাওয়া গেলে রামসদয়ের পুত্র-পৌত্রাদি সেই সম্পত্তি ভোগ-দখল করবে ব'লে উইলে নির্দেশ দিলেন। রামসদয় পিতৃগৃহ ভবানীনগর ত্যাগ ক'রে কলকাতায় এসে বাস করতে লাগলেন এবং ঘটনাচক্রে বাণিজ্যের দ্বারা অর্থ উপার্জন ক'রে সংসার প্রতিপালনে রত হলেন। বাঞ্ছারামের মৃত্যুর পর রামসদয় ভবানীনগরে ফিরে গেলেন না। উইলের Executor

বিষ্ণুরামবাবু মনোহরদাস বা তার উত্তরাধিকারীর কোনো সন্ধান না পাওয়ায় মনোহর দাসের সম্পত্তি রামসদয়ের পুত্রদের উপর বর্তাল। এখন রজনীর সন্ধান খুঁজে পেলে এই রহস্যের একটা কিনারা হয়। আজ যে সম্পত্তি রামসদয় ভোগ করছেন, সেই সম্পত্তির আসল অধিকারিণী হবে রজনী। সে হয়ত এখন দারিদ্র্যের মধ্যে জীবন কাটাচ্ছে।

এই পরিচ্ছেদ বর্ণনার মধ্যে কাহিনী একটি জটিল আবর্তের মধ্যে উপনীত হয়েছে। অমরনাথের অবচেতন মনে লবঙ্গলতার প্রতি যে ক্ষোভ জমা হয়ে আছে, রজনীর উপকারের ছদ্মবেশে তা আত্মপ্রকাশ করেছে। কর্মহীনতার গ্লানি কাটাবার জন্য অমরনাথ রজনীর সন্ধানে প্রবৃত্ত এ সত্য বহিরঙ্গিক। এর অন্তর্নিহিত রহস্য লুকিয়ে আছে রামসদয় মিত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে লবঙ্গলতার প্রতি প্রতিশোধ নেওয়ার মধ্যে। তাই আপাতদৃষ্টিতে অমরনাথ চরিত্রের মহত্ত্ব যতই প্রতিভাত হোক, আসলে পরাজিত নায়কের প্রতিহিংসা এতে চরিতার্থতা লাভ করেছে। এই পরিচ্ছেদে অমরনাথের বিবৃতির মধ্যে এই সত্যকে গোপন করার চেষ্টা থাকলেও তা প্রকাশ হ'য়ে পড়েছে। সমগ্র কাহিনীর দিক দিয়ে বিচার করলে তাই এই পরিচ্ছেদের গুরুত্ব অপরিসীম। অমরনাথ বলেছেন, "ঈশ্বর আমাকে বুঝি একটি গুরুতর কার্যের ভার দিলেন।···রজনীর যথার্থ উপকার চেষ্টা করিলে করা যায়··· এই কাজ কেন করি না?" রামসদয়ের পরিচিতি—পর্ব শেষে পরিচ্ছেদের শেষ অংশে অমরনাথ বলেছেন, "রজনী যদি জীবিত থাকে, তবে যে সম্পত্তি রামসদয় মিত্র ভোগ করিতেছে, তাহা রজনীর সন্ধান করিয়া দেখা যাউক। আমার আর কোন কাজ নাই।" এর মধ্যেই অমরনাথের প্রবণতা সহজেই উপলব্ধি করা যায়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে ঘটনাচক্রে অমরনাথ রজনীর সন্ধান পেলেন এবং তাকে দুর্বৃত্তের হাত থেকে রক্ষা করলেন। দুর্বৃত্তের দ্বারা পরিত্যক্ত রজনীকে আক্রান্ত হতে দেখে অমরনাথ দৈবক্রমে সেখানে উপস্থিত হয়ে নিজে আহত হয়েও রজনীকে উদ্ধার করলেন এবং এক আত্মীয়ের বাড়ীতে কিছুকাল অসুস্থ থেকে ক্রমে ক্রমে আরোগ্য লাভ করলেন। তখন রজনীর নাম শুনে তার পরিচয় জিজ্ঞাসা ক'রে রজনীকে নিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হলেন।

এই পরিচ্ছেদে আমরা পরোপকারী অমরনাথের মহত্ত্বে মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু তাঁর মনের অন্তস্তলে যে জ্বালা তার উষ্ণতাও আমাদের অনুভূতি স্পর্শ করে।

"কঙ্কাল"—কাঁকাল, কোমর।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে আমরা জানতে পারি অমরনাথ নানা প্রশ্ন ক'রে রজনীর কাছ থেকে অনেক খবর জেনে নিয়েছেন। কলকাতায় এসে অমরনাথ রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। অন্ধ রজনীর বুদ্ধি এবং সরলতায় অমরনাথ রজনী সম্পর্কে একটি বিশেষ মমত্ববোধ করলেন। হীরালাল রজনীকে সেই নদীর চড়ায় একাকী পরিত্যাগ ক'রে যাবার পরে কিভাবে একটি নৌকার লোকেরা তাকে দেখতে পেল এবং অমরনাথ যে গ্রামে রজনীকে দেখলেন, এক দুর্বৃত্ত ছলনা ক'রে সেই নৌকা থেকে তাকে নামিয়ে নিল। সেসব ঘটনা রজনী অমরনাথকে জানাল। অমরনাথ রজনীকে সঙ্গে নিয়ে রাজচন্দ্র দাসের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। এবং রাজচন্দ্রকে জেরা ক'রে তাঁর সম্ভাব্য ধারণাকে সত্য বলে প্রতিষ্ঠিত করলেন।

এই পরিচ্ছেদে অমরনাথের আচরণ অনেকটা গোয়েন্দা কাহিনীর সখের গোয়েন্দার মত। কারণ গোয়েন্দারা যেভাবে প্রশ্ন ক'রে সত্য আবিষ্কারে তৎপর হন, অমরনাথ যেন সেই ভঙ্গীতে রজনী বা রাজচন্দ্রকে প্রশ্ন ক'রে ক'রে সত্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা করেছেন। এত সুলভ ভঙ্গীতে রজনীর উদ্ধার ও তার পূর্ব পরিচয়ের রহস্য উদ্ধার বঙ্কিমচন্দ্র সমাধান করেছেন, যাতে কাহিনী তার স্বাভাবিক গতি হারিয়ে অত্যন্ত সরলীকৃত সমাধানে পৌঁছেছে। যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীর গ্রন্থন করেছিলেন, এই সুলভ সমাধানে তার মহিমা অনেকাংশে ক্ষুণ্ণ। তবে কাহিনী দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে সুস্পষ্টভাবে সমাধানের অভিমুখে যাত্রা করেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই। যে অমরনাথ তার লবঙ্গঘটিত বেদনাময় স্মৃতিকে ভোলবার জন্য উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সেই অমরনাথকে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে দেখলাম রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারের জন্য তিনি সর্বশক্তি এবং মন নিযুক্ত করেছেন।

অমরনাথ ও লবঙ্গলতাঘটিত কাহিনীটি এখনও পর্যন্ত পাঠকের কাছে রহস্যমণ্ডিত। তবে এটুকু স্পষ্ট যে, অমরনাথ লবঙ্গকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা করে তা থেকে বঞ্চিত হয় এবং সেই প্রত্যাখ্যানের জ্বালায় প্রতিশোধ গ্রহণে সক্রিয় হয়ে ওঠেন। প্রত্যাখ্যানের কারণ কি, কেনই বা অমরনাথ প্রতিশোধ গ্রহণে এত সক্রিয়, দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে পাঠক জীবন্ত কৌতূহল নিয়ে সেই রহস্য উন্মোচনের প্রতীক্ষা করে। তবে একটা বিষয় স্পষ্ট যে, অমরনাথ ও লবঙ্গলতার সংঘর্ষ অনিবার্য। শচীন্দ্র তথা রামসদয় মিত্রকে সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করতে পারলে লবঙ্গলতার বৈভবের দেমাক অমরনাথ শুধু চূর্ণ করতে পারবেন না, যে রামসদয় মিত্র লবঙ্গলতাকে দ্বিতীয় পত্নীরূপে গ্রহণ ক'রে অমরনাথকে

বঞ্চিত করেছেন, তাঁর ওপরেও প্রতিশোধ নেওয়া হবে। এই সম্পত্তি উদ্ধারের রহস্যগ্রন্থি উন্মোচনের সঙ্গে সঙ্গে অমরনাথ-লবঙ্গলতার কাহিনী ও চরিত্র আরো বেশী স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে উঠবে। সুতরাং দ্বিতীয় খণ্ডের শেষে আমরা কাহিনীর সমগ্র রহস্যজাল ও বিস্তৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হই এবং পরবর্তী খণ্ডগুলি সেই রহস্যের গ্রন্থি উন্মোচন করে কাহিনীকে পরিণতির দিকে নিয়ে যাবে। প্রধান পাত্র-পাত্রীদের চরিত্র-বৈশিষ্ট্যগুলিও তথা বঙ্কিমচন্দ্রের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তৃতীয় খণ্ড

তৃতীয় খণ্ডটি ছয়টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এই খণ্ডটির কথক শচীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্রনাথ রজনীর বিবাহের উদ্যোগ করেছিল। কিন্তু বিবাহের দিন সকালে শোনা গেল রজনীর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না, সেইসঙ্গে হীরালালও নিখোঁজ। তবে কি রজনী হীরালালের সঙ্গে গৃহত্যাগ করল ? রজনী কি ভ্রষ্টা ? কয়েকদিন পরে হীরালালের দেখা মিললো। প্রশ্ন করা হ'লে, সে জানাল রজনীর কোনো খবরই সে জানে না। শচীন্দ্র রজনী সম্বন্ধে ভাবতে আরম্ভ করল। রজনী সুন্দরী বটে, কিন্তু তার চোখে সেই মোহিনী কটাক্ষ তো নেই। তাই তার রূপ থাকলেও রূপের আকর্ষণ নেই। সুতরাং রজনী কোনও ভদ্রলোকের বিশেষ করে শচীন্দ্রের মত পাত্রের বিবাহযোগ্যা হ'তে পারে না। শচীন্দ্র রজনীর সত্য পরিচয়ও জানত না।

পরে শচীন্দ্র খবর পেল রজনীকে পাওয়া গেছে। কিন্তু রজনী কোথায় গিয়েছিল, কে-ই বা তাকে, কেমন করেই বা উদ্ধার করল, এসব কোনোও তথ্যই জানা গেল না। এমনকি লবঙ্গলতার মত বুদ্ধিমতীও কোনো খবর বের করতে পারল না। রজনীও লবঙ্গলতার বাড়ীতে আসা বন্ধ করে দিল। মাসখানেক পরে একদিন অমরনাথ শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং রজনীকে বিবাহ করবার প্রস্তাব দিলেন। অমরনাথ একথা জানাতেও ভুললেন না যে, শচীন্দ্র ও তার পিতা যে বিষয়-সম্পত্তি ভোগ করছেন, তা রজনীর। শচীন্দ্র প্রথমে একথা বিশ্বাস করেনি। কিন্তু উকিলের কাছ থেকে জানতে পেল যে, রজনী সত্যই বিষয়ের উত্তরাধিকারিণী। শচীন্দ্র বিষয় ছেড়ে দিল, কিন্তু রজনী দখল নিল না। একদিন রাজচন্দ্র দাস এসে নানাকথার পর শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহের প্রস্তাব তুলল। সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় ভবিষ্যতের অর্থাভাব কল্পনা ক'রে রামসদয় নিজেই শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহের কথা তুললেন। এতে সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয় থাকবে না। একথায় শচীন্দ্র অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে লবঙ্গলতার কাছে গেল। লবঙ্গলতারও সেই বাসনা যে, রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ হোক। শচীন্দ্র অনেক রাগারাগি করল, কিন্তু লবঙ্গলতারও দৃঢ় প্রতিজ্ঞা যে, শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেবেই। এক সন্ন্যাসী মধ্যে মধ্যে শচীন্দ্রদের বাড়ীতে আসতেন। তিনি অলৌকিক রূপ প্রত্যক্ষ করাতে পারতেন। তিনি জানালেন, এই অলৌকিক প্রক্রিয়ায় শচীন্দ্র রাত্রে সেই নারীকে স্বপ্নে দেখবে যে-নারী তাকে সর্বাপেক্ষা ভালবাসে।

শচীন্দ্র রজনীকে স্বপ্নে দেখল। এই কানা ফুলওয়ালীর চেয়ে এই পৃথিবীতে শচীন্দ্রকে কেউ বেশী ভালবাসে না! সংশয় এবং দ্বিধায় শচীন্দ্রের চিত্ত দোলায়িত।

উপন্যাসের এই অংশটিতে কাহিনীকে পরিণতিমুখী করে তোলবার বাসনায় বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রকে যেভাবে চিত্রিত করেছেন, তাতে শচীন্দ্রের মহিমা যেমন ক্ষুণ্ণ, চরিত্রের স্বাভাবিক বিকাশও তেমনি ব্যাহত। শচীন্দ্র যেন গল্পের অনুরোধে রজনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছে। নরনারীর মধ্যে প্রেমের যে অঙ্কুরোদ্গম এবং পারস্পরিক আকর্ষণের জল-সিঞ্চনে তা যেমন ধীরে ধীরে বর্ণবৈচিত্র্যে বিকশিত হ'য়ে ওঠে, প্রেমের সেই স্বাভাবিক লীলারহস্য এখানে অনুপস্থিত। রজনীকে বিবাহ করার যে মানসিকতা শচীন্দ্রের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে, তার পশ্চাতে যে কারণটি সক্রিয় তার দ্বারা প্রেমের মহিমা লাঞ্ছিত। সম্পত্তি হাতছাড়া হওয়ার ভয়ে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবের দ্বারা যেভাবে শচীন্দ্রের বিরূপ মনকে রজনীর প্রতি অনুরক্ত ক'রে তোলা হয়েছে, তা যেমনই আকস্মিক তেমনই অস্বাভাবিক। এর জন্য লেখকের কোনো পূর্বপ্রস্তুতি ছিল না। সবচেয়ে পীড়াদায়ক শচীন্দ্রের অবিকশিত চরিত্র। রজনী ও লবঙ্গলতাকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্র-চরিত্রকে অবিকশিত অবস্থায় রেখেছেন। যে রজনী শচীন্দ্রের মুহূর্তের স্পর্শে রোমাঞ্চিত হয়েছে, অন্ধ নারী শচীন্দ্রের সেই স্পর্শকে মনে মনে লালন ক'রে প্রেমের অপরূপ পুলকে বিকশিত হয়ে উঠেছে। সেই স্পর্শানুভূতি রজনীচিত্তে প্রেমের প্রথম পদক্ষেপ স্থাপন করেছে। যে প্রেমের দুর্জয় শক্তিতে রজনী গৃহত্যাগ করেছে, নিজের অসহায়তাকে অগ্রাহ্য করে জীবনের ঝুঁকি নিয়েছে, যে পাত্রকে কেন্দ্র করে রজনীর এই চিত্তবিকার তার সম্পর্কে রজনী কোনও বিস্তারিত পরিচিতি যেমন দেয়নি, লেখকও শচীন্দ্রের বক্তব্য বিবৃত করতে গিয়েও শচীন্দ্র সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য তথ্য আমাদের জ্ঞাত করাননি। তাই কোনও কোনও সমালোচক এই অংশটিকে উপন্যাসের দুর্বলতম অংশ বলে চিহ্নিত করেছেন।

আমরা জানি, তৃতীয় খণ্ডটির কথক শচীন্দ্র স্বয়ং। তৎসত্ত্বেও শচীন্দ্রের প্রতি লেখকের এই অনাদর পীড়াদায়ক। শচীন্দ্র সম্পর্কে এমন তথ্য লেখক আমাদের দেননি, যার সাহায্যে শচীন্দ্রের মানসিকতা আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ ধরনের নিষ্ক্রিয় পুরুষ-চরিত্র বঙ্কিম-সাহিত্যে বিরল। এ যেন রজনীর প্রেমসত্তাকে জাগরিত করবার জন্য শচীন্দ্র নামধেয় একটি প্রতীক পুরুষকে কাহিনীতে বঙ্কিমচন্দ্র নিয়ে এসেছেন। তা না হলে, যে পুরুষের স্পর্শে রজনীর চিত্ত প্রেমাবেশে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠল, জীবনের সর্বস্ব পণ করতেও যার বিন্দুমাত্র দ্বিধা জাগল না, সেই রজনীর প্রিয়তম জন এমনই অবিকশিত! নারীর চিত্ত যে পুরুষকে কেন্দ্র করে জেগেছে, সেই পুরুষকে

যে প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতেই হবে, এমন কথা আমরা বলি না। শচীন্দ্র রজনীর প্রেম প্রত্যাখ্যান করতে পারত। আমাদের আপত্তি শচীন্দ্রের নিষ্ক্রিয়তায়, যার জন্য শচীন্দ্র সম্পর্কে পাঠকের কোনো কৌতূহলই জাগে না। লবঙ্গলতা সম্পর্কে রজনীর বক্তব্যে আমরা তবুও কিছু সংবাদ পাই। শচীন্দ্র সম্পর্কে সে নিজেই তেমন পরিচিতি প্রদান করেনি। শচীন্দ্রের নিজস্ব কোনো ভূমিকা বা ব্যক্তিত্ব নেই, যার দ্বারা চরিত্রটি চালিত হতে পারে। তাই তার আচার-আচরণে অনুভূতির গভীরতা নেই, দ্বন্দ্বের তীব্রতা নেই, আছে শুধু কাহিনীকে এগিয়ে দেবার জন্য কতকগুলি ঘটনার বিবৃতি। অথচ শচীন্দ্র যদি ব্যক্তিত্ববান সক্রিয় পুরুষ হ'ত, তাহলে অমরনাথ, রজনী ও শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে প্রেমের চিরন্তন ত্রিভুজ দ্বন্দ্ব আমরা লক্ষ্য করতাম। এ দেখে মনে হয়, বঙ্কিমচন্দ্র রমণীর প্রেমের মহিমাকে চিত্রিত করবার জন্য শচীন্দ্রের প্রতি তেমন গুরুত্ব দেননি। তাছাড়া অমরনাথ চরিত্রকে কেন্দ্র করে বঙ্কিম-মানসের প্রেমতত্ত্বের স্বরূপ প্রকাশ পেয়েছে, যার ভিত্তি রূপ এবং রূপজাত মোহ।

শেষদিকে গল্পের চাপে অলৌকিক প্রভাবে ও নিছক সম্পত্তি রক্ষা করার বাসনায় শচীন্দ্র যেন রজনীর প্রতি অনুরক্ত হ'য়ে পড়েছে। এর দ্বারা শচীন্দ্রের প্রেমের মহিমাও লাঞ্ছিত। যেখানে প্রেম স্বাভাবিক পথে বিকশিত হয়ে ওঠে না, অন্তরের আকর্ষণ মনস্তাত্ত্বিক ভঙ্গীতে প্রকাশ পায় না, বাইরের ঘটনাগত চাপে যে প্রেমের উদ্ভব তা আর যাই হোক, স্বাভাবিকও নয়, মহৎও নয়। এই স্বার্থমগ্ন প্রেম প্রেমের ব্যভিচার।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রনাথ তার বক্তব্য শুধু করেছে—"এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে। রজনীর জীবনচরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।" শচীন্দ্র যখন রজনীর বিবাহের উদ্যোগ-আয়োজনে ব্যস্ত, তখন খবর পাওয়া গেল রজনী পালিয়ে গেছে, তার কোনো সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। শোনা গিয়েছিল যে, রজনী হীরালালের সঙ্গেই পালিয়ে গেছে। কিন্তু হীরালাল কোনো কথা স্বীকার করতে চাইল না। শেষে শচীন্দ্র রজনীর সন্ধানের আশায় অর্থপুরস্কারের কথা ঘোষণা করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিল। কিন্তু তাতেও কোনো ফল ফলল না।

এই পরিচ্ছদে শচীন্দ্র রজনীর রূপ সম্পর্কে যে সচেতন, তা স্পষ্টভাবে স্বীকার করেছে। কারণ সে বলেছে "রজনী পরমাসুন্দরী। কানা হউক, এমন লোক নাই যে তাহার রূপে মুগ্ধ হইবে না।" রজনী সম্পর্কে শচীন্দ্র-চিত্তের আনুকূল্য এখানে প্রকাশ পেয়েছে। যখন সে শুনেছে যে রজনী ভ্রষ্টা, সে কিছুতেই এই সংবাদকে সত্য

বলে মেনে নিতে চায়নি। তাছাড়া, রজনী যে অন্যের প্রতি প্রণয়াসক্ত হতে পারে এই প্রশ্ন তুলে শচীন্দ্র নিজেই তা খণ্ডন করেছে—"যে অন্ধ সে কি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে? মনে করিলাম কদাচ নহে।" এরপরেই সে নিজেকে গণ্ডমূর্খ ব'লে স্বীকার করেছে। কেননা অন্ধের রূপোন্মত্ততা সে যুক্তি দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে পারছে না। এই ইঙ্গিতটুকুর দ্বারা শচীন্দ্র কাহিনীর পরবর্তী অংশ সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছে। অন্ধ রজনী যে শচীন্দ্রের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল, সেই সত্য শচীন্দ্র জেনেছে বলেই নিজেকে গণ্ডমূর্খ বলে ভর্ৎসনা করেছে। নিজের সম্পর্কে এই ধিক্কারের মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রের মধ্যে রজনী সম্পর্কে একটি মমত্ববোধ জাগিয়ে তুলেছেন—যা পরিণতিতে প্রেমের আকার ধারণ করবে।

"এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে" এইভাবে ভূমিকা করা বঙ্কিমচন্দ্রের আঙ্গিকগত দুর্বলতা। কেননা এই শ্রেণীর উপন্যাসে বিভিন্ন পাত্র-পাত্রী তাঁদের মানসিকতা নিয়ে কাহিনী বিবৃত করেন। পাত্র-পাত্রীরা সকলে একত্র বসে উপন্যাসের কোন্ কোন্ অংশ কে কে লিখবে, পরামর্শ করে বারোয়ারী উপন্যাসের মত কাহিনী বিবৃত করতে বসে না।

"যে অন্ধ, সেকি প্রণয়াসক্ত হইতে পারে?"—অন্ধ নারীর হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব কি করে সম্ভব হয়, শচীন্দ্র প্রথমে তা ধারণা করতে পারেনি। তবে পরমুহূর্তেই সে নিজেকে নির্বোধ বলে বর্ণনা করেছে।

"ফরিয়াদ"—অভিযোগ।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

এখানে রজনী সম্পর্কে শচীন্দ্রের মনোভাব ধীরে ধীরে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করে তুলেছেন। রজনী সম্পর্কে শচীন্দ্রের রূপমুগ্ধতা এখানে প্রকাশ পেয়েছে।

শচীন্দ্র বলেছে—"রজনী জন্মান্ধ। কিন্তু তাহার চক্ষু দেখিলে অন্ধ বলিয়া বোধ হয় না।...চক্ষু বৃহৎ, সুনীল, ভ্রমর-কৃষ্ণ-তারা বিশিষ্ট। অতি সুন্দর চক্ষু কিন্তু কটাক্ষ নাই। রজনী সর্বাঙ্গসুন্দরী, বর্ণ উদ্ভেদ প্রমুখ নিতান্ত নবীন কদলীপত্রের ন্যায় গৌর; গঠন বর্ষাজলপূর্ণ তরঙ্গিণীর ন্যায় সম্পূর্ণতাপ্রাপ্ত, মুখকান্তি গম্ভীর; গতি, অঙ্গভঙ্গীসকল মৃদু, স্থির এবং অন্ধতাবশতঃ সর্বদা সঙ্কোচজ্ঞাপক; হাস্য দুঃখময়। সচরাচর এই স্থির প্রকৃতি সুন্দর শরীরে সেই কটাক্ষহীন দৃষ্টি দেখিয়া, কোন ভাস্কর্যপটু শিল্পকরের যত্ন-নির্মিত প্রস্তরময়ী স্ত্রী-মূর্তি বলিয়া বোধ হইত।" রজনীকে দেখে শচীন্দ্র রূপমুগ্ধতায় পাগল হয়ে ওঠেনি। বলেছে সে "এ সৌন্দর্য অনিন্দনীয় হইলেও মুগ্ধকর নহে।...

যাহাকে পঞ্চবাণ বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোনো সম্বন্ধ নাই।" আবার পরমুহূর্তেই শচীন্দ্র এ সম্পর্কে সংশয় প্রকাশ ক'রে বলেছে "নাই কি" ? রজনীর অন্ধতা নিয়ে এবং তার বিবাহোত্তর জীবন সম্পর্কে শচীন্দ্রের নানা আশংকা এবং দরদ লক্ষণীয়। তবে সমস্ত কিছু অনিচ্ছার অন্তরালে প্রচ্ছন্ন একটি সত্য বারবার উঁকি দিয়েছে ; তা হচ্ছে রজনী সম্পর্কে সুপ্ত দুর্বলতা, যার মূল ভিত্তি রজনীর রূপ এবং তজ্জনিত মোহ। কারণ শচীন্দ্র বলেছে, রজনী সুন্দরী হইলেও অন্ধ।···আমি যাহাকে বিবাহ করিব, সে রজনীর মত সুন্দরী হইবে অথচ বিদ্যুৎকটাক্ষবর্ষিণী হইবে।" এই ব'লে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে শচীন্দ্র নিজের মনোমত পাত্রী সম্পর্কে দীর্ঘ বর্ণনা দিয়ে নিজেকেই নিজে ব্যঙ্গ করেছে। সে বর্ণনা কৌতুকাবহ সন্দেহ নেই, কিন্তু শচীন্দ্রের অনিচ্ছার অন্তরালে আবৃত সত্যকে তা বারবার প্রকাশ করে ফেলেছে।

"পঞ্চবাণ"—প্রেমের দেবতা কামদেব বা কন্দর্পের পাঁচটি বাণ। যথা,—সম্মোহন, উন্মাদন, শোষণ, তাপন ও স্তম্ভন।

"যাহাকে স্বয়ং···ইচ্ছা করে"—রজনীর প্রতি প্রচ্ছন্ন প্রেমের ইঙ্গিত এখানে প্রকাশিত। কিন্তু নিজের যে ইচ্ছা সম্পর্কে শচীন্দ্র নিজেও স্পষ্টভাবে সচেতন নয়। তাই রজনীকে বিবাহ করার ইচ্ছা আছে কিনা সে সম্পর্কে সচেতনভাবে আপত্তি জানালেও অবচেতন মনের অন্তরালে রজনী সম্পর্কে মমত্ব দুর্বলতারই রকমফের। কারণ রজনীর রূপের দীর্ঘ বন্দনা শচীন্দ্রের রূপমুগ্ধতারই প্রকাশ। এবং পাছে এই সত্য প্রকাশ হয়ে পড়ে, সেইজন্যই বোধ করি শচীন্দ্রের এই প্রতিবাদ। তাই বোধ করি গোপালের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্য তার ব্যস্ততা। এই ব্যস্ততার কারণ সম্পর্কে শচীন্দ্র ঠিক জানি না বললেও, ছোটমার দৌরাত্ম্যের দোহাই দিলেও তার মানসিক প্রবণতাকে গোপন রাখতে পারেনি। তাই সত্য গোপন করার জন্য বারবার সে তারস্বরে বলেছে রজনীকে, বিবাহ করার ইচ্ছে নেই। এ যেন কথায় বলে "চোরের মার বড় গলা।"

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

অবশেষে রজনীর সন্ধান পাওয়া গেল এবং রজনী কলকাতায় ফিরে এল। অমরনাথ একদিন এসে শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন। তার আগে শচীন্দ্র রাজচন্দ্র বা তার স্ত্রীর কাছ থেকে কোনো ভাবেই রজনীর অজ্ঞাতবাসের স্থান বা কারণ সম্পর্কে অনেক চেষ্টা করেও কোনো সন্ধান জানতে পেলো না। রজনী ত বটেই, এমনকি রাজচন্দ্র ও তার স্ত্রী পর্যন্ত শচীন্দ্রের বাড়ীতে আসা বন্ধ ক'রে দিলেন এবং পুরনো বাস ত্যাগ করে

অন্যত্র উঠে চলে গেলেন। নতুন বসবাসের ঠিকানাও অজ্ঞাত রয়ে গেল। শচীন্দ্র অমরনাথের মুখে জানতে পেল যে, রাজচন্দ্র রজনীর পিতা নয়, মেসোমশায় এবং মনোহর দাসের ভাইঝি।

অমরনাথ যখন শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এলেন, তাঁর পাণ্ডিত্য এবং বাক্‌পটুতায় শচীন্দ্র মুগ্ধ হল। তাঁর মার্জিত ভঙ্গীতে কথাবার্তা. পাশ্চাত্য এবং দেশীয় সাহিত্যের, ইতিহাস ও দর্শনের বিভিন্ন বিষয়ে নানা আলোচনা ক'রে অমরনাথ শচীন্দ্রকে সহজেই অভিভূত ক'রে দিলেন। অনেক কথা আলোচনার পর চলে যাবার মুখে অমরনাথ শচীন্দ্রকে জানিয়ে গেলেন যে, শচীন্দ্ররা যে সম্পত্তি ভোগ করছে, তার প্রকৃত মালিক রজনী। একথা শুনে শচীন্দ্র ভাবল, কোনো এক জুয়াচোরের হাতে পড়েছে। শচীন্দ্র কিছু মার্জিত ভঙ্গীতে অমরনাথকে চলে যেতে বলল। যাবার আগে অমরনাথ জানিয়ে গেলেন যে, তাঁর কথা বিশ্বাস না হলে উকিল মারফতে এই খবরের সত্যতা যাচাই হবে।

এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রনাথ এবং অমরনাথের সাক্ষাৎকারের মধ্য দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথ-চরিত্রের প্রাধান্য অবিসংবাদিতরূপে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। অমরনাথের পাণ্ডিত্য, বাক্‌পটুতা, মার্জিত বুদ্ধি, সূক্ষ্ম রসবোধ ইত্যাদির পরিচয় দিয়ে শচীন্দ্রের মনের ওপরে যে প্রভাব বিস্তার করেছেন, এই পরিবেশ সৃষ্টি করার ফলে অমরনাথের মুখে শচীন্দ্র নিজেদের ভাগ্যবিপর্যয়ের কথা শুনেও অমার্জিত হতে পারেনি। রজনীকে অবলম্বন ক'রে এই দুটি পুরুষ চরিত্র যে সংঘর্ষের সম্মুখীন তার প্রথম দফায় (First round-এ) অমরনাথের জয় সূচিত হয়েছে। রজনীর সংবাদ সংগ্রহের জন্য শচীন্দ্রের যে আগ্রহ ও ব্যাকুলতা, নানা সূত্র থেকে সেই সংবাদ সংগ্রহে তার ব্যর্থতা বিবৃত হওয়ার পরেও অপরিচিত অমরনাথের মুখে রজনী সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য শুনে শচীন্দ্র-চিত্তের যে প্রতিক্রিয়া, তা বেশ নাটকীয় ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। এই দুই প্রধান পুরুষ চরিত্রের সাক্ষাৎকার বর্ণনা ও পটভূমিকা রচনায় বঙ্কিমচন্দ্র মুন্সীয়ানার পরিচয় দিয়েছেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

Executor বিষ্ণুরামবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ ক'রে শচীন্দ্র জানতে পারল সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী রজনী। এই সংক্রান্ত নানান দলিল-দস্তাবেজ, প্রমাণপত্র ইত্যাদি নানা খুঁটিনাটি বিষয় পর্যালোচনা ক'রে শচীন্দ্রের মনে সংশয় রইল না যে, রজনী হরেকৃষ্ণ দাসের কন্যা এবং মনোহর দাসের ভ্রাতুষ্পুত্রী। শচীন্দ্র নিঃসংশয়রূপে

বুঝল, যে সম্পত্তি সে এতকাল ধরে ভোগ করেছে, তার মালিক রজনী। শচীন্দ্র রজনীকে বিষয়-সম্পত্তি ছেড়ে দিল, কিন্তু সম্পত্তির দখল নিতে রজনী এগিয়ে এল না।

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র আইন-সংক্রান্ত নানা খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন। আইনজ্ঞ হিসেবে বঙ্কিমচন্দ্র এই পরিচ্ছেদে অত্যন্ত কৃতিত্বের সঙ্গে রজনীর সম্পত্তির উদ্ধার এবং তা বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন। বিষ্ণুরামবাবুর মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ দাস, মনোহর দাস ও রাজচন্দ্র দাসের জটিল আবর্তের মধ্যে রজনী সম্পর্কে নিঃসংশয় হওয়া এবং দীর্ঘদিনের ব্যবধানে তার সম্পত্তি উদ্ধারের সূচনা করে বঙ্কিমচন্দ্র কাহিনীতে নতুন গতিবেগ সঞ্চার করেছেন এবং কাহিনী নতুন বাঁক নিয়েছে। অমরনাথের দ্বারা যে রহস্যের আবরণ উন্মোচনের সূচনা, এই পরিচ্ছেদে সেই রহস্য নাটকীয় কৌতূহল নিয়ে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। শচীন্দ্রের ভাগ্যবিপর্যয় ও রজনীর ভাগ্য উদয় এমন নাটকীয়ভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে, যার ফলে শচীন্দ্র, রজনীর ভাগ্যের সূত্র একই সঙ্গে গ্রথিত হয়ে কাহিনীকে পরিণতির মুখে নিয়ে গেছে এবং অমরনাথ স্বয়ং ভাগ্য-বিধাতার মত যেন এদের ভাগ্য পরিবর্তনের সূচনা করেছে। সেদিক থেকে এই পরিচ্ছেদটি উপন্যাসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

এইরকম নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে একদিন রাজচন্দ্র দাস শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করতে এল। তার মুখে শোনা গেল সে সিমলায় একটা বাড়ী কিনে সেখানে রজনীকে নিয়ে বাস করছে। শচীন্দ্র রাজচন্দ্রকে নানা প্রশ্ন ক'রে জানতে পারল যে, শচীন্দ্রের পিতা রামসদয় রাজচন্দ্রকে অনুসন্ধান করে তার সন্ধান পেয়ে তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। উদ্দেশ্য শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহের সম্বন্ধ করা। রাজচন্দ্রকে নানাভাবে জেরা করে শচীন্দ্র এই সংবাদ সংগ্রহ করল। রাজচন্দ্র রজনীর জন্যে পাত্রের সন্ধান করছে জানতে পেরে শচীন্দ্র ব্যঙ্গের ভঙ্গীতে বলল, অমরনাথই তো উপযুক্ত পাত্র; কারণ সে রজনীকে এত সম্পত্তি পাইয়ে দিয়েছে। শেষে যখন শচীন্দ্র শুনল যে, তার পিতার ইচ্ছা রজনীর সঙ্গেই তার বিবাহ হোক, তখন সে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'ল। পিতা রামসদয়ের কাছে উপস্থিত হয়ে সে এই কথাই শুনল, মাতার কাছেও একই কথা শুনল; শেষ অবলম্বন, ছোটমা লবঙ্গলতার কাছে পরিত্রাণের আশায় গিয়ে বিফল হ'ল। সবাইয়ের বাসনা শচীন্দ্র রজনীকে বিবাহ ক'রে ঘরের সম্পত্তি ঘরেই রেখে দারিদ্র্যের হাত থেকে তাদের বাঁচাক। শচীন্দ্র কিন্তু কিছুতেই এই অন্ধ নারীকে বিবাহ করতে রাজী হ'ল না। লবঙ্গলতাও কিন্তু

প্রতিজ্ঞা করল, রজনীর সঙ্গেই শচীন্দ্রের বিবাহ দেবে। শচীন্দ্রের আপত্তির প্রধান কারণ, যাকে সে অন্ধ বলে কৃপা করতে চেয়েছে, দরিদ্র বলে ঘৃণা করেছে, এখন অর্থের লোভে তাকে কিভাবে বিবাহ করে?

এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্র-চরিত্র তার পৌরুষ ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেছে। এর আগে পর্যন্ত শচীন্দ্র ব্যক্তিত্বহীন নিষ্প্রভ চরিত্ররূপে আমাদের কাছে প্রতিভাত হয়েছিল। কিন্তু এখানে সমগ্র পরিবারের বিরুদ্ধে শচীন্দ্র এককভাবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। শচীন্দ্রের সমগ্র পরিবারের এই আকস্মিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচবার আকুলতা ও অসহায়তা এই পরিচ্ছেদের বর্ণনার মধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যে রজনী এই পরিবারের কৃপার পাত্রী ছিল, আজ সেই রজনীরই কৃপা লাভ করলে এই পরিবারটি বাঁচবে। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস! অমরনাথের নির্দেশে রজনীকে নিয়ে রাজচন্দ্রের আত্মগোপন এবং অবশেষে আত্মপ্রকাশ কাহিনী নিয়ন্ত্রণে অমরনাথের গুরুত্বকে আর একবার সপ্রমাণ করল। অমরনাথ সম্পর্কে শচীন্দ্রের পরাজিত মানসিকতা এবং তার প্রত্যাঘাতের অক্ষমতা শচীন্দ্রকে তার সম্পর্কে একটু কঠোর করে তুলেছে। সেই সঙ্গে সে ক্ষুব্ধ—অন্ধ পুষ্পনারী রজনী সম্পর্কেও। ছোটমা লবঙ্গলতার কাছেও সে যুক্তিতে দাঁড়াতে পারেনি। শচীন্দ্র-চরিত্রের সক্রিয়তা যে সামান্য অংশ জুড়ে আছে উপন্যাসে, এই পরিচ্ছেদটি সেদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য।

"শুনিয়া আকাশ হইতে পড়িলাম"—শচীন্দ্র কখনও ভাবতে পারেনি যে, রজনীকে সে বিবাহ করতে পারে। কারণ সচেতন মনে রজনী সম্পর্কে যতখানি দাক্ষিণ্য ছিল, ততখানি আকর্ষণ ছিল না। অবচেতন মনে রজনীর প্রতি তার মমত্বের কথা শচীন্দ্রের সচেতন মন স্বীকার করবে কি করে? তাই সে বিস্মিত হ'ল যখন জানতে পারল যে, তার পিতা টাকার লোভে তাকে বেচে দিতেও প্রস্তুত।

"হাড় জ্বলিয়া গেল"—শচীন্দ্রের পৌরুষে ও ব্যক্তিত্বে যেন আঘাত লাগল। কেননা নিজেকে পণ্য সামগ্রীর মত বিক্রয় করবার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে সে ক্ষুব্ধ হ'ল। এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রের ব্যঙ্গনিপুণ বাক্‌পটুতা ও প্রগতিবাদী মানসিকতা ও কিছুটা দৃঢ়তা তার সম্পর্কে আমাদের পূর্বধারণা খানিকটা পাল্টে দেয়।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রের মানসিক প্রবণতা রজনীর অভিমুখে আনবার জন্য অলৌকিকতার সাহায্য নিয়েছেন। এই অলৌকিক বা দৈব শক্তির সহযোগিতায়

বঙ্কিমচন্দ্র শচীন্দ্রের রজনীমুখী মন গড়ে তুলেছেন। এই ধরনের পটভূমিকা রচনা কতখানি মনস্তত্ত্বসম্মত, সে সম্পর্কে একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যায়। বঙ্কিমসাহিত্যে সন্ন্যাসীর ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এ সম্পর্কে আমরা ভূমিকাতেই আলোচনা করেছি। এখানে কথক শচীন্দ্র নিজে এই সন্ন্যাসী সম্পর্কে বর্ণনা করেছে। এই পরিচ্ছেদের গোড়ায় সন্ন্যাসী সম্পর্কে শচীন্দ্র দীর্ঘ বর্ণনা দিয়েছে। শুধু তাই নয়, সন্ন্যাসী সম্পর্কে শচীন্দ্রের কোনোরকম দুর্বলতা নেই। সন্ন্যাসীর এ সংসারে আধিপত্য একমাত্র রামসদয়ের প্রশ্রয়ের জন্য। কিন্তু সন্ন্যাসীর সঙ্গে শচীন্দ্রের সংলাপের মধ্য দিয়ে সন্ন্যাসীর দার্শনিকতা, আধ্যাত্মিক চেতনার উপলব্ধি প্রকাশ পেয়েছে। এবং শচীন্দ্রের সঙ্গে দীর্ঘ কথাবার্তায় ও নানা যুক্তিতর্কের অবতারণার মধ্য দিয়ে শচীন্দ্র সন্ন্যাসীর কাছে পরাজয় স্বীকার করেছে। শেষ পর্যন্ত শচীন্দ্র সন্ন্যাসী সম্পর্কে শ্রদ্ধাবান্ হয়ে উঠেছে। এই শ্রদ্ধাপূর্ণ মানসিকতা নিয়েই বঙ্কিমচন্দ্র সন্ন্যাসী সম্পর্কে শচীন্দ্রের মনের পরিবর্তন ঘটিয়ে তাঁর অলৌকিক শক্তি যাতে সহজেই শচীন্দ্র গ্রহণ করে, সেই পটভূমিকা রচনা করেছেন। কথাপ্রসঙ্গে সন্ন্যাসী যখন জানিয়েছেন, রামসদয় শচীন্দ্রের বিবাহে প্রবৃত্তি আনবার জন্য সন্ন্যাসীর সাহায্য চেয়েছেন, তার উত্তরে শচীন্দ্র জানিয়েছে, বিবাহে তার আপত্তি নেই, কিন্তু এমন কন্যা সে চায় যে তাকে চিরকাল ভালবাসবে। এই দুর্বলতার ক্ষেত্রকে কেন্দ্র করেই সন্ন্যাসী অলৌকিক শক্তির প্রকাশ ঘটালেন। এবং সেই অলৌকিক শক্তির প্রভাবে শচীন্দ্র জানতে পারল, রজনী তার প্রতি অনুরক্ত এবং পৃথিবীতে রজনীর চেয়ে কেউ তাকে বেশী ভালবাসে না। এই সন্ন্যাসীর প্রভাবে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের সুপ্ত অনুরাগ অকস্মাৎ যেন প্রকাশ হয়ে পড়ল।

রজনীর প্রকাশবিমুখ সলজ্জ প্রেমের প্রকাশ স্বভাবতঃই আত্মপ্রচার করেনি। ফলে এই প্রকাশকুণ্ঠ প্রেমের মহিমাকে প্রকাশ করতে গিয়ে অলৌকিকতার সাহায্য নিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র অত্যন্ত সুলভে তার সমাধান করেছেন। প্রেমের যে মহিমময় শক্তি, যা আপন গৌরবে প্রকাশ পেয়ে প্রেমিক-প্রেমিকাকেও মহিমান্বিত করে তোলে, এই সুলভ সমাধানের ফলে তা অনেক পরিমাণে ক্ষুণ্ণ। শচীন্দ্রকে অলৌকিক শক্তির সাহায্যে রজনীমুখী করে তোলার ফলে রজনীর প্রেমের মর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করা হয়েছে। শচীন্দ্রের মত বুদ্ধিমান ব্যক্তি রজনীর আচার-আচরণের মধ্য দিয়ে যদি তার প্রেমিকা সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারতেন, তাহলেই তা তা স্বাভাবিক হতো। 'যে রজনী সম্পর্কে শচীন্দ্র বলল "এক কানা কন্যা আছে, তাহাকে বিবাহ করিব না।" সেই কানা কন্যা সম্পর্কে তার চিত্তের জাগরণ অসঙ্গত মনে হতে পারে।

তবে আমরা আগেই বলেছি, শচীন্দ্রের সচেতন মনে রজনী সম্পর্কে যতখানি বিরূপতা ছিল, তার অবচেতন মন ততখানি রজনী-বিমুখ ছিল না। ব্যবহারিক জীবনের অতৃপ্তি, সচেতন মনের নানা বিরূপতা নিদ্রার সময় যখন চাপা পড়ে, সেই সময় অবচেতন মনের সক্রিয়তা শুরু হয়। তাই শচীন্দ্রের স্বপ্ন দর্শন আসলে শচীন্দ্রের অবচেতন মনের বহিঃপ্রকাশ। অবচেতন মনে রজনী সম্পর্কে যে মমত্ববোধ ছিল, সেই মমত্ববোধই অবচেতন মন থেকে যখন স্বপ্নে প্রকাশ পেল, তখন রজনীর প্রেমিকা সত্তার স্বরূপ আবিষ্কারে শচীন্দ্র অভিভূত হয়ে পড়ল। তাই সচেতন মনে যে শচীন্দ্র রজনীকে অস্বীকার করতে চেয়েছে বারেবারে তার জীবনে, সন্ন্যাসীর অলৌকিকত্বের সাহায্যে শচীন্দ্রের অবচেতন মনের পর্দায় প্রেমিকা রজনী স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়ে শচীন্দ্রের সচেতন মনের বিরূপতাকে পরাভূত করে সত্যের প্রতিষ্ঠা করেছে। এই সচেতন ও অবচেতন মনের যে দ্বন্দ্ব তা যেন সন্ন্যাসীর অলৌকিকত্বের সাহায্যে বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশ করেছেন। কারণ সন্ন্যাসীর কথাবার্তায় আত্মা মন ও মনের ক্রিয়া (Function of the Brain) ইত্যাদি নানা মন্তব্য এই সত্যকেই সপ্রমাণ করে।

"**দণ্ডী**"—দণ্ডধারী ব্রহ্মচারী।

"**অবধূত**"—জটাশ্মশ্রুধারী শৈব সন্ন্যাসী।

"**নলচালা**"—চোর ধরবার বা চুরির মাল বের করবার জন্য নল বা কঞ্চি মন্ত্রপুত ক'রে গুপ্তবস্তুর কাছে পাঠানো।

তৃতীয় খণ্ডে শচীন্দ্র-রজনীর সম্পর্ক অলৌকিক প্রভাবেই হোক বা যেভাবেই হোক, যেভাবে বঙ্কিমচন্দ্র চিত্রিত করেছেন, তাতে কাহিনীর গতি ও পরিণতি কোন্ দিকে এগিয়ে চলেছে, তা পাঠকদের কাছে অস্পষ্ট নেই। শচীন্দ্র নিজের পরিবারকে আর্থিক বিপর্যয়ের হাত থেকে বাঁচাবার জন্য রজনীকে বরণ করে নিয়েছে। এই অনিচ্ছাকৃত বরণের মধ্যে তবুও চরিত্রের একটা মহিমা প্রকাশ পেতো। কিন্তু তার ওপর অলৌকিকত্ব আরোপ করে শচীন্দ্র-চরিত্র থেকে সেটুকু মহিমাও বঙ্কিমচন্দ্র কেড়ে নিয়েছেন।

———

চতুর্থ খণ্ড

এই খণ্ডের বক্তা একাধিক চরিত্র। এই খণ্ডটি সাতটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। এখানে বঙ্কিমচন্দ্র উল্লেখ করেছেন 'সকলের কথা' বলে। প্রথম পরিচ্ছেদ থেকে সপ্তম পরিচ্ছেদ পর্যন্ত কথক যথাক্রমে লবঙ্গলতা, অমরনাথ, লবঙ্গলতা, লবঙ্গলতা, শচীন্দ্রনাথ, শচীন্দ্রনাথ ও লবঙ্গলতা। অর্থাৎ চারটি পরিচ্ছেদের কথক লবঙ্গলতা, দুটি পরিচ্ছেদের কথক শচীন্দ্রনাথ ও একটি পরিচ্ছেদের কথক অমরনাথ। অবশ্য অমরনাথ-লবঙ্গলতার সম্পূর্ণ রহস্য এই খণ্ডে উদ্‌ঘাটিত এবং শচীন্দ্রের আচরণ উপন্যাসের পরিণতি সম্পর্কে আমাদের পূর্ব ধারণাকে আরো স্পষ্ট ক'রে তোলে। বিভিন্ন বক্তার বিবৃতির মধ্য দিয়ে এই খণ্ডে কাহিনী দ্রুত পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে।

রজনীর মায়ের সঙ্গে লবঙ্গলতার সাক্ষাৎকার হয়। লবঙ্গ গোড়ায় ভেবেছিল যে, খুব সহজে রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দিয়ে তার প্রতিজ্ঞা পূরণ করবে। কিন্তু এখন লবঙ্গ জানল যে, অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করতে চায়। লবঙ্গ অমরনাথের বিবাহ করাকে তার সঙ্গে বিরোধিতা বলে মনে করল। এবং সকলের চোখে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করার চেষ্টা বলে ব্যাখ্যা করল। অমরনাথকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য লবঙ্গ নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণে আরো বেশী তৎপর হয়ে উঠল। অবশ্য লবঙ্গ এটাও শুনল যে, রজনীরও ইচ্ছা অমরনাথকে বিবাহ করা। কারণ অমরনাথ থেকেই তার ভাগ্যের এই পরিবর্তন। লবঙ্গ স্থির করল রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে, এ বিষয়ে একটা মীমাংসা করতে হবে। রজনী সম্পত্তির দখল নিচ্ছে না কেন, সে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার জন্য অমরনাথ রজনীর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। সেখানে লবঙ্গলতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ ঘটল। রজনী অমরনাথকে জানাল যে, তার সমস্ত সম্পত্তি লবঙ্গলতাকে দান করে দিচ্ছে। অমরনাথ সুখী হলেন, কিন্তু লবঙ্গলতা এতে বিস্মিত হল। রজনী অশ্রুভারাক্রান্ত চিত্তে শচীন্দ্রের প্রতি তার অনুরাগের কথা লবঙ্গলতাকে জানাল। কিন্তু তার চিত্ত আজ দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত। কারণ অমরনাথের প্রতিও তার একটা আকর্ষণ রয়েছে। অমরনাথ শুধু যে তার সম্পত্তি উদ্ধার করে দিয়েছেন, তাই নয়, নিজের জীবন বিপন্ন করেও তিনি রজনীকে বাঁচিয়েছেন। সুতরাং অমরনাথ যদি অনুগ্রহ করে রজনীকে বিবাহ করতে রাজী হন, তাহলে রজনী আর কাউকে বিবাহ করতে পারবে না।

লবঙ্গলতা অমরনাথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে রজনীকে বিবাহ করতে নিষেধ করল এবং

অমরনাথকে হুমকি দিল যে, অমরনাথ যদি লবঙ্গের কথা না শোনে, তবে লবঙ্গ বাধ্য হবে অমরনাথের যৌবনের কুকীর্তির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ কবে দিতে। উত্তরে অমরনাথ জানালেন, তিনি নিজেই রজনীকে সমস্ত কথা খুলে বলবেন। এদিকে শচীন্দ্রের মানসিক বিকার ও রজনী সম্পর্কে তীব্র আসক্তি ক্রমে বেড়েই চলল। সে দিবারাত্র বিকারের ঝোঁকে রজনীর নাম উচ্চারণ করে ও শূন্য দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে। এই অবস্থায় পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী আবার দেখা দিলেন এবং শচীন্দ্রকে সুস্থ করে তোলার ভার নিলেন।

এই খণ্ডে অমরনাথ ও লবঙ্গকে কেন্দ্র করে যে একটি অকথিত কাহিনী ছিল, সেই অজ্ঞাত রহস্য এখানে লেখক উদ্‌ঘাটিত করেছেন। লবঙ্গ-অমরনাথকে কেন্দ্র ক'রে তাদের পূর্বপরিচিতি কিভাবে ঘটেছিল এবং কেনই বা সেই পরিচয় মিলনের মধ্যে সার্থকতা লাভ করল না, সেই কৌতূহল এই খণ্ডে নিবৃত্ত হয়। অমরনাথ-চরিত্রের ঔদার্য, চিত্তের দৃঢ়তা, নিজের জীবন সম্পর্কে অনাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী, এই খণ্ডে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে লবঙ্গলতা-চরিত্রের একরোখাভাব, নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য অমরনাথকে কলঙ্কিত করতেও পিছপা নয়। প্রকাশ্যভাবে তাঁকে অপদস্থ করার ভয় দেখিয়ে লবঙ্গলতা স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। এ ধরনের Blackmailing করার মনোভাব লবঙ্গলতা-চরিত্রের সমস্ত মহিমাকে ম্লান করে দিয়েছে। রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহের উদ্যোগ করার পশ্চাতে লবঙ্গলতার অন্ধ যুবতীর প্রতি যত না দরদ প্রকাশ পেয়েছে, তার অন্তরালে লবঙ্গলতার সম্পত্তি রক্ষা তথা আত্মরক্ষার প্রবণতাই অনেক বেশী প্রকট হয়ে উঠেছে। রজনী ও শচীন্দ্রের হিতৈষিণীর ছদ্মবেশে লবঙ্গলতা নিজের স্বার্থকেই চরিতার্থ করতে চেয়েছে। ফলে, সেই স্বার্থ চরিতার্থতার পথে সামান্যমাত্র বাধার আশঙ্কা তাকে অমরনাথের প্রতি এত নিদারুণ হয়ে উঠতে অনুপ্রাণিত করেছে। অন্যদিকে অমরনাথ লবঙ্গলতা সম্পর্কে এমনই নির্মমভাবে উদাসীন ও নিজের প্রতি মমত্ব সম্পর্কে উদাসীন হওয়ার কারণ যে লবঙ্গলতা তার সম্পর্কে অমরনাথের দৃষ্টি ঈষৎ তিক্ত ও কিছুটা তির্যক মানসিকতা নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে। লবঙ্গলতার অমরনাথকে অপদস্থ করার পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করে যে উত্তেজনা তাকে সম্পূর্ণ নির্বাপিত করে দিয়েছে অমরনাথের শীতল, প্রতিক্রিয়াহীন স্বীকৃতি। তিনি নিজেই সমস্ত রহস্য রজনীর কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়ে লবঙ্গলতার এই মানসিকতাকে চরম আঘাত দিয়েছেন। এইভাবে লবঙ্গলতার স্বার্থপরতা ও চিত্তের সংকীর্ণতা অমরনাথের ঔদার্যের কাছে পরাভব স্বীকার করেছে। তাঁর প্রেমের ব্যর্থতার মূলে যে লবঙ্গলতা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে চরম শাস্তি দিয়েছিল, আজ তাঁর চরিত্রের মহনীয়তার মাধ্যমে তিনি যেন তার

উপযুক্ত জবাব দিলেন। অমরনাথের ঔদার্য দিয়ে তিনি লবঙ্গলতার সংকীর্ণতাকে পরাজিত করলেন।

এদিকে রজনী-চরিত্রে যে দ্বিধা-সংকুল, দোলাচল মানসিকতা তা এই খণ্ডে বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। একদিকে শচীন্দ্রের প্রতি তার প্রথম প্রেমের আবেগের তীব্রতা ও আকর্ষণ, অন্যদিকে তার উদ্ধারকারী নবজীবনদানকারী ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক অমরনাথের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা। অমরনাথের বিবাহের প্রস্তাব সে প্রত্যাখ্যান করতে পারছে না, তার কৃতজ্ঞতা থেকে অমরনাথের প্রতি সশ্রদ্ধ আকর্ষণ দেখা দিয়েছে। আবার শচীন্দ্রের প্রতি তার আবেগকেও স্তিমিত করতে পারছে না। এই দোলাচল অবস্থার মধ্যে রজনী-চরিত্র দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়ে শুধু চোখের জল ফেলেছে, কোনো সমাধানে পৌছোতে পারেনি। রজনী-চরিত্রের এই দ্বন্দ্ব, তার প্রতি পাঠকের সহানুভূতিকে সম্পূর্ণরূপে আকর্ষণ করেছে।

অন্যদিকে শচীন্দ্র মানসিক বিকারে আক্রান্ত হয়ে রজনীর প্রতি তীব্র আকর্ষণ বোধ করেছে এবং রজনীকে পাওয়ার মধ্য দিয়েই যে তার এই বিকারের মুক্তি এমন একটা ইংগিত বঙ্কিমচন্দ্র আমাদের দিয়েছেন। রজনীর চিত্ত দ্বন্দ্বে এমনই ক্ষতবিক্ষত যে, সম্পত্তি পুনরুদ্ধারের প্রতি কোনো অগ্রহই সে প্রকাশ করেনি। তাই সম্পত্তি রক্ষার জন্য শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর মিলনের যে আকাঙ্ক্ষা লবঙ্গলতা প্রকাশ করেছিল, সেই সম্পত্তি লবঙ্গলতাকে দান করে রজনী তার প্রেমের মহিমাকেই উজ্জ্বলতর করেছে। প্রেমের এই মহিমাকে উপলব্ধি করার মানসিকতা স্বার্থান্ধ, সম্পত্তিলোভী লবঙ্গলতার ছিল না। তাই সে এই দানে বিস্ময় প্রকাশ করেছে। কিন্তু অমরনাথ প্রেমের মহিমার স্বরূপ জানে বলেই এই সম্পত্তির দানে বিস্মিত না হয়ে সুখী হয়েছে। লবঙ্গলতা যেমন অমরনাথের প্রেমের মহিমাকে লাঞ্ছিত করেছিল, ঠিক তেমনই শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর প্রেমের মহিমাকে যথোচিত গুরুত্ব বা মর্যাদা দেয়নি। অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতায় রজনীর তাঁকে বিবাহ করার প্রস্তাব তাই লবঙ্গলতা সহ্য করতে না পেরে অমরনাথ-চরিত্রের দুর্বলতার পুরাতন ক্ষতকে খুঁচিয়ে স্বার্থসিদ্ধি করতে চেয়েছে। কিন্তু তাতেও অমরনাথকে পরাজিত করতে পারেনি। শচীন্দ্রের মানসিক ব্যাধি থেকে মুক্তির দায়িত্ব নিয়েছেন পূর্বোক্ত সন্ন্যাসী। অর্থাৎ অলৌকিকতার সাহায্যে শচীন্দ্রের বিকার মুক্তি ঘটেছে। রজনীর প্রেম যেমন স্বতস্ফূর্ত, স্বাভাবিক ও মনস্তত্ত্বসম্মত, অমরনাথের ব্যর্থ প্রেমের জ্বালা ও তার পরিণতিতে জীবন সম্পর্কে নিরাসক্ত দৃষ্টিভঙ্গী যেমন আমাদের মুগ্ধ করে, রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রেমবোধের পশ্চাতে প্রেমের সেই অপার মহিমা ও দ্বন্দ্ব নেই। অলৌকিকতার দ্বারা তার মহিমা আচ্ছন্ন। আর

লবঙ্গলতা—প্রেমহীনা নারী। নিজের ব্যক্তিস্বার্থ রক্ষায় ও সম্পত্তি বাঁচাতেই তৎপর। প্রেমের অপার রহস্য ও মহিমা সম্পর্কে লবঙ্গলতা অন্ধ।

প্রথম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদের কথক লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা সন্ন্যাসীর অলৌকিকত্বের সাহায্যে এক রকম নিশ্চিত ছিল যে, শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেবেই। কারণ অলৌকিকত্বে তার বিশ্বাস এতই দৃঢ়। কিন্তু লবঙ্গলতা খবর পেল যে, অমরনাথের সঙ্গে রজনীর বিবাহ প্রায় স্থির। রাজচন্দ্র এবং তাঁর স্ত্রী রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহ দিতে ইচ্ছুক। কিন্তু অমরনাথ নাকি কোনো আপত্তিকে মানতে রাজী নন। রজনীরও নাকি তাতে সমর্থন আছে। অমরনাথের এই ইচ্ছাকে লবঙ্গলতা স্পর্ধা বলে মনে করল। অমরনাথকে সমুচিত শিক্ষা দেবার জন্য লবঙ্গলতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল। "আমি যদি কায়েতের মেয়ে হই, তবে অমরনাথের নিকট হইতে এই রজনীকে কাড়িয়া লইয়া আমার ছেলের সাথে বিবাহ দিব।" অর্থাৎ অমরনাথের দুর্বলতার ছিদ্রপথ ধরে লবঙ্গ তার স্বার্থসিদ্ধি করতে তৎপর হল। তাই সে বলেছে, "অমরনাথ অত্যন্ত ধূর্ত। তাহার সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে বড় সতর্ক হইয়া কাজ করিতে হয়।" প্রকৃত ব্যাপার জানবার জন্য লবঙ্গ রজনীব সঙ্গে দেখা করবে বলে স্থির করল। তাই প্রথমে সে রাজচন্দ্রের স্ত্রীকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু রাজচন্দ্রের স্ত্রীর কাছে অমরনাথের রজনীকে বিবাহ করার সমর্থনে কথা বলতে শুনে লবঙ্গলতা ক্ষণিকের জন্য নিজের ধৈর্য হারিয়ে ফেলে কটু কথা বলে বসল। কিন্তু মালি বউ রাগ প্রকাশ করাতে লবঙ্গলতা মুহূর্তের মধ্যে তার কথা বলার ভঙ্গী পাল্টে ফেলেছে। মালি বউ-এর কাছে সে জেনেছে শচীন্দ্রের সঙ্গে বিবাহে রজনীর মত নেই। তখন রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার জন্য লবঙ্গলতা ব্যগ্রতা প্রকাশ করে এবং রজনীর বাড়িতে গিয়েই সে সক্ষাৎ করতে চেয়েছে।

এই পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতা ছলে-বলে-কৌশলে নিজের স্বার্থসিদ্ধি করতে তৎপর। তাই শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেওয়ার পথে অমরনাথের উপস্থিতি তার কাছে এতই অসহ্য যে, সে অমরনাথকে সর্পিনীর মত দংশন করতে উদ্যত। অবশ্য সম্পত্তি হারিয়ে দারিদ্র্যকে বরণ করার পেছনে একটা ভীতি বা আতঙ্ক তার মনে ছিল তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু তার ছলনার জন্য পাঠকের সমস্ত সহানুভূতি থেকে সে বঞ্চিত। অমরনাথের সততার কোনো মূল্যই তার কাছে না থাকতে পারে, কিন্তু মালি বউ-এর কাছে রজনীর মনোভাব জানার পরও সে রজনীর মত পরিবর্তন করতে চেষ্টার ত্রুটি করেনি। সেজন্য সে রজনীর গৃহে নিজের থেকেই যেতে তৎপর।

এই পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতার কথাবার্তার মধ্যে নারীর কর্তৃত্ব সম্পর্কে যে মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে, তা স্বার্থপরতারই নামান্তর। স্বামী সম্পর্কে তার ধারণা—স্বামী অর্থ উপার্জনের একটি যন্ত্র মাত্র। সাংসারিক যা কিছু করণীয়, তার কর্তৃত্ব করবে নারী। নিজের এই প্রাধান্য বিস্তারের জন্য লবঙ্গ নারীসুলভ নমনীয়তা ও লজ্জা সব সময় বজায় রাখতে পারেনি। তাই অলৌকিক উপায় অবলম্বন করে মন্ত্রৌষধির গুণে সে শচীন্দ্রকে রজনীর প্রতি আকৃষ্ট করে তুলতে চেয়েছে। লবঙ্গলতা নিজে পতিব্রতা বলে অহংকার প্রকাশ করত। সে মনে করত, অর্থের বিনিময়ে বুঝি সবই করা সম্ভব। তাই রাজচন্দ্র ও তার স্ত্রীকে সে ঘটক বিদায়ের জন্য দু-দশ হাজার টাকাও দিতে চেয়েছে। অমরনাথের উপকারের জন্য মালি বউকে তাঁকে টাকা দেবার জন্য বলেছে। কারণ প্রেমের সত্যকার মহিমা লবঙ্গের অজ্ঞাত। এ পরিচ্ছেদে লবঙ্গলতার কথাবার্তার মধ্যে এক সুকৌশলী, মতলববাজ, ছলনাময়ী নারী আমাদের সামনে আত্মপ্রকাশ করেছে।

"উঁহার মন্ত্রৌষধির গুণে"—সন্ন্যাসীর বশীকরণ ওষুধের প্রয়োগে শচীন্দ্র যে রজনীর প্রতি অনুরক্ত হয়ে তাকে বিবাহ করতে চাইবে, তাতে লবঙ্গের কোনো সন্দেহ নেই। এই অলৌকিকত্ব সম্পর্কে তার স্থির বিশ্বাস যে, কামার বউ-এর পিতলের জিনিস সন্ন্যাসী অলৌকিক গুণে সোনা করে দিতে পারেন।

"মাস্‌ুয়া"—মেসোমশায়।

"অমরনাথের এত বড় স্পর্দ্ধা"—অমরনাথ সম্পর্কে লবঙ্গলতার মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। যে লবঙ্গ রজনীর সঙ্গে তার পুত্র শচীন্দ্রের বিবাহে উৎসুক, সেই পথে বাধা দেবে কিনা অমরনাথ! সেজন্য অমরনাথের দুর্বল আচরণকে প্রকাশ করে দিয়ে লবঙ্গ নিজের চরিত্র-মহিমাকে যেমন প্রকাশ করতে চায়, তেমনি স্বার্থসিদ্ধি করতেও তৎপর হয়ে ওঠে।

"কাচ"—ছলনা।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদের কথক অমরনাথ। অমরনাথ প্রথমে বিস্মিত হলেম এই কথা ভেবে যে, রজনী সম্পত্তির দখল নিচ্ছে না কেন! সম্পত্তির প্রতি রজনীর এ ধরনের অনিহা সত্যই বিস্ময়কর। অমরনাথ এত কষ্ট করে যে সম্পত্তি উদ্ধার করলেন, সেই সম্পত্তি গ্রহণে রজনীকে তিনি কেন, কেউই রাজী করাতে পারলেন না। এই সম্পত্তি গ্রহণে রজনীর অনাগ্রহের কারণ রহস্যাবৃতই রয়ে গেল। অমরনাথ

দীর্ঘদিন ব্যবধানের পর রজনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। কারণ, তাঁর সঙ্গে রজনীর বিবাহের কথাবার্তার পর এ সাক্ষাৎকার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এখন এই সম্পত্তির ব্যাপারে রজনীর সঙ্গে একটা নিষ্পত্তি করার ইচ্ছায় অমরনাথ রজনীর বাড়িতে গিয়ে দীর্ঘ ব্যবধান সত্ত্বেও একটি নারীকে দেখামাত্রই চিনলেন। সে নারী ললিতলবঙ্গলতা। রজনী ও তার সম্পত্তিকে কেন্দ্র ক'রে দুই বিরোধী-শক্তি এইবার সম্মুখ সংঘর্ষে উপনীত। লবঙ্গলতা রজনীর প্রতি সমস্ত বিরূপতাকে চেপে রেখে হাসিতে উচ্ছল হয়ে পড়েছিল। লবঙ্গলতা অমরনাথের সঙ্গে নিভৃতে সাক্ষাৎ করবার জন্য রজনীকে অন্যত্র যেতে বলল। লবঙ্গলতা ও অমরনাথের মধ্যে তির্যক ভঙ্গীতে কিছু কথাবার্তা হল। শেষে অমরনাথের সম্মুখে রজনী লবঙ্গলতাকে তার সমস্ত সম্পত্তি দান করবার কথা বলল অত্যন্ত কাতর হয়ে। রজনীর এই সিদ্ধান্তে অমরনাথ অত্যন্ত আনন্দিত হলেন।

এই পরিচ্ছেদটি নানাদিক দিয়ে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ ও ইঙ্গিতবহ। রজনী কেন যে তার প্রাপ্য সম্পত্তির দখল নিতে চায়নি, সে রহস্য অমরনাথের কাছে অজ্ঞাতই ছিল। শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর দুর্বলতা, রজনীকে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছে। যাকে ভালবাসা যায়, তার মঙ্গলের জন্য, স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য নায়িকা সমস্ত বিপর্যয়কেই মাথা পেতে নিতে রাজী। রজনী তার দারিদ্র্যকে প্রসন্ন চিত্তে মেনে নিতে রাজী। কিন্তু তার ভালোবাসার জনকে সে কোনো অবস্থাতেই বিপর্যয়ের মুখে ফেলতে রাজী নয়। প্রথম প্রেমের আবেগ যে শচীন্দ্রকে কেন্দ্র করে তার চিত্তে প্রস্ফুটিত হয়েছিল, নিজের প্রাপ্য সম্পত্তি গ্রহণে অস্বীকৃতির মধ্যে রজনীর প্রেমের মহিমাই প্রস্ফুটিত। এ রহস্য অমরনাথের কাছে অজ্ঞাত ছিল। তাই আদর্শের দিক দিয়ে অমরনাথ সুখী হলেও বিস্ময়ের ভাব তাঁর কাটেনি।

দ্বিতীয় কারণে এই পরিচ্ছেদটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এই যে, এখানে অমরনাথ এবং লবঙ্গলতা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে উপনীত। যে রজনী ও তার সম্পত্তিকে উপলক্ষ ক'রে এত জটিলতা, যে দুটি বিরোধী-শক্তি এই জটিলতায় সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছে এই পরিচ্ছেদে সেই অমরনাথ ও লবঙ্গলতা রজনীর সম্মুখেই যেন পরস্পরের শক্তি ও বুদ্ধি পরীক্ষায় অবতীর্ণ। অমরনাথ গিয়েছিলেন রজনীর কাছে তার সম্পত্তি না নেওয়ার কারণ সম্পর্কে অবহিত হতে, অন্যদিকে লবঙ্গলতা গিয়েছিলেন রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের বিবাহের বন্দোবস্ত করে সম্পত্তিটাকে বাঁচাতে। অমরনাথের কাছে সম্পত্তির চেয়েও রজনী বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। কিন্তু লবঙ্গলতার কাছে রজনী, শচীন্দ্র, অমরনাথ উপলক্ষ মাত্র; লক্ষ্য কিভাবে সম্পত্তিকে বাঁচানো যায়। তাই

লবঙ্গলতা নিজের গোপন ইচ্ছাকে নানা ছলনার দ্বারা আবৃত করে কার্যসিদ্ধি করতে চেয়েছে। রজনীর গৃহে নিজে গিয়ে সে তার মনের রাগ বা বিদ্বেষকে সম্পূর্ণ গোপন করতে পেরেছে। তার এই ছলনাময়ী হাসি অমরনাথকেও সাময়িকভাবে অন্যমনস্ক ক'রে দিয়েছে। কিন্তু অমরনাথ লবঙ্গকে চেনে বলেই পরমুহূর্তেই সচেতন হয়ে উঠেছেন। দুঃসাহসী নারী লবঙ্গ অমরনাথের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার বাসনায় রজনীকে অন্তরালে সরিয়ে দিয়েছে। দীর্ঘদিন পরে অমরনাথ-লবঙ্গের সম্মুখ-সাক্ষাৎ আমরা লক্ষ্য করলাম। নিজের কুটির ইচ্ছাকে গোপন করে হাসিতে মুখ ভরিয়ে লবঙ্গ অমরনাথের সঙ্গে কথা বলেছে। লবঙ্গ তাঁকে পাহারাওয়ালার ভয় দেখিয়েছে, অমরনাথ তাকে ঘুষের ইঙ্গিত করেছে। অমরনাথ মুহূর্তের দুর্বলতায় তাঁর পূর্ব দুষ্কর্মকে গোপন রাখার অনুরোধ জানিয়েছে লবঙ্গকে। বোধ করি এই পথ ধরেই লবঙ্গ তার স্বার্থসিদ্ধি করতে চায়। এই ধরনের নারী ছলনাময়ী ; তাই হাসতে হাসতে এরা স্বার্থ সিদ্ধির জন্য যে-কোনও ধরনের নীচতাকে গ্রহণ করতে পারে। তাই আমরা দেখি, রজনী লবঙ্গলতার চরণ স্পর্শ করে ক্রন্দনরতা এবং অমরনাথের সম্মুখে রজনী সেই সম্পত্তি লবঙ্গলতাকে দান করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এতে লবঙ্গলতা তার স্বার্থ সিদ্ধির আনন্দে খুশী। অমরনাথ খুশী রজনীর এই মহৎ আত্মত্যাগে। অমরনাথ রজনীর এই মহত্ত্বে এতই মুগ্ধ যে, তার এ অন্ধত্বকে আবৃত করে তার মহিমা লবঙ্গলতার সমস্ত সৌন্দর্যকে ম্লান করে দিয়েছে। অমরনাথ রজনীর এই মাহাত্ম্যের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন সম্পূর্ণভাবে। এই পরিচ্ছেদটি শেষ হয়েছে একটি নাটকীয় মুহূর্তে। যেখানে লবঙ্গ মনে করেছে সে বিজয়িনী, কেননা রজনীয় সম্পত্তিকে সে নিজের কাছে রাখতে পেরেছে। অন্যদিকে অমরনাথ ভেবেছেন যে, তিনি বিজয়ী। কারণ রজনীর মহত্ত্ব তার প্রতি অমরনাথকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণে অনুপ্রাণিত করেছে। আর রজনী? দ্বন্দ্বে সে ক্ষতবিক্ষত। প্রথম প্রেমের স্পর্শে যার চিত্ত জেগেছিল, সেই শচীন্দ্রের প্রতি সে তার দায়িত্ব পালন করেছে সম্পত্তি প্রত্যাখ্যান করে, আবার অমরনাথের প্রতি তার কৃতজ্ঞতা সমানভাবেই সক্রিয়। অমরনাথ প্রেমের স্বাভাবিক প্রকাশে রজনীকে আন্তরিকভাবে কামনা করেছে। অন্যদিকে অলৌকিকতার প্রভাবে শচীন্দ্র রজনীকে কামনা করেছে। রজনীর চিত্ত স্থির-সিদ্ধান্তে উপনীত না হওয়ার বেদনায় চঞ্চল। আর লবঙ্গলতা সম্পত্তি রক্ষা করে তার স্বার্থসিদ্ধির এই কুটিলতাকে আবৃত করবার জন্য শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহে তৎপর। এর দ্বারা সে অমরনাথকেও মুখের মত জবাব দিতে চায়। কারণ সে মনে করেছিল রজনীর সম্পত্তির লোভেই বুঝি

অমরনাথ রজনীর সম্পত্তি উদ্ধারে তৎপর। এই জটিল পরিস্থিতির মধ্য দিয়েই এই পরিচ্ছেদের সমাপ্তি।

"সেবারেও ললিতলবঙ্গলতা"—অমরনাথ মূলতঃ সংযমী পুরুষ। কিন্তু প্রথম যৌবনের উন্মাদনায় অমরনাথ তাঁর বিদ্যা, বুদ্ধি, সামাজিক মর্যাদা সমস্ত কিছু বিস্মৃত হয়ে সাময়িক দুর্বলতায় একটি অপকর্ম করে বসেন। তার জন্য তিনি লাঞ্ছনাও পেয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে। এই লবঙ্গলতাকে কেন্দ্র করেই তাঁর জীবনে যা কিছু ঘটনা। দীর্ঘদিন বাদে এই লবঙ্গলতাকেই আবার নতুন পরিবেশে, নতুন পটভূমিকায় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিনীরূপে দেখে তিনি মুহূর্তের জন্য আত্মবিস্মৃত হন। অমরনাথ বলতে চান, উভয় ক্ষেত্রেই তাঁর আত্মবিস্মৃতির কারণ লবঙ্গলতা। লবঙ্গের-স্মৃতি যে অমরনাথের মনে এখনও উজ্জ্বল হয়ে রয়েছে এবং সে বেদনাকে ভোলবার চেষ্টা করেও সে বেদনার স্মৃতি ভুলতে পারেননি, এটুকু পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হয় না।

"এখন স্বহস্তে রাঁধিয়া···করিতে না"—লবঙ্গের নানা তির্যক কথাবার্তা ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ অমরনাথ শুনেছেন। এখানে অমরনাথ লবঙ্গকে সেই তির্যক ভঙ্গীতেই কথা বলে খোঁচা দিতে চেয়েছেন। লবঙ্গ অত্যন্ত বুদ্ধিমতী বলে উচ্চ হাসিতে বিষয়টাকে লঘু করে দিতে চেয়েছে।

"আমার রক্ষার জন্য···দিবে"—অমরনাথকে লবঙ্গ যখন পাহারাওয়ালার ভয় দেখাল, তখন অমরনাথও তাকে ব্যঙ্গ ক'রে বললেন, রজনীর বিষয় ঘুষ পেলে বোধ করি লবঙ্গ তাঁকে ছেড়ে দেবে।

"দরিদ্র কন্যার ঐশ্বর্যে···পারিতেছি না"—বিষয়-সম্পত্তি উদ্ধারের ব্যাপারে রজনীর অনীহা অমরনাথকে চিন্তিত করেছে। অমরনাথ তো জানেন না, শচীন্দ্রের প্রতি প্রেমবোধেই রজনীর এই আত্মত্যাগ।

"আমি অবাক হইয়া···পড়িতেছিলাম"—লবঙ্গলতা চরিত্রের প্রতিজ্ঞাপূরণে বা স্বার্থসিদ্ধিতে দৃঢ়তা ও তার মানসিক শক্তি সম্পর্কে অমরনাথ সচেতন। তাই লবঙ্গের ছলনা সম্পর্কে অমরনাথ জ্ঞাত বলেই তিনি তার কার্যকলাপ বুঝতে পেরেছেন।

"জলের উপর হইতে···গেল"—হাসির দ্বারা লবঙ্গ তার মনের ক্রোধকে গোপন করতে পারল।

"অন্ধ রজনী অদ্বিতীয় রত্ন"—রজনী সম্পত্তি দান করে দিয়ে যে মহত্ত্ব দেখিয়েছে তাতে অমরনাথ মুগ্ধ। রজনী-চরিত্রের এই ঔদার্য ও আত্মত্যাগ রজনীর প্রতি অমরনাথকে আরো বেশী করে আকৃষ্ট করেছে। সাধারণ দৃষ্টিতে অমরনাথের এতে খুশী হবার কথা নয়, কারণ রজনীর তিনি ভবিষ্যৎ স্বামী। কিন্তু অমরনাথ ভিন্ন

প্র কৃতির মানুষ। তাই নিজে তিনি উদার ও মহৎ বলে অন্যের উদারতা ও মহত্ত্ব উপলব্ধি করলেন। রজনীর হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে অমরনাথ নিজেকে ভাগ্যবান মনে করলেন।

"**বিধাতা আমার…করিবেন না**"—রজনীকে পাওয়ার বাসনা অমরনাথের এত তীব্র আকার ধারণ করেছে যে, তিনি বিশ্বাসই করতে চান না সত্যসত্যই রজনীকে তিনি পাবেন কিনা। এর দ্বারা অমরনাথ চিত্তের আগ্রহ যেমন প্রকাশ পেয়েছে, অন্যদিকে রজনী-অমরনাথ মিলনের পথে একটা জিজ্ঞাসার চিহ্ন রয়ে গেছে।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পরিচ্ছেদের কথক লবঙ্গলতা। লবঙ্গলতা রজনী ও অমরনাথের সঙ্গে কথাবার্তা বলে অত্যন্ত বিস্ময়বোধ করল। লবঙ্গ বুঝে উঠতে পারল না, রজনী তার বিষয় ছেড়ে দিতে চাইছে কেন এবং যে অমরনাথ এত কষ্ট করে এই সম্পত্তি উদ্ধার করল, সেই বা এই ব্যাপারে আনন্দবোধ করছে কেন! কারণ লবঙ্গলতা ভেবেছিল রজনী বিষয় দান করেছে শুনে অমরনাথ কাতর হয়ে উঠবে। রজনীর এই আন্তরিকতায় লবঙ্গ মুগ্ধ হ'ল বটে, কিন্তু এভাবে দান গ্রহণ করতে তার হীনমন্যতা দেখা দিল। তাই লবঙ্গ রজনীকে জানাল (হয়ত রজনীকে পরীক্ষা করার জন্যই), রজনীর সম্পত্তি লবঙ্গ না নিলে কি সে অমরনাথকে তা দান করবে? কিন্তু যখন সে শুনল যে, অমরনাথ সে দান কোনো ক্রমেই নেবে না, তখন লবঙ্গের চিত্তে সংশয় দেখা দিল। লবঙ্গ মনে করেছিল, রজনীর সম্পত্তির লোভেই অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করতে চাইছে। কিন্তু সেই সম্পত্তি হাতছাড়া হতে দেখেও অমরনাথ-চিত্তে কোনো বিকার ঘটল না দেখে লবঙ্গ বিস্মিত। তখন লবঙ্গ রজনীর সঙ্গে একটা বোঝা-পড়ায় আসতে চাইল। নিজের সম্পত্তির লোভকে চাপা দেবার জন্য লবঙ্গ প্রস্তাব করল রজনীর দান সে গ্রহণ করবে যদি শচীন্দ্রকে রজনী বিবাহ করে। এ প্রস্তাবে রজনীর ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে গেল। অশ্রুজলে পরিপ্লুত রজনী এতদিন বাদে লবঙ্গের কাছে নিজের চিত্ত উন্মোচন করে জানাল শচীন্দ্রের প্রতি তার আকর্ষণের কথা। কিন্তু তবুও শচীন্দ্রের প্রতি এত দুর্বলতা সত্ত্বেও অমরনাথকেই সে গ্রহণ করবে। কেননা অমরনাথ শুধু তার সম্পত্তি উদ্ধার করেননি, তিনি তার জীবনও দান করেছেন, মৃত্যুর হাত থেকে তাকে বাঁচিয়েছেন। কিন্তু লবঙ্গলতা তাতেও হাল ছাড়ল না। অমরনাথের সঙ্গে একটা বোঝাপড়ার জন্য সে রজনীকে সরিয়ে দিয়ে অমরনাথের সঙ্গে কথা বলতে উদ্যত হল।

এই পরিচ্ছেদটি নানাদিক দিয়ে উল্লেখযোগ্য। এখানে আমরা একই সঙ্গে উপন্যাসের তিনটি প্রধান পাত্রী-পাত্রীর সাক্ষাৎ পাই। এখানে রজনী-চরিত্রের উদারতা

ও অমরনাথের মহত্ত্বের কাছে লবঙ্গলতার পরাজয় ঘটেছে এবং তার সমস্ত পরিকল্পনা প্রচণ্ডভাবে নাড়া খেয়েছে। শুধু তাই নয়, রজনী ও অমরনাথের আচরণ তার বুদ্ধি ও যুক্তির বাইরে। প্রত্যক্ষ আঘাতেই যে একমাত্র প্রতিশোধ নেওয়া যায় তা নয়। অমরনাথ তাঁর উদারতা ও ঔদাসীন্য নিয়েও লবঙ্গকে চরম পরাজয়ের গ্লানিতে মণ্ডিত করেছেন।

তাছাড়া, শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর দুর্বলতা ও তীব্র ভালবাসা এই পরিচ্ছেদে সে খোলাখুলি স্বীকার করেছে ও চোখের জলের মধ্য দিয়ে লবঙ্গের কাছে তার এই স্বীকারোক্তি এবং শচীন্দ্রকে পাওয়ার পূর্ণ সুযোগ থাকতেও তাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানে রজনী-চরিত্রের আর একটি দিক আমাদের কাছে উদ্‌ভাসিত হয়ে উঠেছে। অমরনাথের প্রতি তার কৃতজ্ঞতাবোধই তার ব্যক্তিগত পরম যত্নে লালিত প্রথম প্রেমের স্বপ্নপুরুষ শচীন্দ্রকে গ্রহণ না করতে অনুপ্রাণিত করেছে। এর দ্বারা রজনী-চরিত্রের আর একটি দিক আমাদের কাছে উদভাসিত হয়ে ওঠে। তা হল অন্ধের রূপোন্মত্ততা যতই তীব্র হোক রজনীর প্রেমবোধ মহৎ ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত। মহৎপ্রেম প্রিয়জনকে শুধু কাছেই টানে না, দূরেও ঠেলে দেয়। তা না হলে, শ্রীকৃষ্ণকে না-পাওয়ার বেদনায় শ্রীরাধার আর্তি যুগ যুগ ধরে এভাবে গীত হত না। এই আত্মত্যাগেই রজনীর প্রেম মহিমা পেয়েছে। লবঙ্গ এ প্রেমের মর্ম কি করেই বা বুঝবে! তাই সে রজনীর আচরণের রহস্য বিশ্লেষণ করে উঠতে পারেনি। অমরনাথ নিরাসক্ত দর্শকের মত সমস্ত ঘটনাপ্রবাহকে বিনা উত্তেজনায় লক্ষ্য করে গেছেন। তাই রজনীর সম্পত্তি ত্যাগেও যেমন তিনি নির্বিকার, রজনীকে বিবাহ করার আকাঙ্ক্ষাতেও তেমনি তিনি দৃঢ়। রজনীর কাছে পরাজিত লবঙ্গ এইবার অমরনাথের সঙ্গে শেষ বোঝাপড়ায় নেমেছে।

"**দার্ঢ্য**"—দৃঢ়তা।

"**তুমি লবঙ্গলতা⋯ সহস্রগুণে সুখী**"—লবঙ্গলতা যে বিবাহিত জীবনে সুখী নয়, এই মন্তব্যটি তা প্রমাণ করে। কিন্তু কোনো ক্ষেত্রেই লবঙ্গলতার বাইরের আচরণ এবং মনের বাসনা একসঙ্গে চলে না। তার এই অসাবধানতাবশতঃ যে স্বীকারোক্তি তাতে লবঙ্গের মনের কথা প্রকাশ পেয়ে গেছে। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গেই লবঙ্গ তা সামলে নিয়েছে।

"**কেন বাছাকে⋯⋯ঔষুধ করিলাম**"—সম্পত্তি বাঁচাবার যে প্রেরণায় লবঙ্গ সন্ন্যাসীর অলৌকিক শক্তি-প্রভাবে শচীন্দ্রের মনকে রজনীর অভিমুখী করতে চেয়েছে, সেই রজনীই তাকে প্রত্যাখ্যান করল। নিয়তির কি নির্মম পরিহাস!

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদেরও কথক লবঙ্গলতা। এখানে অমরনাথ ও লবঙ্গলতার একান্ত সাক্ষাৎকার পাই। লবঙ্গলতা তার প্রতিজ্ঞা পূরণের স্বার্থে অমরনাথকে চরম আঘাত হানতে উদ্যত। অমরনাথ ও লবঙ্গের মধ্যে তির্যক ভঙ্গীতে বাক্যালাপ লক্ষ্য করা যায়। লবঙ্গ জানতে চায়, রজনীর বিষয় না পেয়েও তিনি রজনীকে বিবাহ করবেন কেন? উত্তরে অমরনাথ জানান তিনি রজনীকেই বিবাহ করবেন, রজনীর বিষয়কে নয়। কিন্তু লবঙ্গের স্থির বিশ্বাস, বিষয়ের জন্যই অমরনাথ রজনীকে চান। তাই সে ব্যঙ্গ করে বলে, এত কন্যা থাকতে অন্ধ রজনীর প্রতি অনুরাগ কেন? অমরনাথও ব্যঙ্গ করে বলে, বৃদ্ধ স্বামীর প্রতি লবঙ্গের এত আসক্তি কেন? এইভাবে বাদানুবাদের ফলে লবঙ্গ ক্ষুব্ধ হয়ে খোলাখুলিভাবে তার প্রতিজ্ঞার কথা জানাল, এবং অমরনাথের রূপমুগ্ধতার ফলে তিনি লবঙ্গের প্রতি যে দুর্বলতাএকদিন প্রকাশ করেছিলেন, সেই গোপন কথা সর্বসমক্ষে ফাঁস করে দেবে বলে ভয় দেখাল। অমরনাথ প্রথম যৌবনে লবঙ্গের রূপে মুগ্ধ হয়ে গোপনে তার ঘরে প্রবেশ করেন। লবঙ্গ এই ঘটনাকে অমরনাথের স্পর্ধা মনে করে, দারোয়ান ও লোকজন দিয়ে তাকে শুধু বহিষ্কারই করেনি, স্বহস্তে লোহার তপ্ত শলাকা দিয়ে অমরনাথের পিঠে লিখে দেয় "**চোর**"—সে লজ্জা অমরনাথের কোনোদিন মুছে যায়নি। এখনও তার পিঠে তা চিহ্নিত। অমরনাথকে লবঙ্গ ভয় দেখায়, এই সমস্ত কীর্তি সে রজনীর কাছে ফাঁস করে দেবে। কিন্তু লবঙ্গের এই চাতুর্য ও হুমকিকে প্রত্যাঘাত করে অমরনাথ জানান তিনি নিজেই রজনীর কাছে সব ঘটনা বিবৃত করবেন। অমরনাথের এই সৎ সাহস ও দৃঢ়তার কাছে লবঙ্গের আবার পরাজয় ঘটল।

এই পরিচ্ছেদে লবঙ্গ-অমরনাথকে কেন্দ্র করে যে রহস্য তা পাঠকের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়। প্রথম যৌবনে রূপমোহের দ্বারা তাড়িত অমরনাথ সাময়িক বিভ্রান্তির ফলে যে কাজ করেছিলেন তার চিহ্ন তাঁকে সারাজীবন বহন ক'রে চলতে হয়েছে। কিন্তু দৃঢ়চেতা অমরনাথ তাঁর এই সাময়িক দুর্বলতাকে অতিক্রম ক'রে তাঁর চিত্তের দৃঢ়তাকে প্রমাণ করেছেন। লবঙ্গ তার উদ্দেশ্য সিদ্ধির মতলবে অমরনাথকে কোনো-ভাবে বিবৃত্ত করতে না পেরে শেষ অস্ত্র প্রয়োগ করেছে। যে অস্ত্রের আঘাতে অমরনাথ ক্ষণকালের জন্য বিহ্বল হয়ে পড়েন। অবশেষে তাঁর এই দৃঢ়চিত্ততা লবঙ্গলতার সমস্ত চক্রান্তকে ব্যর্থ করে দিয়েছে। লবঙ্গের সঙ্গে অমরনাথের যে বাক্যালাপ এই পরিচ্ছেদে পাই, তাতে মনে হয় লবঙ্গ যেন ইচ্ছাকৃতভাবে অমরনাথের সঙ্গে বিরোধ বাধাতে চায়। অমরনাথের রজনীকে বিবাহ করার প্রস্তাব লবঙ্গ যে প্রসন্নমনে মেনে নেয়নি তা প্রমাণিত হয়, তার ব্যঙ্গোক্তির মধ্যে। কিন্তু অমরনাথ যখন তার মুখের মত

জবাব দিয়েছেন, তখন সে সমস্ত ভদ্রতার আবরণ ছিন্ন করে স্বরূপে আত্মপ্রকাশ করেছে। অমরনাথের সঙ্গে রজনীর বিবাহ বন্ধ করতে সে যে বদ্ধপরিকর, তা সে খোলাখুলি জানিয়েছে। এবং তার এই কার্যসিদ্ধির জন্য সে যে-কোনো পন্থা অবলম্বনে প্রস্তুত।

তাই লবঙ্গ-অমরনাথকে কেন্দ্র করে একটি বিস্মৃত-প্রায় কাহিনী সে অমরনাথকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁকে সন্ত্রস্ত করে তুলেছে। এর দ্বারা লবঙ্গ তার সততা বা সতীত্বের মহিমাকে প্রমাণ করতে চেয়েছে। কিন্তু অমরনাথের প্রতি স্বহস্তে তপ্ত লৌহ শলাকা দিয়ে 'চোর' লিখে দেওয়ার মধ্যে আর যাই প্রকাশ পাক, এভাবে সতীত্বের মহিমা কোনোভাবেই প্রকাশ পায়নি। বরং লবঙ্গ-চরিত্রের আচরণে নারী-সুলভ পেলবতা ও লজ্জাবোধ লক্ষ্য করা যায় না। লবঙ্গ যে কৌশল অবলম্বন করে ও যে ছলনার আশ্রয় নিয়ে অমরনাথকে অপদস্থ করেছিল এবং সেই ঘটনা যে ভঙ্গীতে বিবৃত করেছে, তাতে তার বাক্‌পটুতা ও কৌশলী মনোভাব আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। অবিবাহিতা গৃহস্থ কন্যার এ ধরনের আচরণে যে ব্যক্তিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, সে ব্যক্তিত্ব সেযুগে সম্পূর্ণ অস্বাভাবিক। এর দ্বারা মনে হয় লবঙ্গ যত না সতী, সতীর ভূমিকায় অভিনয় ক'রে সে সামাজিক মানুষকে তাক লাগিয়ে দিতে চেয়েছে। তার সতীত্ব যে নিখাদ নয়, তার প্রমাণ স্বামী রামসদয়কে নিয়ে সে সুখী নয়। কিন্তু অমরনাথ সাময়িকভাবে বিহ্বল হয়ে পড়লেও সমস্ত ঘটনাজালকে ছিন্ন ক'রে তাঁর দৃঢ়তা ও মহত্ত্ব তাঁর কৃতি আমাদের শ্রদ্ধাবান ক'রে তোলে। এবং তাঁর এই যৌবনোচিত দুর্বলতার ফলে যে ত্রুটি, তার জন্য আমাদের মনে হয় তিনি লঘু পাপে গুরু দণ্ড পেয়েছেন। অমরনাথ-চরিত্র যে মহৎ তার অনেক প্রমাণ সমগ্র কাহিনীর মধ্যে ছড়িয়ে রয়েছে।

"আমি রজনীকে...করিব না"—অমরনাথ চরিত্রের নির্লোভ ও উদার মানসিকতার প্রকাশ ঘটেছে।

"আমি হারিয়া...ঘরে আসিলাম"—অমরনাথ চরিত্রের মহত্ত্বে লবঙ্গলতাও মুগ্ধ। অমরনাথ যে প্রবঞ্চক বা প্রতারক নন তা প্রমাণিত হল। যৌবনের সাময়িক উন্মাদনায় যে ভুল অমরনাথ করেছিলেন, তিনি সে কথা ভবিষ্যৎ পত্নীর কাছে প্রকাশ করবার জন্য তৈরী। এই গোপন কলঙ্ক কাহিনীরূপ ব্রহ্মাস্ত্র নিক্ষেপ ক'রেও লবঙ্গলতা শেষ পর্যন্ত অমরনাথের কাছে হেরে গেল। অমরনাথের মহত্ত্বে লবঙ্গ হয়ত অমরনাথের প্রতি শ্রাদ্ধাবান হয়ে উঠল।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদের কথক শচীন্দ্রনাথ। শচীন্দ্র এখানে নিজেই তার চিত্তবিকারের কথা বিবৃত করেছে। একদিন গ্রন্থপাঠে অবসন্ন শচীন্দ্র নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়ে। অবশেষে, নিদ্রা ভঙ্গে তার চিত্তবিকার উপস্থিত হয়। সেই বিকারের মধ্যে সে শুধু লক্ষ্য করে রজনীর মুখ। রজনী যেন ধীরে ধীরে গঙ্গার জলে অন্তর্হিত হয়ে যাচ্ছে। রজনীর রূপে শচীন্দ্র তীব্রভাবে আকর্ষণ বোধ করে। চিকিৎসকেরা নানাভাবে তার চিকিৎসা করে। কিন্তু কিছুতেই রজনীর রূপ এবং রজনীর ধ্যান শচীন্দ্রের মন থেকে দূর হয় না।

এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্র নিজেই যেভাবে তার চিত্তবিকার বিবৃত করেছে, তার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় শচীন্দ্রের চিত্ত চেতন ও অবচেতনের মধ্যে দোলায়িত হচ্ছিল। কারণ শচীন্দ্রের মন যদি সচেতন না থাকত, তাহলে পরে সে এইভাবে কাহিনী বিবৃত করতে পারত না। শচীন্দ্র নিজেই এই বিকারের কারণ বিশ্লেষণ করতে চেয়েছে। ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য থেকে অকস্মাৎ দারিদ্র্যে পতনের জন্য তার এই চিত্তবিকার কিনা সে জানে না। তবে রজনীর চিন্তা তার অবচেতন মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করেছিল যে, কোনোভাবেই রজনীর রূপ চোখের সামনে থেকে সে দূর করতে পারেনি। রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের এই আসক্তি অলৌকিকতার প্রভাবের দ্বারা যে নিয়ন্ত্রিত, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

"**ধীরে, রজনি ধীরে**"—রজনীর রূপ সম্পর্কে শচীন্দ্রের মন ধীরে ধীরে আকৃষ্ট হয়ে উঠছিল এবং সেই রূপের আস্বাদ যাতে দৃষ্টিপথ থেকে লুপ্ত না হয়ে যায়, তার জন্যই শচীন্দ্রের এই কাতরতা। রজনী যেন অকস্মাৎ অন্তর্হিত না হয় অর্থাৎ ধীরে ধীরে শচীন্দ্র চিত্তকে আচ্ছন্ন করে তোলে।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদের কথকও শচীন্দ্র। শচীন্দ্র বিবৃত করেছে রজনী ধীরে ধীরে তার হৃদয় জয় করেছে। শচীন্দ্রের দুর্বল ও অসুস্থ চিন্তায় রজনীর স্মৃতি তার চিত্তকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে।

এই পরিচ্ছেদে শচীন্দ্রের চিত্তের পরিবর্তন অত্যন্ত মনস্তত্ত্বসম্মতভাবে ধীরে ধীরে উন্মোচিত হয়েছে। শচীন্দ্রের যে বিবৃতি তা প্রতীকধর্মী ভঙ্গীতে প্রকাশ পেয়েছে। রজনীর উদ্দেশে শচীন্দ্র-চিত্তের প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় ভঙ্গীতে রূপলাভ করেছে। প্রেমের পিচ্ছিলপথে অনভিজ্ঞ রজনী ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের হৃদয় জয় করে নিয়েছে।

শচীন্দ্রের চিত্ত নিজের কাছেই অজ্ঞাত ছিল। চিত্ত-প্রবণতার আবিষ্কার ঘটেছে রজনীর স্পর্শে। তাই শচীন্দ্র বলেছে—"দীপশলাকার ন্যায় ইহাতে প্রবেশ করিয়া আলো কর,—দীপশলাকার ন্যায় আপনি পুড়িবে, কিন্তু এ আঁধার পুরী আলো করিবে।" রজনী শচীন্দ্রের সমগ্র সত্তাকে যেন আলো করে রেখেছে।

ধীরে…দ্রুতগামিনী কেন"—শচীন্দ্রের হৃদয় রজনী এত আকস্মিকভাবে অধিকার করে নিয়েছে, যাতে শচীন্দ্র বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

"ক্ষুদ্র এই পুরী…আলো করিবে"—শচীন্দ্রের হৃদয় অন্ধকারে আচ্ছন্ন। প্রেমের পদচিহ্ন এই হৃদয়ে পড়েনি। তাই রজনীর স্পর্শে এই চিত্তের অন্ধকার বিকশিত বা আলোকিত হয়ে উঠেছে।

"এ পুরী…কর কেন"—শচীন্দ্র প্রেমের দ্বারা তার চিত্তকে আলোকিত করতে চায়। কিন্তু প্রেমের তীব্র দহনজ্বালা তাকে কাতর করে তোলে। রজনীকে আকাঙ্ক্ষা করেও সে তীব্র হতে পারে না।

"কে জানে…দাহ করিবে"—রজনীর অনিন্দ্যসৌন্দর্য তাকে পাষাণ মূর্তির মত শচীন্দ্র-চিত্তে প্রতিভাত করেছে। সেই পাষাণ-গঠিতা মূর্তি—যাকে শচীন্দ্র নিরুত্তাপ প্রতিক্রিয়াহীন প্রস্তরখণ্ড বলে মনে করত, তার মধ্যে প্রেম ও জীবনের উত্তাপ তাকে অধীর করে তুলেছে।

"হায়! রজনী! পাথরে এত আগুন"—কোনো অবস্থাতেই রজনীকে শচীন্দ্র ভুলতে পারছে না; তাই রজনী তার চিত্তে অগ্নির জ্বালা নিয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। যাকে সে এতদিন নিরুত্তাপ প্রস্তরীভূত মূর্তি বলে মনে করেছে, তার মধ্যেই সে আগুনের দীপ্তি ও জ্বালা অনুভব করেছে।

"নাই, নাই,…চাহিব না"—শচীন্দ্র রজনীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে চায়। প্রেমে অন্ধ শচীন্দ্র রজনীর অন্ধত্বের সঙ্গে এক হয়ে যেতে চায়। রজনীর দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব এবং শচীন্দের চক্ষু থাকতেও প্রেমের উন্মাদনায় তার দৃষ্টিশক্তি লুপ্ত।

এই পরিচ্ছেদে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের প্রেমের তীব্রতা অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই প্রকাশ পেয়েছে।

সপ্তম পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদের কথক লবঙ্গলতা। শচীন্দ্রের অসুস্থতার জন্য লবঙ্গলতা চিন্তিত হয়ে উঠলো। ডাক্তার-বৈদ্য শচীন্দ্রের এই অসুস্থতার কারণ সম্পর্কে রহস্যভেদ করতে না পারলেও লবঙ্গলতা ঠিকই কারণ নির্ণয়ে সমর্থ হয়েছিল। তাই এই চিত্ত বিকারের

কারণ যে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাব, সে ব্যাপারে লবঙ্গের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু অনেক ভেবেও লবঙ্গলতা সমাধানের কোনো পথ খুঁজে পেল না। যে রজনীকে কেন্দ্র ক'রে শচীন্দ্রের এই চিত্তবিকার সেই রজনীকে ডেকে পাঠাবার জন্য লবঙ্গ উদ্‌গ্রীব হলো। অর্থ লোভেই যে সে অলৌকিকত্বের সাহায্য নিয়েছে, তার জন্য তার চিত্তে প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে আবার সন্ন্যাসী আবির্ভূত হয়ে শচীন্দ্রের রোগ নির্ণয় করলেন। দারিদ্র্য-দুঃখের চিন্তায় শচীন্দ্র অন্যমনস্ক হবার জন্য গভীর অধ্যয়নে মনোনিবেশ করে। অত্যধিক অধ্যয়নের জন্য চিত্ত উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়ে এবং এই মানসিক অবস্থায় অবচেতন মনের প্রবৃত্তি প্রকাশ পায়। এই রোগও যেমন মানসিক, সেই মানসিক চিকিৎসাই এর প্রতিকারের উপায়। শচীন্দ্রকে চিকিৎসা করার ভার সন্ন্যাসী গ্রহণ করতে রাজী হলেন। সন্ন্যাসীর এই চিকিৎসা ও ঔষধ প্রয়োগের ব্যাপারে রজনীর উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় কিনা, এই নিয়ে যখন লবঙ্গ সন্ন্যাসী কথাবার্তা বলছে, সেই সময়ে রজনী এসে উপস্থিত হলো। অমরনাথও শচীন্দ্রের অসুস্থতার খবরে তার সঙ্গে সাক্ষাতের অভিপ্রায়ে বহির্বাটীতে উপস্থিত।

শচীন্দ্রের সচেতন মনে রজনীর প্রতি হয়ত কোনোও অনুরাগের চিহ্ন ছিল না, কারণ রজনী অন্ধ এবং তার পরিচিতি শচীন্দ্রের অজ্ঞাত। কিন্তু অবচেতন মনে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের দুর্বলতা ও প্রেমবোধ এত স্থায়িভাবে দানা বেঁধেছিল যে, বিকারের ঘোরে শচীন্দ্রের চিত্তে রজনী সমস্ত কিছুকে ছাড়িয়ে বারবার দেখা দিয়েছে।

চতুর্থ খণ্ডে কাহিনীটি ধীরে ধীরে পরিণতির দিকে এগিয়ে চলেছে। এই খণ্ডে সকলের কথা একসঙ্গে বিভিন্ন পরিচ্ছেদে বিবৃত হয়েছে। লবঙ্গ-অমরনাথের অজ্ঞাত কাহিনীর রহস্য যেমন এখানে উদ্‌ঘাটিত, অন্যদিকে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আসক্তির ক্রমবর্ধমান প্রকাশ এখানে চিত্রিত। এই তিনজনই এই খণ্ডের কথক। যে রজনীকে উপলক্ষ করে এই কাহিনীর আবর্তন, কথক হিসেবে সে এখানে অনুপস্থিত। অথচ অমরনাথ-লবঙ্গের যে প্রত্যক্ষ বিরোধ এখানে উদ্‌ঘাটিত তা রজনীকে কেন্দ্র ক'রেই। অন্যদিকে শচীন্দ্রের যে চিত্তবিকার তাও রজনীকে কেন্দ্র ক'রেই। অর্থাৎ রজনীকে কেন্দ্র ক'রে এই তিনটি পাত্র-পাত্রী সমগ্র কাহিনীর আবর্তের মধ্যে বিমথিত হয়ে কাহিনীকে পরিণতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত রজনীর বরমাল্য কে লাভ করবে, এ রহস্য এখনও অজ্ঞাত। শুধু বিরোধের তীব্রতা সৃষ্টি করে চতুর্থ খণ্ডের সমাপ্তি। চতুর্থ খণ্ডের আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়, একদিকে সন্ন্যাসীর অলৌকিক প্রভাবের নানা ক্রিয়াকাণ্ড, অন্যদিকে শচীন্দ্রের চিত্তবিকারের মনস্তত্ত্বসম্মত বর্ণনা। জীবন সম্পর্কে অমরনাথের এই নিরাসক্ত ভঙ্গীর কারণ সম্পর্কেও আমরা

অবহিত হই। তাছাড়া অমরনাথের সঙ্গে বিরোধিতা করবার শক্তির উৎস কোথায় —যার জোরে লবঙ্গলতা এইভাবে কঠোর হতে পেরেছে অমরনাথ সম্পর্কে, সে কারণ সম্পর্কেও আমরা অবহিত হই।

আর একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় এখানে আলোচনা করা দরকার, তা হচ্ছে রজনী উপন্যাসের কালগত ত্রুটি। সময়ের হিসাব সম্পর্কে বঙ্কিমচন্দ্র এখানে যতখানি অসঙ্গতি দেখিয়েছেন, তাঁর সমগ্র সাহিত্যে কোথাও এধরনের ত্রুটি তীক্ষ্ণ সচেতন শিল্পী বঙ্কিমচন্দ্রের দেখা দেয়নি। এ প্রসঙ্গে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর বাগ্‌চীর বক্তব্য বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন :—

'রজনী' উপাখ্যানের কাল লইয়া খুব একটা অনির্দিষ্টতা লক্ষিত হয়। ঠিক কোন্ সময় রজনী বা অন্যান্য পাত্র পাত্রীরা কথা বলা আরম্ভ করিয়াছে তাহা সঠিক ধরিবার উপায় নাই। সমস্ত ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পর যদি বর্ণনা আরম্ভ হইয়া থাকে, তাহা হইলে পাত্র-পাত্রীর কথার মধ্য দিয়া সেই নির্দিষ্ট পরিণতির আভাস প্রথম হইতেই পাওয়া যাইত। কারণ, পরিণাম সম্বন্ধে যে নিশ্চয়তা তাহা লেখক স্বয়ং বক্তা হইলে শিল্পের খাতিরে গোপন রাখিতে পারেন, কিন্তু আখ্যায়িকার অন্তর্গত চরিত্রের পক্ষে সেই প্রভাব এড়ানো বড়ই অস্বাভাবিক। পরিণাম অবগত হইয়াও এমন নিরপেক্ষভাবে, এমম অবিমিশ্র ভাবাবেগের সঙ্গে পূর্ব কাহিনী বর্ণনা করা শক্ত। কাহিনীর গোড়ায় রজনীর কথার সুরে মনে হয়, তখনও পর্যন্ত ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং এই অনির্দিষ্টতাই তাহার মানসিক চিন্তা ও তীব্র বেদনাবোধের কারণ। ঠিক পরমুহূর্তে কি ঘটিবে, ঘটনার গতি কোন্ দিকে মোড় ঘুরিবে, রজনীর তাহা জানা নাই, তাই তাহার কথার মধ্যে এমন আন্তরিকতার সুর বাজিয়া উঠে। প্রকৃতপক্ষে পরিণতি সম্বন্ধে এই একান্ত অনিশ্চয়তাই অন্ধ যুবতীর প্রতি আমাদের সমবেদনা ও অনুভূতিকে জাগাইয়া তুলিতে সাহায্য করে। কিন্তু হীরালালের প্রসঙ্গে যখন রজনী তাহার প্রতি অকপট বিশ্বাসের কথা উল্লেখ করিতে গিয়া বলিতেছে—"আমরা তখন হীরালালের চরিত্রের কথা সবিশেষ শুনি নাই—পশ্চাৎ শুনিয়াছি"—সেখানেই প্রমাণ হয় যে, পশ্চাতের ঘটনাও এই সময় ঘটিয়া গিয়াছে এবং ঘটনা ঘটিয়া যাইবার পরই রজনী তাহার বর্ণনা করিতে বসিয়াছে। গল্পের সুখময় পরিণতির সঙ্গে রজনীর বর্তমান উক্তি— "কিন্তু যন্ত্রণাময় জীবনচরিত আর বলিতে সাধ করে না। আর একজন বলিবে—" ইহার অসামঞ্জস্য অত্যন্ত প্রত্যক্ষ। এই সময়কার দুঃখকে যখন রজনী তাহার কাম্যবস্তু লাভ করিবার পর বর্ণনা করিতেছে, তখন এই দুঃখকে যন্ত্রণাময় বলিয়া

ধিক্কার দেওয়াটা আর স্বাভাবিক নয়; বরং এই দুঃখকে সে গভীরভাবে রসোপলব্ধির দ্বার আস্বাদনই করিবে—ইহাই স্বাভাবিক।

রজনী ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মুখে যেরকমভাবে কথা বসানো হইয়াছে, তাহাতে স্পষ্ট ধারণা হয় যে, তাহাদের ভবিষ্যৎ পরিণাম সম্বন্ধে কোনই জ্ঞান নাই; পরিণাম সম্বন্ধে জ্ঞান থাকিলে অমরনাথের কথায় এমন সব দার্শনিক তত্ত্ব এবং এমনভাবে আত্মবিস্মৃতির বিশদ বর্ণনা শোভা পাইত না। অমরনাথ যখন বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে প্রস্থান করে, ভাবে যে "শচীন্দ্র রজনীর, রজনী শচীন্দ্রের, মাঝখানে আমি কে?"—তাহার পরেও আবার রজনীর কাহিনী এমন বিশদভাবে বর্ণনা করা তাহার পক্ষে স্বাভাবিক নহে। অথচ প্রথমেই অমরনাথ তাহার বক্তব্য আরম্ভ করিয়াছে এই বলিয়া: "আমার এই অসার জীবনের ক্ষুদ্র কাহিনী লিখিবার বিশেষ প্রয়োজন আছে। এ সংসার-সাগরে কোন্ চরে লাগিয়া আমার এই নৌকা ভাঙ্গিয়াছে, তাহা এই বিশ্বচিত্রে আমি আঁকিয়া রাখিব, দেখিয়া নবীন নাবিকেরা সতর্ক হইতে পারিবে।" অর্থাৎ অমরনাথের জীবনেও সমস্ত কিছু ঘটিয়া যাইবার পর, চরম পরিণতি আসিবার পর—সে কাহিনী লিপিবদ্ধ করিতে বসিয়াছে। তাহা হইলে ঘটনা-প্রবাহের সঙ্গে তাল মিলাইয়া চতুর্থ খণ্ডে যেখানে 'সকলের কথা' একস্থানে দেওয়া হইয়াছে, সেখানে তো প্রত্যেকটি পাত্র-পাত্রীর কথা দ্বারা শুধু তাহাদের ব্যক্তিগত কাহিনী বর্ণনা করিবার প্রয়োজনই মিটিতেছে না, তাহাদের উক্তির দ্বারা গল্পের গতিকে অব্যাহত রাখা হইয়াছে। পাত্র-পাত্রীরা যখন কথা বলিতে সুরু করিয়াছে, তাহার আগেই সমস্ত কাহিনী ঘটিয়া গিয়াছে। এমন কি, শচীন্দ্রের উক্তির প্রথম অংশেও তাহা প্রমাণিত হয়—সে বলিতেছে—"এ ভার আমার প্রতি হইয়াছে—রজনীর জীবন-চরিত্রের এ অংশ আমাকে লিখিতে হইবে। লিখিব।" অতএব রজনীর জীবনচরিত সম্বন্ধে শচীন্দ্র পুরাপুরি অবহিত ছিল, নয়তো এই অংশটুকু সে লিখিবে কেমন করিয়া? প্রথম তিন খণ্ড পড়িলে পাঠকের এই ধারণাই বদ্ধমূল হইবে যে, সমস্ত কাহিনীর পরিণাম পর্যন্ত ঘটিয়া যাইবার পর হইতেই বক্তারা কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছে।

অথচ চতুর্থ খণ্ডে পাত্র-পাত্রীদের কথা শুনিলে এবং দ্রুত বক্তা পরিবর্তনের তাৎপর্য খুঁজিয়া দেখিলে মনে হইবে যে, তাহারা যেন ঘটনা ঘটিবার সময়ই কথাগুলি বলিতেছে। গল্পের বেগ ক্রমেই প্রখর হইয়া উঠিতেছে এবং চরম পরিণতির মুখে অগ্রসর হইতেছে আর পাত্র-পাত্রীরা যে যাহার নিজের বক্তব্য দ্বারা ঘটনার জটিল জালকে ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

গল্পের গতিবেগের সহিত এবং "পরিণাম লাভের সহিত বক্তাদের কথাকে এমনভাবে সঙ্গত করিতে গিয়া বঙ্কিমচন্দ্র এমন একটি কালবিরোধ ঘটাইয়াছেন যাহা একটু বিচার করিলেই চোখে পড়িবে।" তবে এ ধরনের রচনারীতি বাঙলা সাহিত্যে অভিনব প্রচেষ্টা। সেদিক দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্রের এ ত্রুটিকে অতখানি গুরুত্ব না দিলেও চলে। এর পূর্ববর্তী রচনার মধ্যে "ইন্দিরা" গ্রন্থে বক্ত্রী এককভাবে কাহিনী বিবৃত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র সেখানেও অনুপস্থিত। তবে প্রথম মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাস হিসেবে "রজনী" বাঙলা সাহিত্যে সবিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে বলেই এ ধরনের ত্রুটিকে প্রসন্নমনে মেনে নিতে সকলে রাজি নন।

তা ছাড়া চারজন পাত্র-পাত্রীর ব্যবহৃত ভাষারীতি বা বর্ণনাভঙ্গীর মধ্যে এমন কোনও মৌলিক পার্থক্য নজরে পড়ে না। চারজন পাত্র-পাত্রীর শিক্ষা, রুচি, প্রবণতা বা পরিবেশ, মানসিকতা প্রভৃতির মধ্যে এত পার্থক্য সত্ত্বেও বাচনভঙ্গী বা বর্ণনভঙ্গীতে সে পার্থক্য নজরে পড়ে কি ? লবঙ্গ বা রজনী যে ভাষা বা বর্ণনা-কৌশল ব্যবহার করেছে, তার সঙ্গে শচীন্দ্র অমরনাথের ভাষা বা বর্ণনা-কৌশলের মধ্যে পার্থক্য নেই বললেই চলে।

পঞ্চম খণ্ড

পঞ্চম খণ্ডের কথক অমরনাথ স্বয়ং। অর্থাৎ অমরনাথের মুখে কাহিনীর শেষাংশ বর্ণিত হয়েছে। এই খণ্ডটি চারটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। রজনীকে কেন্দ্র ক'রে অমরনাথ-চিত্তের আকর্ষণ কি পরিমাণে তীব্র হয়ে উঠেছিল, এখানে অমরনাথের স্বীকারোক্তির মধ্যে তা প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু অমরনাথ যখন অবহিত হলেন রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত এবং লবঙ্গ তার প্রতিজ্ঞা পূরণে ব্যর্থ হতে উদ্যত হয়ে তার সমস্ত মহিমা নিয়ে অমরনাথের কাছে ক্ষমাপ্রার্থী; এই অবস্থায় অমরনাথ-চিত্তের প্রতিক্রিয়া এই হল যে, রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর। রজনীর প্রেম ও তার পরিণতি নিয়ে যে কাহিনীর বিস্তার, সেই কাহিনীর মধ্যে আকস্মিকভাবে অমরনাথ নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন। অমরনাথের উদ্দেশ্যহীন জীবনে পরোপকার ব্রত পালনের ইচ্ছায় তিনি রজনীর সম্পত্তি উদ্ধার করতে চেয়েছেন। এর দ্বারা তিনি একদিকে যেমন চিত্তে শান্তি পাবেন, তেমনি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করবেন। এই নিরাসক্ত উদাসীন মানুষটি ঘটনাচক্রে রজনীর সৌন্দর্যে ও চরিত্র মাধুর্যে মুগ্ধ হয়ে এই অন্ধনারীর প্রতি একটা প্রবল আকর্ষণ অনুভব করলেন। রজনীকে তাঁর জীবনসঙ্গিনী করবার আকাঙ্ক্ষা কারোর কাছেই আর অজ্ঞাত রইলো না। রজনীর বিবাহের ব্যাপারে অমরনাথ ও লবঙ্গের মধ্যে যে সংঘর্ষ ঘটেছিল, তাতে লবঙ্গলতাই পরাজিত হল। অমরনাথ তাঁর চরিত্রমাহাত্ম্য আরো উজ্জ্বলভাবে প্রকটিত ক'রে শুধু রজনীর উপরেই তাঁর আকর্ষণ ত্যাগ করলেন না, তাঁর সমুদয় সম্পত্তিও তিনি রজনীকে দান করে যেতে চাইলেন লবঙ্গলতারই মাধ্যমে এবং সব ত্যাগ করে অমরনাথ কাশ্মীর যাত্রা করলেন। এই ঘটনার দু'বছর বাদে যখন অমরনাথ নিতান্ত খেয়ালবশে রজনী-শচীন্দ্রের সংবাদ সংগ্রহে গেলেন, তখন জানতে পারলেন, জন্মান্ধ রজনী দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে সন্ন্যাসীর সহায়তায়। শুধু তাই নয়, অমরনাথ অবহিত হলেন শচীন্দ্র-রজনীর একটি পুত্র সন্তান লাভ হয়েছে, তার নাম অমরপ্রসাদ। শচীন্দ্র-রজনী-জীবনের সার্থকতা মণ্ডিত প্রকাশ দেখে অমরনাথ বিদায় নিলেন।

এই খণ্ডে কাহিনী পরিণতি লাভ করেছে। রজনীর প্রথম প্রেম শচীন্দ্রকে কেন্দ্র ক'রে আত্মপ্রকাশ করেছিল এবং ঘটনার নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে সেই প্রেম পরিণতি লাভ করেছে। এই আবর্তের মধ্যেই অমরনাথ রজনীর জীবনের সঙ্গে নিজে জড়িত হয়ে পড়েছেন এবং অমরনাথ ও লবঙ্গলতার অকথিত একটি কাহিনী

অমরনাথের উদাসীন চরিত্র গঠনে সহায়তা করেছে। শেষ খণ্ডে বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথের মাধ্যমে রজনী ও শচীন্দ্রের মিলনকাহিনী বর্ণনা করেছেন। প্রসন্নচিত্তে তা মেনে নিয়ে অমরনাথ নিজের ঔদার্যের পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে লবঙ্গলতা দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পূরণ ক'রে আপাতভাবে জয়লাভ করলেও অমরনাথের চরিত্র-মহিমার কাছে লবঙ্গলতাকে নতজানু হতে হয়েছে। ফলে অমরনাথ সমগ্র কাহিনীকে নিয়ন্ত্রন করে নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরিণতি ঘটিয়েছেন।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রজনীর উদারতা ও চরিত্র-মাধুর্যের পরিচয় পেয়ে অমরনাথ ক্রমেই রজনীর প্রতি গভীরভাবে আকর্ষণ বোধ করলেন। লবঙ্গলতার ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য যে অমরনাথ সন্ন্যাসীর জীবন যাপন করছিলেন, সেই অমরনাথ রজনীর প্রতি আকর্ষণ বোধ করলেন। আবেগময় ভঙ্গীতে অমরনাথ নিজের চিত্তের প্রকাশ ঘটিয়েছেন—"মনে করিয়াছিলাম - এ জীবন অমাবস্যার রাত্রি স্বরূপ—অন্ধকারেই কাটিবে—সহসা চন্দ্রোদয় হইল। মনে করিয়াছিলাম—এ জীবনসিন্ধু সাঁতরাইয়াই আমাকে পার হইতে হইবে—সহসা সম্মুখে সুবর্ণ সেতু দেখিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ মরুভূমি এমনই চিরকাল দগ্ধক্ষেত্র থাকিবে, রজনী সহসা সেখানে নন্দন-কানন আনিয়া বসাইল। আমার এ সুখের আর সীমা নাই···রজনীর মন যে জন্মান্ধ হঠাৎ তাহার চক্ষু ফুটিলে যে আনন্দ, রজনীকে ভালবাসিয়া আমার সে আনন্দ!" রজনীকে জীবনসঙ্গিনী কল্পনা করে অমরনাথ ভবিষ্যৎ জীবনের স্বপ্ন রচনা করলেন বটে, কিন্তু প্রথম যৌবনের একদিনের অপরাধের কথা, কলঙ্কের কথা রজনীর কাছে গোপন করা কি সঙ্গত হবে? অমরনাথের বিবেক বলল, রজনীকে তিনি সমস্ত কথাই জানাবেন, তাতেও যদি রজনী রাজী হয় তবেই অমরনাথ তাকে বিবাহ করবেন। একদিন রজনীকে তিনি সমস্ত ঘটনা বললেন, কিন্তু রজনী জানাল শত অপরাধেও অমরনাথ রজনীর কাছে দেবতা। কিন্তু রজনীর মন যে অপরের কাছে বিক্রীত! এর বেশী বলতে রজনী সঙ্কোচবোধ করল। অমরনাথ লবঙ্গের কাছে ছুটে গেলেন রজনীর চিত্তজয়ীকে জানবার জন্য। লবঙ্গের কাছে উপস্থিত হয়ে অমরনাথ জানতে পারলেন রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর। মনস্থির করে অমরনাথ কাঁদতে কাঁদতে ঘরে ফিরে গেলেন।

এই পরিচ্ছেদে কাহিনী তার সমস্ত রহস্যময়তার আবরণ পরিত্যাগ করে প্রদীপ্ত অনল শিখায় জ্বলে উঠেছে। সেই উজ্জ্বল আলোকে আমরা দেখলাম, রজনী-অমরনাথ-লবঙ্গলতা কারোর কাছেই কোনো ঘটনা আর অজ্ঞাত নেই। রজনীকে কেন্দ্র করে

অমরনাথ চিত্তের যে মুগ্ধতা ও তাকে নিয়ে ঘর বাঁধবার যে স্বপ্ন, তা অমরনাথকে অস্থির করে তুলেছিল। কিন্তু প্রথম যৌবনের অপরাধের যে গ্লানি অমরনাথের বিবেককে বারবার বিদ্ধ করেছে! তাই রজনীর কাছে নিজেকে গ্লানিমুক্ত করতে গিয়ে অমরনাথ সবিস্ময়ে আবিষ্কার করেছে, রজনী শচীন্দ্রের প্রতি অনুরক্ত। যে গ্লানি অমরনাথ চিত্তকে পীড়িত করছিল, রজনীর চিত্তে সে সম্পর্কে কোনোই প্রতিক্রিয়া দেখা দিল না; বরং অমরনাথ চিত্তে অপরাধের গ্লানির পরিবর্তে দেখা দিল সব হারানোর তীব্র বেদনা। সর্বরিক্ত অমরনাথ দ্বিতীয়বার ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখে ব্যর্থ হলেন। কিন্তু চিত্তের অপরিসীম সংযমে অমরনাথ এমনভাবে নিজেকে নিয়ন্ত্রণ ক'রে নিলেন যে, মহত্ত্বের কাছে স্বার্থ-চালিত লবঙ্গ নতজানু হয়ে ক্ষমাভিক্ষা করতে বাধ্য হল। যে লবঙ্গ অমরনাথের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে অবতীর্ণা, যে লবঙ্গ শচীন্দ্র-রজনীর মিলন ঘটাতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই প্রতিজ্ঞা পূরণে ব্যর্থ হওয়ার আশংকায় নিষ্ফল আক্রোশে লবঙ্গ ক্রন্দমানা। তার এই ক্রন্দন শচীন্দ্রের অসুস্থতাজনিত উদ্বেগের জন্য যত নয়, তার চেয়ে অনেক বেশী নিজের প্রতিজ্ঞা পূরণের ব্যর্থতার জন্য। রজনীর ক্রন্দন তার চিত্তের এই দ্বন্দ্বের জন্য। একদিকে অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাজনিত প্রেম, অন্যদিকে শচীন্দ্রকে অবলম্বন করে প্রথম প্রেমের উদ্ভব। আর অমরনাথ কেঁদেছেন সব হারানোর বেদনায়। শুধু তাই নয়, তার চেয়েও মর্মান্তিক—ইচ্ছা করলেই যাকে পাওয়া যেত তাঁর চরিত্রের এই সন্ন্যাসীসুলভ মহত্ত্ব জোর ক'রে কোনও কিছু অধিগ্রহণে তাঁকে বাধা দিয়েছে। তাই অমরনাথ প্রথম পরিচ্ছেদে বলেছেন, "রজনী শচীন্দ্রের, শচীন্দ্র রজনীর, মাঝখানে আমি কে? এবার বস্ত্রে মুখ লুকাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে আমি ঘরে ফিরিয়া আসিলাম।" যে অমরনাথ বলেছিলেন আমার চক্ষের জল পড়িতেছিল না—কিন্তু রজনীর কথায় আমার হৃদয়ের ভিতর হইতে রোদনধ্বনি উঠিতেছিল। এই পরিচ্ছেদের সূত্রপাতে রজনীর প্রতি প্রেমাসক্তি যে অমরনাথকে উদ্বেল করে তুলেছিল যে অমরনাথ নিজেকে অপরাধমুক্ত করবার বাসনায় রজনীর কাছে নিজেকে প্রকাশ করে প্রায়শ্চিত্ত করতে চেয়েছিলেন, ঘটনার উত্থান-পতনে সেই অমরনাথ বিপরীত আঘাতে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। একই পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র হাস্যের কিরণচ্ছটাকে অশ্রুর মুক্তাবিন্দুতে রূপান্তরিত করেছেন অমরনাথ চিত্তে।

"এ জীবন চন্দ্রোদয় হইল"—অমরনাথ ভেবেছিলেন যে, সন্ন্যাস জীবনই তাঁর পক্ষে অবধারিত। সেখানে কোনো নারীর আত্মপ্রকাশ ঘটবে না।

"রজনী কাঁদিতেছে লবঙ্গ কাঁদিতেছে"—এই দুইটি নারীকে কেন্দ্র ক'রে অমরনাথের দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিলো। ঘটনাচক্রে এই দুটি নারীর ক্রন্দন

অমরনাথের হৃদয়কে উদ্বেল ক'রে তুললো। সংসার অমরনাথের কাছে সুখহীন অন্ধকারময় মনে হলো। তাঁর চিত্তে প্রশ্ন দেখা দিল, এদের চোখের জলকে অগ্রাহ্য ক'রে অমরনাথ কি স্বার্থপরের মতো আত্মসুখে ব্যাপৃত হবে, না এদের চোখের জলের কারণ দূর করে সমস্ত দুঃখের বোঝা নিজে বহন ক'রে জীবন কাটাবে!

"**বক্ষে মুখ.. ফিরিয়া আসিলাম**"—জীবনে দ্বিতীয় বার অমরনাথ আঘাতে কাতর হয়ে উঠলেন। এই আঘাতের বেদনায় অমরনাথের মতো সর্বত্যাগী মানুষও তাঁর চরিত্রের সংযম ভুলে গিয়ে আকুল হয়ে অশ্রু বর্ষণ করেছেন। সংসারে বাস করেও জাগতিক সমস্ত কিছু স্বাচ্ছন্দ্যকে বা উপাদানকে ত্যাগ করা অত্যন্ত কঠিন কর্ম। অমরনাথের এই ত্যাগের মধ্যে একদিকে যেমন তাঁর চিত্তসংযম আমাদের বিস্মিত করে, অন্যদিকে তাঁর দলিত হৃদয়ের আর্তনাদে আমরাও বেদনাবিহ্বল হয়ে পডি।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

অমরনাথ স্থির করলেন যে, আবার সংসার ত্যাগ করে বেরিয়ে পড়বেন। যাঁর অদৃষ্টে বিধাতা সুখ লেখেননি, পরের সুখ তিনি কাড়বেন কেন? তাই রজনীকে শচীন্দ্রের কাছে দিয়ে অমরনাথ ঈশ্বর চরণে সমস্ত কিছুকে সমর্পণের বাসনা প্রকাশ করলেন। সেই অবাঙ্‌মনসগোচর যিনি, তাঁকেই অমরনাথ সর্বস্ব সমর্পণ করবার সিদ্ধান্ত নিলেন। চিত্তের এই স্থৈর্য ফিরে পেয়ে অমরনাথ শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেম। শচীন্দ্র ধীরে ধীরে প্রকৃতিস্থ হয়ে উঠছিল। একদিন সুযোগ বুঝে রজনীর প্রসঙ্গ পেয়ে অমরনাথ উপলব্ধি করলেন শচীন্দ্র রজনীর প্রতি সত্যই আসক্ত।

এই পরিচ্ছেদে অমরনাথ নিজের সম্পর্কে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। অমরনাথের মধ্যে এমন একটি উদাসীন পুরুষ আত্মগোপন ক'রে আছে, যা ঘটনাচক্রে অমরনাথকে বারবার নিরাসক্ত সন্ন্যাস জীবনের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। অমরনাথ রজনীকে বিবাহ না করার সিদ্ধান্ত যখন নিশ্চিতভাবে নিয়েছেন, তখন তিনি বলেছেন, "এ ভবের হাট হইতে আমার দোকানপাট উঠাইতে হইল···শচীন্দ্রের রজনী শচীন্দ্রকে দিয়া আমি এ সংসার ত্যাগ করিব। এ হাট ভাঙ্গিব, ঐ হৃদয়কে শাসিত করিব—যিনি সুখ-দুঃখের অতীত, তাঁহারই চরণে সকল সমর্পণ করিব।" এর পরেই অমরনাথ আবেগময় ভঙ্গীতে পরম শক্তির কাছে নিজেকে সমর্পণ ক'রে সুখ এবং শান্তির অন্বেষণ করেছেন। দর্শনে, বিজ্ঞানে, জ্ঞানীর জ্ঞানে, ধ্যানীর ধ্যানে অমরনাথ সেই পরম শক্তিকে খুঁজেছেন এবং তাঁর কাছেই আত্মসমর্পণ করে শান্তি পেতে চেয়েছেন। শেষে অমরনাথ সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে সেই পরম শক্তির কাছে

সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করেছেন। রজনীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা থেকে নিজেকে নিবৃত্ত ক'রে অমরনাথ যে সংযমের পরিচয় দিয়েছেন, তার দ্বারা তাঁর আত্মশক্তির পরিচয় আমরা পেয়েছি। কিন্তু সংসার সম্পর্কে তাঁর এই নিরাসক্তি তিনি দেবতার চরণে নিজেকে উৎসর্গ করে যেন একটা অবলম্বন খুঁজে পেয়েছেন। ঈশ্বরের নিকট আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত বেদনা ও দুঃখকে তিনি ভুলে থাকতে চেয়েছেন। এ এক ধরনের আত্মবিসর্জন। এই আত্মবিসর্জনের স্থির সংকল্প নিয়ে অমরনাথ তাঁর চিত্তের দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটিয়েছেন। যে রজনীকে কেন্দ্র ক'রে দীর্ঘদিন বাদে অমরনাথ চিত্তে প্রেমবোধের জাগরণ ঘটেছিল, সেই রজনী সম্পর্কে অমরনাথ যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, তা ব্যক্তিস্বার্থের দিকে তাকিয়ে নয়। যে শচীন্দ্রের চিত্তবিকার রজনীকে উপলক্ষ ক'রে দেখা দিয়েছিল, শচীন্দ্রের প্রতি রজনীর প্রেমবোধের যে পরিচয় অমরনাথ পরে উপলব্ধি করেছিলেন, আত্মসংযমের দ্বারা অমরনাথ সে সমস্যা দূর করে শচীন্দ্র-রজনীর মিলন ঘটিয়েছেন ও লবঙ্গলতার প্রতিজ্ঞাও তাতে পূরণ করতে পেরেছেন। নিজেদের লাভক্ষতি নিয়ে যে মানুষগুলি সংসারে চলতে চেয়েছে, তাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করেছেন অমরনাথ আত্মসংযমের দ্বারা নিজেকে বঞ্চিত করে। তাঁর চিত্তের দাহ, তাঁর বেদনা তাঁকেই ক্ষতবিক্ষত করেছে। সেই বহ্নিজ্বালা অন্যকে স্পর্শ করেনি, অন্যেরা পেয়েছে শুধু সেই অগ্নিসঞ্জাত দীপ্তি। তাই অমরনাথ শচীন্দ্রের কাছে খুব স্থিরভাবে রজনীর প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন এবং তাঁর প্রতি শচীন্দ্রের বিরূপতাকে দূর করে সমস্ত দোষ নিজে মাথা পেতে নিয়ে রজনীর সঙ্গে শচীন্দ্রের মিলনের পথ নিষ্কণ্টক করে দিয়েছেন।

"এই স্ফুটনোন্মুখ···সেখানে স্থাপন করি"—অমরনাথ তাঁর অন্তরের অন্তস্থলে সেই পরম পুরুষকে উপলব্ধি করে তাঁর চরণেই নিজেকে সমর্পণ করে রজনীর বিচ্ছেদ ব্যথা ভুলতে চেয়েছেন।

"এ দেহ কলঙ্কিত···আর রাখিব না"—শাস্ত্রোক্ত এই উক্তি অমরনাথের বক্তব্যে প্রকাশ পেয়েছে। সৎ হোক, অসৎ হোক সমস্ত কিছুর ভালমন্দের দায়িত্ব দেবতার চরণে সমর্পণ করেই অমরনাথ সংসারের লাভক্ষতির ব্যবসায় নিজেকে আর জড়িত রাখতে চান না।

"যে দেশে কি হইবে"—সুখের প্রত্যাশায় অমরনাথ রজনীকে নিয়ে ঘর বাঁধতে চেয়েছিলেন, কিন্তু তা থেকে বঞ্চিত হয়ে তিনি সুখের আশা ত্যাগ করলেন। তাই যেখানে সুখ নেই, সেখানে সুখের আশায় জাগতিক সম্পদ সংগ্রহ করার আশা বৃথা।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

কলকাতা ত্যাগের পূর্বে অমরনাথ লবঙ্গলতার সঙ্গে শেষবার সাক্ষাৎ করতে গেলেন —"তিনি আমার শিষ্যা, আমি তাঁহাকে আশীর্বাদ করিব।" লবঙ্গের সঙ্গে কথাবার্তায় অমরনাথ জানলেন তাঁর এই আত্মসংযমের কথা লবঙ্গলতা জেনেছে। তাঁর এই মহত্ত্বে লবঙ্গলতা মুগ্ধ, বিচলিত। লবঙ্গলতা অমরনাথ সম্পর্কে যে দুর্বল মুহূর্তের অনবধানতায় তা আর গোপন রইলো না এবং তার বালিকা বয়সের কর্ম সম্পর্কে লবঙ্গ অমরনাথের কাছে ক্ষমাভিক্ষা চাইল। অমরনাথও বিচলিত হয়ে পড়লেন। যে লবঙ্গের স্মৃতি অমরনাথকে সংসার সম্পর্কে উদাসীন করেছিলো, বিদায়ের কালে সেই লবঙ্গের কাছেই অমরনাথ তার হৃদয়ে একটু স্থান চাইলেন। মুখে প্রত্যাখ্যান করলেও লবঙ্গ তার মনের বেদনাকে গোপন করতে পারেনি। এদিকে অমরনাথ তাঁর ভূসম্পত্তি সমস্ত কিছু রজনীর ভাবী স্বামীর নামে দানপত্র ক'রে দিলেন এবং সেই দানপত্রটি দিয়ে গেলেন লবঙ্গের হাতে। রজনীর জীবনকাহিনীকে কেন্দ্র ক'রে যে অমরনাথ সংসারের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন, এর পর সমস্ত বন্ধন ছিন্ন ক'রে অমরনাথ দেশত্যাগী হয়ে কাশ্মীর যাত্রা করলেন। নিরাসক্ত অমরনাথ সংসার সম্পর্কে পুনরায় উদাসীন হয়ে উঠলেন।

এই পরিচ্ছেদে অমরনাথ-লবঙ্গের পারস্পরিক দুর্বলতা সমস্ত আবরণ ভেদ করে আত্মপ্রকাশ করেছে। অমরনাথ সংসার সম্পর্কে পুনরায় উদাসীন হয়ে উঠেছেন এবং সংসারের সমস্ত কিছু পরিত্যাগ করে আবার সন্ন্যাস জীবনে ব্রতী হয়েছেন। অমরনাথের এই আচরণ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। সমস্ত কিছু ত্যাগ ক'রে চলে যাবার আগে তিনি শুধু রজনীর স্বত্ব শচীন্দ্রকে দিয়ে যাননি, সেই সঙ্গে তাঁর জাগতিক সম্পদ সমস্তই রজনীর স্বামীকে দানপত্র ক'রে দিয়ে গেছেন। এবং সেই দানপত্রটি দিয়ে গেছেন তিনি লবঙ্গলতার হাতে। অমরনাথের এই মহত্ত্বে লবঙ্গলতা নিজের হৃদয়কে আর গোপন রাখতে পারেনি, এই পরিচ্ছেদের এই ঘটনাই সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, লবঙ্গ অমরনাথের প্রতি প্রশংসা বাণী উচ্চারণ করতে গিয়ে নিজের দীনতার জন্য ক্ষমাভিক্ষা চেয়ে নিয়েছে, অন্যদিকে অমরনাথের প্রতি স্পষ্টভাবে দুর্বলতা প্রকাশ করেছে। ধর্মানুসরণ ও সতীত্বের দোহাই দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র যতই লবঙ্গলতার মুখে জবাবদিহি বসান না কেন, লবঙ্গলতা তার অবচেতন মনের সত্যকে আর গোপন রাখতে পারেনি। তাই লবঙ্গ অমরনাথের যাত্রা স্থগিত রাখার উদ্দেশ্যে আবেগময় কণ্ঠে বলেছে, "তুমি আমার কে? তা তো জানি না।

এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও, কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—লবঙ্গলতা আর কিছুই বলিল না···আমি ইহাই বলিতে পারি আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী।" লবঙ্গচিত্তের এই উন্মোচনে পরমুহূর্তেই লবঙ্গ নিজেকে সাম্‌লে নেবার চেষ্টা করে এবং নীতিবাদের দোহাই দিয়ে নিজেকে সাম্‌লে নিলেও "কিন্তু দেখিলাম লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে।" অমরনাথ সর্বস্ব ত্যাগ করে যাবার আগে এইটুকুই সান্ত্বনা প্রত্যাশা করেছিলেন। এই তৃপ্তিটুকু নিয়ে অমরনাথ এই পারিবারিক দ্বন্দ্ব ও জটিলতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হলেন। তাই তিনি মন্তব্য করলেন "দোকান পাট উঠিল।"

"শুনিয়াছি, তুমি অদ্বিতীয়"—রজনীকে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা এবং তাকে পাওয়া অমরনাথের ইচ্ছাধীন ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও অমরনাথ শচীন্দ্রের জন্যে নিজের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে জলাঞ্জলি দিলেন। এই ঘটনা লবঙ্গের কাছে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। তাই লবঙ্গ প্রকাশ্যভাবে অমরনাথের এই মহত্ত্বকে স্বীকার করেছে।

"যদি আমি বারণ করি"—লবঙ্গলতা অনেক চেষ্টা করেও অমরনাথে প্রতি তার দুর্বলতাকে আর গোপন করতে পারেনি।

"আমার কত বল··কি হইবে" লবঙ্গের মতো তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী ও আত্মকেন্দ্রিক নারী যে অন্তরের গোপনে অমরনাথের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা পোষণ করে রেখেছিল, তা আবেগের দুর্বল মুহূর্তে হঠাৎ প্রকাশিত হয়ে পড়ায় লবঙ্গ যেন বিচলিত হয়ে পড়ল। লবঙ্গলতা সে সম্পর্কে সচেতন হয়ে যেন অমরনাথকে অনুরোধ করল, তার হৃদয়ের গোপন আকাঙ্ক্ষাকে আরো বেশী প্রকাশ করে দিয়ে লাভ কি!

"আমি তোমার পরম মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী"—এই উক্তির মধ্যে লবঙ্গলতার অসাধারণ বাক্‌চাতুর্যের পরিচয় পাওয়া যায়। নিজের স্বামীর প্রতি কর্তব্যভ্রষ্ট না হয়েও সামাজিক নৈতিকতাকে অস্বীকার না করেও অমরনাথের প্রতি লবঙ্গ তার দুর্বলতাকেও গোপন করতে না পেরে এইভাবেই তা মোলায়েম ভঙ্গীতে প্রকাশ করেছে।

"তোমাকে স্নেহ···পতিত হইব"—লবঙ্গলতা পরমুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়েছে।

"লোকে পাখী···কখনো হইবে না"—লবঙ্গ নিজের মনকে যেন জোর করে চাপা দিতে চাইছে। এ যেন চোরের মায়ের বড় গলা।

"লবঙ্গ ঈষৎ কাঁদিতেছে"—চেষ্টা করেও লবঙ্গ নিজেকে গোপন করতে পারেনি। সেদিক দিয়ে এই দৃশ্যটি বিশেষ তাৎপর্যমণ্ডিত।

"দোকান পাট উঠিল"—অমরনাথ এতদিন ধরে যেভাবে এই পারিবারিক কাহিনীর সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিলেন, আজ সমস্ত সম্পর্ক চুকিয়ে সেখান থেকে বিদায় নিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

এই পরিচ্ছেদটি কাহিনীর শেষ পরিচ্ছেদ। এটুকু বাহুল্য বলেই মনে হয়। দু'বছর পরে অমরনাথ ঘুরতে ঘুরতে আবার ভবানীনগরে এসে উপস্থিত। শচীন্দ্র ও রজনী সেখানে বাস করছিল। সন্ন্যাসীর দৈব চিকিৎসায় রজনী দৃষ্টিশক্তি লাভ করেছে। অমরনাথ দেখলেন শচীন্দ্র-রজনীর পুত্রের নাম রাখা হয়েছে 'অমরপ্রসাদ'।

অমরনাথ নিতান্ত কৌতূহলী হয়ে ভবানীনগরে গিয়ে অকস্মাৎ শচীন্দ্রের সাক্ষাৎ পান। শচীন্দ্র তাঁকে পরম সমাদরে গ্রহণ করে বটে, কিন্তু সে যে কলকাতার বাস তুলে দিয়ে ভবানীনগরে বাস করেছে, তার কারণ কলকাতায় ঐ অঞ্চলে রজনী ফুলওয়ালী বলে পরিচিত। তবে শচীন্দ্রের পিতা এবং ভ্রাতা কলকাতায় বাস করছেন। বৃহৎ পারিবারিক জীবন থেকে শচীন্দ্র-রজনীকে বিচ্ছিন্ন করে এভাবে দেখানোর উদ্দেশ্য লবঙ্গলতার সঙ্গে অমরনাথের আর সাক্ষাৎ ঘটাতে বঙ্কিমচন্দ্র চাননি।

শচীন্দ্র অমরনাথকে তাঁর দানপত্রের সম্পত্তি ফেরত নিতে বারবার অনুরোধ করেছে। কিন্তু অমরনাথ তাতে রাজী হননি। কারণ তিনি সম্পত্তি উদ্ধারের প্রত্যাশায় এখানে আসেননি, তিনি হয়ত অবচেতন মনে লবঙ্গ ও রজনীকে একবার দেখতে চেয়েছিলেন। রজনীর কাছে গেলে রজনী যখন অমরনাথের পদধূলি গ্রহণ করল, অমরনাথ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করল রজনী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। একটি ঘটনায় এ সম্পর্কে অমরনাথ নিশ্চিত হলো এবং অনুসন্ধানের ফলে শচীন্দ্র জানাল যে, সন্ন্যাসীর আনুকূল্যে রজনী দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে। এর পরেই অমরনাথ জানালেন, তাদের একটি শিশুসন্তান লাভ হয়েছে, যার নাম অমরপ্রসাদ।

এইটুকু জেনেই অমরনাথ কাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছেন এবং কাহিনীও শেষ হয়েছে। অমরনাথের আত্মত্যাগের ফলেই যে শচীন্দ্র-রজনীর মিলন, তাদের সন্তান লাভ, রজনীর দৃষ্টিশক্তি লাভ অর্থাৎ পরিপূর্ণ একটি সুখী দম্পতির পরিচয় পেয়ে অমরনাথ কাহিনী থেকে বিদায় নিয়েছেন। শচীন্দ্র-রজনী পরস্পর সুখী। লবঙ্গ হয়ত বৃদ্ধ স্বামীকে নিয়ে তার দিন কাটিয়ে দেবে, কিন্তু অমরনাথ? জীবনে যিনি সব পেয়েও সব হারালেন—সম্পদ, সংসার সব কিছু আয়ত্তের মধ্যে থেকেও যিনি কিছুই ভোগ করলেন না, সংসারের মধ্যে থেকেও যিনি সন্ন্যাসীর বৈরাগ্য নিয়ে জীবন কাটাতে চাইলেন,

বঙ্কিমচন্দ্র তাঁকে অমর করে রাখলেন রজনীর সন্তানের নামের মধ্যে। যে অমরের প্রসাদে আজ রজনী-শচীন্দ্রের মিলন, সেই মিলনের ফলই তো অমরপ্রসাদ। শচীন্দ্র-রজনী কৃতজ্ঞতা জানিয়েছে ঠিক, কিন্তু লেখক স্বয়ং ? যৌবনের উন্মাদনায় মুহূর্তের ভুলে যে কলঙ্কের লেখা অমরনাথকে লাঞ্ছিত করল, সেই বোঝা জীবনব্যাপী বয়ে চললেন অমরনাথ। আর তাঁর এই বৈরাগ্যের পুরস্কার হিসাবে তিনি পেলেন শচীন্দ্র-রজনীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা আর লবঙ্গ যে তাঁকে এখনো ভোলেনি সেই সান্ত্বনা। এইটুকু জানবার জন্যই যেন শেষ পরিচ্ছেদের অবতারণা। জীবন-সংগ্রামে বারবার জয়ী হতে গিয়েও ভাগ্যের বিড়ম্বনায় বঙ্কিমচন্দ্র অমরনাথের হাতে তুলে দিলেন শুধুই Consolation Prize—সান্ত্বনা পুরস্কার !

"রজনী"র পাঠভেদ :

বঙ্কিমচন্দ্রের অন্যান্য উপন্যাসের তুলনায় রজনীর পাঠান্তর সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বঙ্কিমচন্দ্র প্রতিবারই তাঁর গ্রন্থের নতুন মুদ্রণের আগে তার আমূল সংস্কারের চেষ্টা করতেন। এ ধরনের সংস্কার বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে আধুনিককাল অবধি প্রায় সব লেখকই করে থাকেন। এই সংস্কার-সাধন করতে গিয়ে কোনো কোনো ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর উপন্যাসের বহুল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে নতুন রূপ দিয়েছেন। উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে 'ইন্দিরা' বা 'রাজসিংহ' উপন্যাসের নাম।

'রজনী' উপন্যাসের ক্ষেত্রেও 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত রূপের সঙ্গে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত রূপের পার্থক্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। একথা বঙ্কিমচন্দ্র ভূমিকাতেই স্বীকার করেছেন—"পুনর্মুদ্রাঙ্কনকালে এই গ্রন্থে এত পরিবর্তন করা গিয়াছে যে ইহাকে নূতন গ্রন্থ বলা যাইতে পারে। কেবল প্রথম খণ্ড পূর্ববৎ আছে। অবশিষ্টাংশের কিছু পরিত্যক্ত হইয়াছে। কিছু স্থানান্তরে সমাবিষ্ট হইয়াছে। অনেক পুনর্লিখিত হইয়াছে।" এর দ্বারা কৌতূহলী পাঠক বঙ্কিম-মানস সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। আমরা সেই পাঠভেদের কিছু কিছু উদ্ধৃতি উল্লেখ করলাম। অনুসন্ধিৎসু পাঠকেরা সাহিত্য পরিষদ্ প্রকাশিত 'রজনী' গ্রন্থে'এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা	গ্রন্থাকারে 'রজনী'
১। রজনী পালিয়ে যাওয়ার কিছুদিন বাদে হীরালালের দেখা পেয়ে শচীন্দ্র যখন রজনীর কথা তাকে জিজ্ঞেস করেছে, তখন হীরালাল আভাসে ইঙ্গিতে জানাতে চেয়েছে যে, রজনী তার প্রতি অনুরক্তা হয়েই গৃহত্যাগ করেছে। (২।১)	১। রজনীর পালিয়ে যাওয়া সম্পর্কে হীরালাল শচীন্দ্রকে জানিয়েছে এ ব্যাপারে সে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। হীরালালের মত স্বভাবভীরু চরিত্রের পক্ষে এই আচরণই স্বাভাবিক। (৩।১)
২। সন্ন্যাসীর মন্ত্র প্রয়োগের আগে রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের কোন রকম দুর্বলতা ছিল না—"যাহাকে পঞ্চবাণ বলে রজনীর রূপের সঙ্গে তাহার কোনও সম্বন্ধ নাই।" (২।২)	২। সন্ন্যাসীর অলৌকিক মন্ত্র প্রয়োগের পূর্ব থেকেই রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের গোপন দুর্বলতার আভাস পাওয়া যায়। (৩।২) এর দ্বারা রজনীর প্রতি শচীন্দ্রের আকর্ষণের ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র নিছক অলৌকিকতার ওপর নির্ভর না করে শচীন্দ্র-রজনীর আকর্ষণকে অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য করে তুলেছেন।
৩। লবঙ্গলতার প্রতি প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য অমরনাথ রজনীর সন্ধানে প্রবৃত্ত হন। (৩।৪)	৩। রজনীর দারিদ্র্যাবস্থা সম্পর্কে সহানুভূতিসম্পন্ন হয়ে অমরনাথ এ কাজে মগ্ন। এই উদ্দেশ্য মহৎ। আর এর দ্বারা অমরনাথ চরিত্র বিশেষভাবে পরিবর্তিত। প্রতিশোধলোলুপ, স্বার্থপর অমরনাথের পরিবর্তন ঘটেছে আর্তের ত্রাণ-কারীরূপে। (২।৫)
৪। রামসদয় সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করেছেন যাতে শচীন্দ্র বিবাহে সম্মতি দেয়। রজনীর নাম সেখানে নেই। রজনী যে এই সমস্ত সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী সে সংবাদও মিত্র পরিবারের কাছে অজ্ঞাত। সন্ন্যাসীর অনুরোধে শচীন্দ্রজানিয়েছেউপযুক্ত পাত্রী পেলে বিবাহে তার আপত্তি নেই। (২।৩)	৪। রজনী যে এই বিষয় সম্পত্তির সম্পূর্ণ উত্তরাধিকারিণী রামসদয় তা জানতেন এবং সম্পত্তি রক্ষার জন্য তিনি সন্ন্যাসীকে অনুরোধ করেছেন শচীন্দ্র যেন রজনীকে বিবাহ করে। উপন্যাসের আচরণ অনেক স্বাভাবিক। (৩।৬)

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

৫। অমরনাথ যখন রজনীকে বিবাহকরতে চেয়েছেন শচীন্দ্রকে সেকথা জানানোতে শচীন্দ্র জনৈক যুবককে অমরনাথের খোঁজ নেবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করেছে এবং বাড়ীর সরকারকে অমরনাথের অবস্থা সম্পর্কে খোঁজ নিতে বলেছে। অমরনাথ গোয়েন্দার নজর এড়িয়ে বাড়ী বদল করে শচীন্দ্রকে তিরস্কার করে পত্র লিখেছেন। (২।৪)

৬। রজনীর উকিলের কাছে শচীন্দ্র খবর পেলো অমরনাথ নাকি রজনীকে বিবাহ করেছেন। অমরনাথের খোঁজ করে শচীন্দ্র তাঁর দেখা পেয়ে বুঝলেন তাঁরা দু'জন পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। (২।৬)

৭। রজনী সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী জেনে শচীন্দ্র অমরনাথের বাড়ীতে গেল রজনীর সঙ্গে কথা বলতে। শচীন্দ্রের মনে কোনোরকম দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি, যেহেতু রজনী পরস্ত্রী। রজনী সম্পত্তি গ্রহণে প্রথমে আগ্রহ দেখালেও, শেষে রজনী বল্‌লো যে, অমরনাথের অনুরোধেই সে বিষয় ফেরত চেয়েছে, নিজে সে চায় না মিত্রপরিবারকে নিঃস্ব করতে। (২।৭)

৮। অমরনাথের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশে রজনী অমরনাথকে বিবাহ করতে চেয়েছে এবং যতদিন না বিবাহ হয় পরস্ত্রীরূপে তাঁর গৃহে বাস করেছে। (৩।৫)

গ্রন্থাকারে 'রজনী'

৫। এই ঘটনা সম্পূর্ণ বর্জিত হয়েছে। অমরনাথ যখন শচীন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেছেন, তখন তিনি দু'টি বিষয় পরিষ্কার করে দিয়েছেন (ক) তিনি রজনীর পাণিপ্রার্থী; (খ) মিত্রদের সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী রজনী। রজনীরপ্রতি শচীন্দ্রের যেসামান্যদুর্বলতা রয়েছে, তার ইঙ্গিত করার ফলে এই কাহিনী আরও বাস্তবোচিত হয়েছে।(৩।৩)

৬। গ্রন্থে এই অংশ সম্পূর্ণ বর্জিত। অন্যভাবে চিত্রিত হওয়ার ফলে অমরনাথ ভিন্নভাবে গ্রন্থে প্রতিভাত হয়েছেন।

৭। অমরনাথ চরিত্রটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে রূপায়িত করতে গিয়ে গ্রন্থে বঙ্কিমচন্দ্র এই অংশটি বর্জন করেছেন। কাহিনীর রূপান্তর-ও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

৮। শচীন্দ্র নিজে থেকে সম্পত্তি ছেড়ে দিতে চাইলেও রজনী তার দখল নেয়নি। এতে অমরনাথ বাধা দেওয়া তো দূরের কথা বরং খুশীই হয়েছে। অমরনাথ রজনীকে বিবাহ করার ব্যাপারে কোনও পীড়াপীড়ি করেননি। তাঁর আশ্রয়ে রজনী

বঙ্গদর্শন পত্রিকা	গ্রন্থাকারে 'রজনী'
	বাস-ও করেনি। রজনী কৃতজ্ঞতাবশে অমরনাথের বিবাহ করার ইচ্ছায় সম্মতি দিয়েছে। (৪।২)
৯। অমরনাথের আচরণে তাঁর প্রতি রজনীর অশ্রদ্ধেয়ভাব ক্রমশঃ প্রকট হয়ে ওঠে। রজনী শেষে অমরনাথকে তার সম্পত্তি রেজেস্টারী করে দিয়েছে। অমবনাথের মনের বাসনাও তাই (৩।১)	৯। গ্রন্থে অমরনাথ চরিত্র সম্পূর্ণ অন্য ধরনের। তাঁর প্রতি রজনীর শ্রদ্ধা অপরিসীম ও আগাগোড়া অটুট ছিল। তাঁকে বিষয় দান করাব প্রশ্নই ওঠে না, কেননা রজনী জানে অমরনাথ নির্লোভ। তার প্রমাণস্বরূপ দেখি, অমবনাথ নিজের সম্পত্তিটুকুও রজনীকে দান করে গেছেন। রজনী তার সম্পত্তি লবঙ্গকে গ্রহণ করতে বলায় অমরনাথ বরং খুশীই হয়েছেন। (৪।২)
১০। বিষয় হস্তগত হওয়ার পর অমরনাথ লবঙ্গের মনোভাব জানতে চেয়ে লবঙ্গকে নিজগৃহে ডেকেছেন। তাছাড়া তাঁকে নিয়ে যে কলঙ্ক কাহিনী আছে, সেটা রজনীকে লবঙ্গ জানিয়ে দেয় কিনা তা জানাও অমরনাথের উদ্দেশ্য। কিন্তু লবঙ্গ সে পথে গেল না। (৩।১)	১০। লবঙ্গ অমরনাথেব দেখা পেয়েছে বটে, তবে সেটা অমরের বাসায় নয়। লবঙ্গের যাওয়ার উদ্দেশ্য রজনীকে বিবাহ করা থেকে অমরনাথকে নিবৃত্ত করা এবং শচীন্দ্রের সঙ্গে রজনীর বিবাহ দেওয়া। লবঙ্গ অমরনাথকে ভয় দেখালো, এ পথ থেকে প্রতিনিবৃত্ত না হ'লে রজনীকে তাঁর কলঙ্কের কথা ফাঁস করে দেবে। অমর জানালেন, তিনি নিজেই সব কথা রজনীকে বলে দেবেন। রজনীকে প্রতারণার ইচ্ছা তাঁর নেই। রজনীকে অমবনাথ সব কথা বলেছেন। তাতে রজনীর শ্রদ্ধা একটুও কমেনি। (৫।১)
১১। লবঙ্গ চলে গেলে রজনী অমরনাথের কাছে মুক্তি চাইল। কারণ বিষয়ের প্রতিই তো অমরের আকর্ষণ! সেই বিষয় সে তো লিখে দিয়েছে।	১১। গ্রন্থে এ অংশ বর্জিত। কারণ এখানে অমরনাথ অন্যপ্রকৃতির মানুষ।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

এখন সে মিত্র পরিবারে 'দাসীত্ব' করবে। কিন্তু অমরনাথ, জানালেন তা হয় না। কারণ সকলে জেনেছে রজনী অমরের স্ত্রী। এভাবে দাসীবৃত্তি করলে অমরের অপমান। রজনীও অমরের সঙ্গে বাস করতে কিছুতেই সম্মত নয়। ফলে তর্কাতর্কি হয় দুজনের মধ্যে। শেষে ঠিক হল, পরিচয় গোপন করে রজনী অমরনাথের পৈতৃক বাড়ীতে অন্যান্য অনাথাদের সঙ্গে থাকবে। (৩।২)

১২। অসুস্থ শচীন্দ্র একা যখনই থাকে, তখনই 'ধীরে রজনী' বারবার উচ্চারণ করে। শচীন্দ্রের কাছে রজনীকে রাখলে কি প্রতিক্রিয়া হয়, দেখবার জন্য লবঙ্গ রজনীকে ডেকে পাঠালো। কিন্তু রজনীর দেখা পাওয়া গেল না। শেষে অমরনাথের সহায়তা ছাড়া রজনীকে আনা সম্ভব নয় জেনে লবঙ্গ অমরকে আমন্ত্রণ জানালো। সে আমন্ত্রণ অমরনাথ গ্রহণ করলেন। (৫।১)

১৩। অমরনাথকে আহারে বসিয়ে লবঙ্গ কৌশলে তাঁর ঠিকানা জানতে চাইলো। অমরকে ভয় দেখালো তাঁর অতীতের কলঙ্ক ফাঁস করে দেবে বলে। তাতে অমরনাথ বিচলিত হলেও লবঙ্গের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হল না। (৫।২)

১৪। লবঙ্গ অমরনাথকে ভয় দেখালে, অমরনাথ লবঙ্গকে আশ্বাস দিলেন, যদি লবঙ্গ অমরের পূর্বকাহিনী বলে না দেয়,

গ্রন্থাকারে 'রজনী'

১২। অসুস্থ শচীন্দ্রকে অমরনাথ স্ব-ইচ্ছায় দেখতে এলেন এবং রজনীও এলো। (৪।৭)

১৩। গ্রন্থে এটুকু নেই, কারণ এর পূর্বেই লবঙ্গ অমরনাথকে নিবৃত্ত করেছে রজনীকে বিবাহ করা থেকে।

১৪। এত কাণ্ডকারখানা গ্রন্থে নেই। এখানে পাই শচীন্দ্রের অসুখের কথা বলে লবঙ্গ রজনীকে ডেকে পাঠায়

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

তা হ'লে রজনীর ঠিকানা অমর জানাতে রাজী এবং পরদিন রজনীকে নিয়ে অমরনাথ উপস্থিত হলেন। নিজে বাইরে থেকে রজনীকে লবঙ্গর কাছে পাঠিয়ে দিলেন; অবশ্য লবঙ্গের সঙ্গে একবার নির্জন সাক্ষাৎ প্রত্যাশা করলেন অমরনাথ।

১৫। পরপর কয়েকদিন শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করে, অমরনাথ বুঝলেন, শচীন্দ্র রজনীর প্রতি অনুরক্ত। শচীন্দ্র সুস্থ হবার পর একদিন অমরনাথ শচীন্দ্রকে জানালেন, তিনি বিষয় পেলেই খুশী। যদি কেউ রজনীকে বিবাহ করতে চায়, তবে তিনি আনন্দিত-ই হবেন। কারণ অমরনাথ জানতেন, এভাবে বললে শচীন্দ্র-ই রজনীকে বিবাহ করতে রাজী হবে। (৬।১)

১৬। পরদিন অমরনাথের সঙ্গে লবঙ্গের দেখা হ'লে তিনি বলেছেন—"আমি কালি যাহা শচীন্দ্রকে বলিয়া গিয়াছি, তাহা শুনিয়াছ কি?" লবঙ্গ উত্তরে বলেছে, "শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয় পাষণ্ড।" (৬।২)

গ্রন্থাকারে 'রজনী'

অমরনাথ শচীন্দ্রের সঙ্গে দেখা করলেন এবং যথেষ্ট সহানুভূতি ও দরদ নিয়ে কথাবার্তা বললেন।

১৫। রজনী যখন অমরনাথকে জানিয়েছে, তার মনের খবর লবঙ্গের কাছে জানা যাবে, তখন অমরনাথ লবঙ্গের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন। লবঙ্গ তাঁকে জানিয়েছে, সন্ন্যাসীর মন্ত্রপ্রয়োগ থেকে যাবতীয় ঘটনা এবং একথাও গোপন করেনি যে, শচীন্দ্র ও রজনী পরস্পর অনুরক্ত। তা শুনে অমরনাথ নিজের কর্তব্য ঠিক করে ফেলেছেন। শচীন্দ্র সুস্থ হ'লে অমরনাথ নিজের সন্ন্যাস গ্রহণের কথা জানিয়ে রজনীর জন্য উপযুক্ত পাত্র খুঁজতে বলেছেন। শচীন্দ্র উত্তর দিয়েছে, 'রজনীর পাত্রের অভাব নাই।' এতে অমরনাথের বুঝতে বাকী নেই যে, শচীন্দ্র নিজেকেই রজনীর পাত্র মনোনীত করেছে।

১৬। এই একই প্রশ্নের উত্তরে লবঙ্গ বলেছে, "শুনিয়াছি। তুমি অদ্বিতীয়। আমাকে ক্ষমা করিও; আমি তোমার গুণ জানিতাম না।" (৫।৩) অমরনাথ নতুনভাবে গ্রন্থে চিত্রিত বলে সেই সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই লবঙ্গর উক্তিটি বর্ণিত।

বঙ্গদর্শন পত্রিকা

১৭। অমরনাথ লবঙ্গকে বলেছেন—"আমি এই কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়া গেলে, তুমি কি যথার্থই সুখী হও?"

লবঙ্গ বলেছে, "…যথার্থ সুখী হই। কেননা, তোমাকে যেমন করিতে চাহি, তুমি সেরূপ হইলে না।"

অমরনাথ: "তুমি আমাকে কিরূপ দেখিতে চাও?"

লবঙ্গ: "জিতেন্দ্রিয়, অস্বার্থপর, পরোপকারী, বৈরাগী…"।

অমরনাথ: "আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল করিতে চাও? আমি তোমার কে, যে তুমি আমাকে ভাল না দেখিলে দুঃখিত হও?"

লবঙ্গ: "তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—" (৬।২)

গ্রন্থাকারে 'রজনী'

১৭। পত্রিকায় যে রূপে লবঙ্গ অমরনাথকে দেখ্‌তে চেয়েছিল, গ্রন্থাকারে অমরনাথ সেই রূপেই চিত্রিত হয়েছেন। অমরনাথের কলকাতা ত্যাগের প্রশ্নে তাদের মধ্যে যে সংলাপ গ্রন্থে চিত্রিত, তা এইরকম—

অমরনাথ: যাইব না কেন? আমাকে বারণ করিবার ত কেহ নাই।

লবঙ্গ: যদি আমি বারণ করি।

অমরনাথ: আমি তোমার কে যে, বারণ করিবে।

লবঙ্গ: "তুমি আমার কে? তা ত জানি না। এ পৃথিবীতে তুমি আমার কেহ নও। কিন্তু যদি লোকান্তর থাকে—" (৫।৩)

এইভাবে নানাধরনের ছোট-বড় পরিবর্তনের দ্বারা 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় প্রকাশিত "রজনী" যখন গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়, তখন তাকে নতুন গ্রন্থ-ই বলা চলে। অমরনাথ চরিত্রের আমূল পরিবর্তন করতে গিয়ে আনুষঙ্গিক অনেক পরিবর্তন ঘটাতে বঙ্কিমচন্দ্র বাধ্য হন।

টীকা

১

[অধ্যক্ষ শ্রীঅশোক কুণ্ডুর স্মরণীয় গ্রন্থ "বঙ্কিম অভিধান" থেকে গৃহীত।]

ইয়াদদাস্ত—স্মরণচিহ্ন বা স্মারক-লিপি (৩।৪)।

কাইসরকে বিথীনিয়ার রাণী বলিত—রোমান সম্রাট-জুলিয়াস সীজারকে কাইসর বলা হয়েছে। ঐতিহাসিকেরা বলেন সীজার অসাধারণ বীর ও রণকুশলী হলেও নারী-স্বভাবা ছিলেন। তিনি বিথীনিয়া রাজ্যের অধিপতি তৃতীয় নিকমিডেসের প্রতি নাকি নারী প্রণয়ীর মতই অনুরক্ত ছিলেন। তাই তাঁকে এরূপ অপবাদ দেওয়া হয় (২।২)।

কোমৃত্—এখানে ফরাসী চিন্তানায়ক Auguste Comte (১৭৯৮-১৮৫৭)-এর কথা বলা হয়েছে। ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের মঁ পেলিয়ারের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে তাঁর জন্ম হয়। আঠারো বছর বয়সে স্কুল থেকে এবং পিতার কাছ থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর বন্ধুর গৃহে আশ্রয় নেন। এক ভ্রষ্টা নারীকে তিনি বিবাহ করেন, কিন্তু কিছুকাল পরেই বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। তাঁর 'পজিটিভ ফিলজফি' ৫ খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায়, দেশে আলোড়ন জাগে ও আর্থিক অবনতি ঘটতে থাকে। বন্ধুরা তাঁকে সাহায্য করতে থাকেন। এক বিবাহিতা রমণীর তিনি প্রেমে পড়েন। এই নারীর মৃত্যু তাঁর জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে এই দার্শনিকের মৃত্যু ঘটে (৩।৩)।

জাবেদা—অনুমোদিত নকল (Certified copy) (৩।৪)।

জুলিয়েট—সেক্সপীয়ারের রোমিও জুলিয়েট নাটকের নায়িকা (৩/৩)।

টিণ্ডল—উনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী জন টিণ্ডল (১৮২০-১৮৯৩) (২।৪)।

ডারুইন, ডার্বিন—বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ ও দার্শনিক। তাঁর পুরো নাম Charles Robert Darwin (১৮০৯-১৮৯২)। তিনি পৃথিবীর বহু প্রাণীর জীবনযাত্রা সম্বন্ধে গবেষণা ক'রে এবং বহু স্থানে ভ্রমণ ক'রে 'The Origin of Species' নামে একটি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয় হল, বানর-জাতীয় জীবই ক্রম-বিবর্তনের ফলে বর্তমান মানুষে পরিণত হয়েছে।

এরূপ মতবাদ পৃথিবীর চিন্তা জগতে আলোড়ন সৃষ্টি করে। মানব-সৃষ্টির এই তত্ত্ব Laws of Evolution বা বিবর্তনবাদ বা অভিব্যক্তিবাদ নামে খ্যাত (২ ৪), (৩৩)।

ডেস্‌ডিমোনা – সেক্‌সপীয়রের ওথেলো নাটকের নায়িকা (৩/৩)।

তাসিতস্—প্রাচীন রোমের বিখ্যাত ঐতিহাসিক। তাঁর পুরো নাম Tacetus Caius Cornelias (আনুমানিক ৫২-১২০ খ্রীষ্টাব্দ) (৩/৩)।

থুকিদিদিস—প্রাচীন গ্রীসের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিক। তিনি পেলোপনেসিয়ার যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ক'রে সেই যুদ্ধের ঘটনা বর্ণনা করেন। কিন্তু তিনি ঘটনা বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে বিশ্লেষণও করতেন। এই রীতি আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনার রীতি বলে গৃহীত হয়েছে (৩/৩)।

প্লুটার্ক—(আনুমানিক ৪৬-১২০ খ্রীষ্টাব্দ), প্রাচীন গ্রীস ও রোমের বিখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে 'Lies' নামক গ্রন্থ রচনা করেন। আধুনিক লেখক ও ঐতিহাসিকরা তা থেকেই উপাদান সংগ্রহ করেন। ইনি গ্রীসের অধিবাসী হলেও জীবনের অধিকাংশ কাল রোমেই কাটিয়েছিলেন (৩/৩)।

লীলাবতী—লীলাবতী ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের প্রসিদ্ধ গণিততত্ত্ববিদ্ ভাস্করাচার্যের কন্যা। তাঁরও পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছিল (৩ ২)।

বুকনেয়র—জার্মান দার্শনিক। বিবর্তনবাদ সম্বন্ধে ইনি একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন (৩/৩)।

বেকন– ইউরোপীয় দর্শনে যুক্তিবাদের প্রবর্তক ফ্রান্সিস বেকনের (১৫৬১-১৬২৬) কথা বলা হয়েছে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ Advancement of Learning। বেকন ছিলেন ইংলণ্ডের প্রধান বিচারপতি। ইংলণ্ডেশ্বরের কাছে অভিযোগ আসে যে, বেকন মামলাকারিগণের কাছে ঘুষ নেন। বেকন এই অভিযোগ স্বীকার করে নিলে তাঁকে পদচ্যুত করা হয় (২।৩)।

মিল—ইংরাজ চিন্তানায়ক John Stuart Mill (১৮০৯-১৮৭৩)-এর কথা বলা হয়েছে। তিনি আধুনিক Logic বা ন্যায়শাস্ত্রে অনেক নূতন উপাদান যোগ করেন। সমাজদর্শনে তিনি Utilitarianism বা উপযোগবাদ নামে বিখ্যাত মতবাদের প্রবর্তক। এই মতবাদের মূলকথা হল—মানবসমাজের উন্নতির ক্ষেত্রে যা উপযোগী তাই-ই সুন্দর, সত্য, এবং তাতেই সুখ। তবে মিল্ কোম্‌ত-এর মতো মানব পূজাকেই চরম বলে মানেননি (৩৩)।

লাওয়ারেশ—উত্তরাধিকারীশূন্য বা মালিকবিহীন (৩৪)।

লায়ল—ইনি ছিলেন ভূ-তত্ত্ববিদ্। তিনি ডারুইনের সমসাময়িক। লায়ল ভূ-পৃষ্ঠের অনেক লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেন (২।৪)।

লিটন এঁর প্রকৃত নাম এডওয়ার্ড বুলওয়ার লর্ড লিটন। জন্ম ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ঔপন্যাসিক, নাট্যকার, কবি ও রাজনীতিজ্ঞ হিসেবে খ্যাত। এঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা ষাটেরও বেশী। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে এঁর মৃত্যু হয়। বঙ্কিমচন্দ্র তাঁর রজনী উপন্যাসটি এঁর 'Last Days of Pompeii' নামক গ্রন্থের প্রেরণা অনুসারে রচনা করেন।

লাস্ট ডেজ্ অব্ পম্পেই—লর্ড লিটনের এই উপন্যাসখানি ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে পম্পে নগরীর ধ্বংসের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় লিটনের উপন্যাসখানি রচিত। উপন্যাসের মূল বিষয়বস্তু কিন্তু প্রেম। গ্রীক যুবক গ্লকাস ভালবাসে আইয়োনকে। কিন্তু ইজিপ্টবাসী আর্টেসিস আইয়োনকে বিয়ে করার জন্য তাকে নিজের গৃহে বন্দী ক'রে রাখে এবং তার ভাইকে হত্যা করে। তারপর হত্যাকারী হিসেবে গ্লকাসকে অভিযুক্ত করে। নিদিয়া নামে এক কানা ফুলওয়ালীর চেষ্টায় উভয়ে রক্ষা পায়। এই নিদিয়া গ্লকাসকে ভালবাসে। কিন্তু গ্লকাস নিদিয়াকে স্নেহ করে বোনের মতো। শেষ পর্যন্ত যেদিন বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে চারিদিক অন্ধকার, তখন অন্ধ নিদিয়া গ্লকাস ও আইয়োনকে নিরাপদ সমুদ্রতীরে নিয়ে আসে। গ্লকাস ও আইয়োনের মিলনে নিদিয়া সমুদ্র-জলে আত্মত্যাগ করে। নিদিয়ার আত্মত্যাগ তারা কোনদিন ভোলেনি। নিত্য সমুদ্রতীরে এসে তারা নিদিয়াকে স্মরণ করে।

সক্রেতিস্—বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেতিস্ (৪৬৯ খ্রীষ্টপূর্ব—৩৯৯ খ্রীষ্টপূর্ব)-এর কথা বলা হয়েছে। তাঁর পাণ্ডিত্যের জন্য বহু ব্যক্তি তাঁর শিষ্য হন। প্লেটো তাঁর শিষ্যদের অন্যতম। তাঁর শিষ্যরা রাজদরবারের প্রতি বিদ্রোহ ভাবাপন্ন হওয়ায় সক্রেতিস্ রাজরোষে পতিত হন। তাঁর মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়। তিনি কোন প্রতিবাদ না ক'রে বিষপানে আত্মত্যাগ করেন (২।৩)।

মালিনী মাসী—ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র। মালিনী রাজবাটিতে ফুল যোগাত এবং রাজকন্যা বিদ্যা রাজপুত্র সুন্দরের প্রণয়ে দূতীর কাজ করে (১।২)।

সেক্‌সপীয়র গেলেরি—ইংলণ্ডের শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। উইলিয়াম সেক্‌সপীয়রের বর্ণিত চরিত্রের ছবির বই সেক্‌সপীয়র গেলেরি (৩।৩)।

সেকস্‌পীয়রকে বল্টের ভাঁড়—সেক্‌সপীয়রকে ভলতেয়ার ভাঁড় বলেছেন। বল্টের অর্থাৎ ভল্‌তেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮)। ভল্‌তেয়ার ছিলেন বিখ্যাত ফরাসী

সাহিত্যিক, সমালোচক ও সমাজতত্ত্ববিদ্। তাঁর বিখ্যাত বিদ্রূপাত্মক রচনা 'ক্যান্‌ডিডা'। তিনি ছিলেন অবাস্তব আদর্শের বিরোধী। নাটকে তিনি প্রাচীন গ্রীক্ নীতির সমর্থক ছিলেন। তাই তিনি সেক্‌সপীয়রের নাটককে সহ্য করতে পারেননি। তাঁর মতে, জনসাধারণের মনোরঞ্জনের জন্য ভাঁড়ের মতো সেকস্‌পীয়র সস্তা নাটক রচনা করেছিলেন (২/৩)

সোপেনহাওয়ার—জার্মানির দুঃখবাদী দার্শনিক Arthur Schopenhauer (১৭৮৮-১৮৬০)। ভারতবর্ষের উপনিষদ্ ও বুদ্ধদেবের ধর্ম তাঁর দর্শনতত্ত্বকে অনুপ্রেরণা দান করে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "The world as will and Idea" (৩/৩)।

হক্‌সলী—ইংলণ্ডের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক। তাঁর পুরা নাম Thomas Henry Huxley (১৮২৫-১৮৯৫)। তিনি ডারুইনের বিবর্তনবাদের প্রধান সমর্থক। কোম্‌তের মতবাদেরও তিনি সমর্থক ছিলেন। তবে ঈশ্বরে তিনি একেবারে অবিশ্বাস করেননি। তাঁর মতে, এই বিশ্ব-জগতের নিয়ন্ত্রারূপে একটি অজ্ঞেয় শক্তি নিশ্চয় আছে (২/৪)।

২

কাদম্বরী—বাণভট্ট রচিত বিখ্যাত গদ্যকাব্য এবং সেই গ্রন্থের নায়িকার নাম। বিদিশার রাজা শূদ্রকের কাছে বৈশম্পায়ন নামক এক শুকপক্ষী এই কথাংশের বক্তা।

বাসবদত্তা—সুবন্ধু রচিত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা। সুবন্ধুর আবির্ভাবকাল ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগ। কন্দর্পকেতু ও বাসবদত্তার প্রণয়কাহিনী ও তাদের মিলনের পথে যে দ্বন্দ্ব সেই কাহিনীই এর প্রতিপাদ্য বিষয়।

রুক্মিণী—বিদর্ভরাজ ভীষ্মকের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী। ইনি লক্ষ্মীর অবতার। রুক্মিণীই শ্রীকৃষ্ণের প্রধানা মহিষী। রুক্মিণীর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের প্রদ্যুম্ন, সুদেষ্ণ, সুষেন ইত্যাদি দশটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্যার নাম চারুমতী।

শকুন্তলা—"ঋষি বিশ্বামিত্রকে ঘোর তপস্যায় রত দেখে ইন্দ্র ভীত হয়ে তাঁর তপস্যাভঙ্গের জন্য অপ্সরা মেনকাকে প্রেরণ করেন। সর্বাঙ্গসুন্দরী বিবস্ত্রা মেনকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বিশ্বামিত্র মেনকার সহিত মিলিত হন। মিলনের ফলে বিশ্বামিত্রের ঔরসে ও অপ্সরা মেনকার গর্ভে কন্যা শকুন্তলার জন্ম হয়।···মেনকা সদ্যোজাতা কন্যাকে বনমধ্যে মালিনী নদীর তীরে পরিত্যাগ করে ইন্দ্রসভায় প্রস্থান করেন। এই পরিত্যক্তা কন্যা শকুন্ত অর্থাৎ পাখী কর্তৃক রক্ষিত হয়ে মহর্ষি কণ্বের দৃষ্টিপথে পতিত

হয়। মহর্ষি কণ্বই নিজের আশ্রমে এনে এঁকে নিজের কন্যার ন্যায় পালন করতে থাকেন।" পৌ. অ.। মহাকবি কালিদাস শকুন্তলা উপাখ্যানটি অবলম্বন করে অমর নাটক রচনা করেন। যুগ যুগ ধরে এই অমর কাব্য ভারত তথা বিশ্বের রসিক সমাজকে মুগ্ধ করেছে।

সত্যভামা—"রাজা সত্রাজিতের কন্যা ও শ্রীকৃষ্ণের স্ত্রী।···ইনি ইন্দ্রের স্ত্রী শচী, শিবের স্ত্রী গৌরী ও অগ্নির স্ত্রী স্বাহার মত পুণ্য ব্রতের অনুষ্ঠান করে নারদকে স্বামী শ্রীকৃষ্ণকে দান করেন।···শ্রীকৃষ্ণের নামাঙ্কিত তুলসীপত্রের বিনিময়ে নারদের নিকট হতে স্বামীকে ফিরে পান। যদুবংশ ধ্বংস ও শ্রীকৃষ্ণের মহাপ্রয়াণের পর···ইনি অর্জুন কর্তৃক ইন্দ্রপ্রস্থে নীত হন। এঁর গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের ভানু প্রভৃতি সপ্ত পুত্রের জন্ম হয়।"— পৌরাণিক অভিধান।

সীতা—"মিথিলার রাজা জনকের কন্যা। হল দ্বারা যজ্ঞভূমি কর্ষণ করার স' জনক এঁকে সীতায় অর্থাৎ লাঙ্গলের রেখায় প্রাপ্ত হন। ক্ষেত্রে হলমুখ থেকে উৎপন্ন বলে এঁর নাম হলো সীতা। এই মানসী কন্যাকে জনক নিজ কন্যার মত লালন-পালন করতে লাগলেন।" হরধনু ভঙ্গ করে রাম সীতাকে লাভ করেন। পিতৃসত্য পালনের জন্য রাম-সীতা বনবাসে গেলে সীতা রাবণ কর্তৃক অপহৃতা হন। রাম-রাবণের যুদ্ধ হয় ও সীতা উদ্ধারপ্রাপ্তা হন। তাঁর শুদ্ধতার অগ্নিপরীক্ষা করে রাম প্রজাদের সংশয় দূর করেন। কিন্তু শেষে বনবাসে নির্বাসন দিলে বাল্মীকির আশ্রমে রামের দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করে লব ও কুশ। এদের মুখেই রামায়ণ গান গীত হয়। শেষে সীতা সতীত্বের পরীক্ষা দিতে গিয়ে কাতরা হয়ে পৃথিবী বিদীর্ণ করে তার গর্ভে প্রবেশ করেন।

শেষ